বর্ষ ১৯
(সম্পূর্ণ)

দ্বিতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা নেই —
ফ্যাক্সিমিলি জীবনানন্দ সংখ্যা দেখুন।

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১
উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৭৯

মায়াবী কবি র‍্যাঁবো

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে সর্বদেশের ও সর্বকালের একজন মস্ত বড় কবি জন্ম নিয়েছিলেন ফ্রান্সে—তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব প্রথম পালিত হ'ল অক্সফোর্ডে, তারপর ফ্রান্সে, তাঁর জন্মস্থান শার্লভিল শহরে। দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে যে-কথা, সেখানে প্রাদেশিকতার প্রসঙ্গ অবান্তর; তাই এই অবসরে ফ্রান্স থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের অধিবাসী হ'য়েও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। তাঁর কাব্যের অজস্র দিকের মাত্র একটি নিয়ে আমাদের এই আলোচনা—তাও হয়তো অসম্পূর্ণ এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও দৃষ্টির প্রসারের অভাবে দুষ্ট।

তবু শ্রদ্ধাই হোক এই নিবন্ধের শেষ কথা।

*

যদি এইরকম বলি, সচেতনতম মানুষও এমন মুহূর্ত এড়িয়ে যেতে পারে না যা তাকে অনিবার্যরূপে জাদুকরের আসনে বসিয়ে দেয়, যেখানে সে মানতে পারে না, মানতে চায় না কোনো কার্য-কারণ; পৃথিবীর হাতে-ছোঁওয়া চোখে-দেখা রীতি-নীতির মধ্যেও অনির্দেশ্য রঙের ইন্দ্রজাল ঘনিয়ে উঠেছেই, কেননা সব সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ কোথাও-না-কোথাও প্রতি মুহূর্তেই আশা তো করছে, করছে সন্দেহ, মনে মনে বোঝাপড়ার অন্ত নেই; যদি বলি, আচ্ছা তুমি ঠাণ্ডা মানুষ, ঠিকমত চলাফেরা করো, কাজ করো, সময়ে খাও-দাও-ঘুমোও,

তবু কোনো অকারণ কারণে রক্ত কি তোমার চঞ্চল হয় না কখনো, রাত্রে ঘুমের একটু ব্যাঘাত, অন্তত কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্যে—যখন সময় মত সব ঠিক হয় না, পদে পদে ত্রুটি অনুভব করো, অন্তত তখন, যখন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে নিজেকে প্রস্তুত করো, কপালে হাত দাও, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শব্দ-ভাণ্ডার হাতড়াও, নাম দাও ভাগ্য, নিয়তি বা ভবিষ্য? যদি বলি, এড়াতে পারবে না সেই মুহূর্ত, সুযোগ খুঁজতেই হয় জীবনে, দুলতেই হয় আশা-নিরাশায়, ঝাঁপ তো তুমি দেবেই অনিশ্চিতে—যদি দুর্দম হও, যাত্রা কর দুর্গমে, হয়তো পাবে লক্ষ্মীর করুণা; এই যে রাজ্য, যা আশা দেয়, বিরক্তি আনে, যাতে ছটফট ক'রে মরি, সে-রাজ্য কি সম্পূর্ণরূপে ম্যাজিকের নয়?

এই রকম যদি বলি, তা হ'লে নতুন কোনো কথা আমি বলব না। কিন্তু উত্তরে যদি বলি, এ-ভাবে যাব না, এই যে 'অকারণ' কারণ, শব্দের আগে যে এত 'অ' বসিয়ে দেওয়া, এই সব কি আমাদের নঙর্থক সমাজেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি নয়, যে-সমাজে পরস্পরবিরোধী সত্যই একমাত্র সত্য, যেখানে নিরাপত্তা ব'লে কিছু নেই, সবই সুযোগের ওপর, ভাগ্য আর ভবিষ্যের উপর নির্ভর করছে, কপালে হাত দিতে হয় যেখানে, যেখানে একটা কেরানির চাকরির জন্যে হাজারখানেক আবেদন পড়ে, তার মধ্যে পি-এইচ-ডিরাও বাদ যান না? তাহ'লে জানি অপর পক্ষ প্রতিবাদ করবে, বলবে, তবে তোমার ভালোবাসা, তোমার কাব্য, তোমার সংগীত, তোমার শিল্পকলা? যখন ভালোবাসো কাউকে, অনির্বচনীয় বেদনা অনুভব করো না? তোমার কাব্য, তা কি সেই 'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' 'লক্ষ দীপের সনে' অকারণে দীপ ভাসিয়ে দেওয়া নয়? গানে গান্ধারের পর মধ্যম কেন ওঠে, নিখাদের পর ধৈবত নেমেই বা আসে কেন—আর যখন দরবারি কানাড়ায় নিয়ম-কানুন ভেঙে কোমল 'রে' লাগিয়ে দাও, সভাসুদ্ধ 'সাধু সাধু' রব পড়ে না? শিল্প-কলাতেও দেখ, ছবিকে ফোটোগ্রাফ করবে না কিছুতেই শিল্পী।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। কারণ তাতে এমন উজান বাইতে হবে যে হাত ভেঙে যেতেও পারে। বহু শত শতাব্দীর অলংকার

শাস্ত্রের ঐতিহ্যের বিরোধী হওয়া কম বুকের পাটা নয়। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে কাব্য নিয়েই পড়ি আপাতত।

এক আর একে দুই হয়, দুই আর একে তিন—তিনকে তিন দিয়ে গুণ করলে নয় হয়। কিন্তু এইভাবে কাব্য নিশ্চয়ই চলবে না, আবার এ-সত্যকে অস্বীকারও করবে না কাব্য। মায়া জড়িয়ে আছে কাব্যে, এ সেই ম্যাজিকের মায়া। এর সঙ্গে আদিমদের সেই 'মানা' অথবা আরুণ্টাদের 'আরুংকিলতা'র সম্বন্ধ আকাশ-পাতালের নয়। মুস্কিল হচ্ছে এই যে আজ যাঁরা কাব্যের এই অনির্বচনীয়তা, এই 'absolute'-টুকু নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন এই সম্পদটাকে কাব্যের একটা শাশ্বত গুণ ব'লে, তাঁরা ভুলে যান যে সব কিছুরই মত কাব্যেরও একটা ইতিহাস আছে, তারও একদিন জন্ম হয়েছিল এবং যেহেতু কাব্য মূলত বাক্য ও বাক্য একটি সামাজিক সম্পদ, সমাজই কাব্যের গতিবিধির নিয়ন্তা।

আদিম কালে কবিতাই ছিল মানুষের একমাত্র সাহিত্য। তার কারণ যেমন সামাজিক, পরবর্তীকালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তিরও ইতিহাস তেমনি সামাজিক। মানুষ ধরে রাখতে চাইল শব্দকে, যে-শব্দকে নিয়ে সে প্রলুব্ধ হয়েছে, যে তাকে আশা দিয়েছে, তার বাঁচার সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রথম কাব্য তাই তার নৈসর্গিক অনুধ্যান, রোগ, মৃত্যু, ভূত ইত্যাদি নানান কাল্পনিক ও অকাল্পনিক শত্রুর বিরুদ্ধে ম্যাজিক মন্ত্র, মাঠে কখন বীজ বুনতে হবে, তার ইতিকথা। কিন্তু সেই মন্ত্রটুকু বা ছড়াটুকু কেবল মুখে আওড়ালে (লেখার প্রশ্ন তো ছেড়েই দিলাম, লেখা সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে) কোনো চমৎকারিত্বই থাকত না তার শ্রোতৃবৃন্দের কাছে। তাই তাকে গাইতে হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হ'ত নানারকম অঙ্গভঙ্গি ক'রে। নাচ গান ও কাব্যের উৎস একই। যতই ধীরে ধীরে মানুষ নিজেকে খুঁজে নিতে আরম্ভ করল প্রকৃতির মধ্যে, অনুধাবন করল তার শক্তি, শিকার থেকে কৃষিবিদ্যায় হাত পাকানো সুরু হ'ল, গৃহপালিত করল পশুদের, জন্মালো অর্থের জ্ঞান, ব্যবসার লেন-দেন, ততই তার সাংস্কৃতিক জীবনেও বহুতর নতুন অধ্যায় ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগল। কিন্তু সেই যে আদিম রীতি

কবিতা

আশ্বিন ১৩৬১

ছিল কাব্যের, উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া কোনো কথাকে, সেই ঐতিহ্য মানুষের হাঁটি-হাঁটি-পা-পা সভ্যতার ইতিহাসে একেবারে মিলিয়ে গেল না। এমন কি আজো অনুন্নত অনেক উপজাতির গানে (বা ছড়ায় বা কাব্যে) এই উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া কথার সুরটি সহজেই কানে ঠেকে এবং সেইখানেই তার মনোহারিত্ব। ধরা যাক ওরাংদের এই গানটি :

শহর শহর যাস
সকল শহর যাস
রাঁচি শহর যাস নে রে ভাই না।
রাঁচি শহর
ডাইনি শহর
পা তো থামে না
রাঁচি শহর না।

(মূল থেকে অনুবাদ : রাম বসু—'কবিতা', আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৩)

এই যে প্রতিটি পংক্তির শেষে 'যাস' 'না' ইত্যাদি শব্দের হঠাৎ থেমে যাওয়া ঢেউ কানে এসে বাজে, এর মধ্যে একটি মায়া আছে, এই সুর সাধারণ কথোপকথনের নিশ্চয়ই নয়। অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস ইত্যাদিরও মূল একই জায়গায়—এই অসাধারণত্ব ও মনোহারিত্ব বজায় রাখবার তাগিদেই তাদের সৃষ্টি। যখন বলি,

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে—

তখন যা বলছি, তা ছাড়িয়েও আরেকটা কিছু বলছি—সেই-বলা বলা হ'য়ে গেলেও থেমে রইল না, বাজতে লাগল নিঃশব্দের মধ্যে। তা হ'লে কি বলব, এক অর্থে সমস্ত কবিই জাদুকর, সমস্ত কবিতাই ম্যাজিকের মায়ামন্ত্রে উদ্বোধিত?

কিন্তু মুস্কিল হ'ল ঐখানেই। একবার যখন অসাধারণকে মেনে নিলাম,

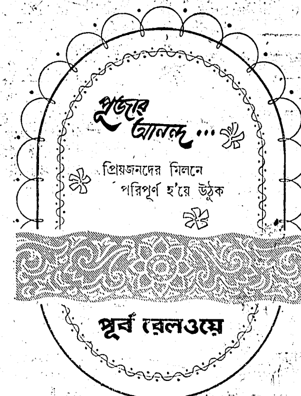

চিত্রবিচিত্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো ছেলেমেয়েদের আনন্দদায়ক সরল সরস কবিতাবলী। অনেকগুলি কবিতা এই প্রথম গ্রন্থে সংকলিত হল।

॥ সূ চী প ত্র ॥

চি ত্র	বি চি ত্র
উষা	ভোতন-মোহন
আমাদের পাড়া	স্বপন
মোতিবিল	উড়ো জাহাজ
হাট	এক ছিল বাঘ
ছোটো নদী	বিষম বিপত্তি
ঝোড়ো রাত	অগ্নিকাণ্ড
শরৎ	ভুপু
শীত	উল্টারাজার দেশ
আগমনী	খাপছাড়া
পৌষ-মেলা	ছবি-আঁকিয়ে
উৎসব	চিত্রকূট
ফুল	চলন্ত কলিকাতা
সাধ	হনুচরিত
নতুন দেশ	সুন্দর-বনের বাঘ
ফাল্গুন	চলচ্চিত্র
তপস্যা	পিয়ারি

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা বহুবর্ণ মলাট। কাগজের মলাট মূল্য ১৸০

শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত বহুবর্ণ প্রচ্ছদপট ছাড়া তাঁরই আঁকা আরো একখানি রঙিন ও এগারো খানি হাফ্ টোন্ চিত্রে ভূষিত, কবির প্রতিকৃতি-যুক্ত, বাঁধাই, শোভন সংস্করণ ৩৲

বিশ্বভারতী

প্রশ্রয় দিলাম, তা আমাদের মাথায় চ'ড়ে বসল। এই অসাধারণকে যদি সকলে মিলে মেনে নিতে পারতাম, যেমন মেনে নিয়েছিল আদিমরা, তা হ'লে সমস্যাটা হয়তো এতটা কঠিন হ'ত না। ছড়া থেকে গাথা-কাব্য, তা থেকে রোমান্টিক কবিতা, তারও হরেক রকম শ্রেণী-উপশ্রেণীর মধ্যে এই অসাধারণের চেতনা দিনে দিনে বেড়েই যেতে লাগল। আজ এই বিশ শতকের শেষার্ধেও উক্ত পথের পথিক সমস্ত কবিদের অবোধ্য এই যত সব অসাধারণ, তা একান্তভাবেই তাদের নিজের নিজের সম্পত্তি, অন্য কারুর নয়।

পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে, আদিমের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেওয়া শব্দে যে মায়া ছিল বুদ্ধির অগোচর, তাকে তারা সকলে মিলে উপভোগ করত তাদের সেই রকম অবোধ্য নাচ-গানের অনুষ্ঠানে, আগুনের চারপাশে দল বেঁধে সমবায়-নৃত্যে ডমরুর সংগতে। কিন্তু আজকের আধুনিক কবি যখন 'কবোষ্ণ শীত', 'অতলান্ত অবগাহন' অথবা এই ধরনের আরো অনেক 'অসাধারণ' ছায়াবাজির ভেলকি দেখায়, তাতে সে নিজেই মুগ্ধ হয়, অন্য কাউকে কাছে টানতে পারে না। বুদ্ধির উল্টো পথে এই অভিযান অব্যাহতই রয়েছে, আজ না-হয় অনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাস ও নানানরকম উপমার জাঁক-জমকত্বে তার মোড়টা একটু বেঁকেছে, তবু তা জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে—যা ছিল সমষ্টির, তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও কবিরা এত বেশি আত্মানুসন্ধানী যে তাদের সমস্যা একমাত্র তাদেরই সমস্যা, তার সঙ্গে বিশ্বের কোনো জনসাধারণের এতটুকু যোগ নেই। তাই আজ কেউ যদি শোনায়

> শহর শহর যাস
> সকল শহর যাস
> রাঁচি শহর যাস নে রে ভাই না,

তা আদিম হ'লেও, অনুন্নত হলেও, তাই লোকে শুনবে কান পেতে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

ম্যাজিকের অন্যতম দুটি প্রধান ধারা যা কাব্যের অন্তর্বস্তুতে অনুসৃত হয়েছে, তার একটি হ'ল অনির্বচনীয় পবিত্রের চেতনা, অন্যটি অপ্রকাশ্য মন্দের ধারণা। আদিমদের 'মানা' (mana) অথবা 'ট্যাবু' (taboo), এই দুয়ের পথেই 'absolute' খুঁজে গিয়েছেন কবিরা। ইচ্ছা বা কল্পনার সর্বশক্তিমত্তা, অর্থাৎ আমি বলছি ব'লেই এটা সত্য, আমি হবে বলছি ব'লেই এটা হবে, কাব্যের এই গুণটিও একান্তভাবে জাদুকরী। যা কিছু অনির্বচনীয়, যা কিছু বুদ্ধির অগোচর, তার সঙ্গেই ম্যাজিকের সম্বন্ধ। সার্থক সমাজ-ব্যবস্থার কাব্যে এই মায়া কোন রূপে রক্ষিত হবে, তা বলা হয়তো সহজ নয়—তবে নিশ্চয়ই তেমনভাবে নয় যেমনভাবে রয়েছে এখন। আজকের সাধারণ লোক কাব্য পড়ে না—কেনই বা পড়বে? বোদলেয়ারের উক্তি মনে পড়ে: 'অতএব এই সব কুহকিনী ছায়া, রনে, দুবের্মান ও হ্বার্থার, তোমরা ছিটকে পড়ো; শূন্যের ধোঁয়ায় মিশে যাক তোমাদের আলস্য ও নিঃসঙ্গতার দানবীয় সৃষ্টি সব; জেনে জায়েথের হ্রদের মধ্যে শূকরদের মত তোমাদের মুগ্ধ অরণ্যের ছায়ায় তোমরা নিজেদের বিছিয়ে দাও যেখান থেকে বেরিয়েছে তোমাদের এই সব স্বকপোলকল্পিত অরির দল, রোমান্টিক চেতনায় আক্রান্ত পাল পাল ভেড়া।'

আর র‍্যাঁবো, ফরাসী সিম্বলিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি, তিনি হ'তে চাইলেন 'voyant', যথার্থ অর্থে দার্শনিক। অবুদ্ধির পথে আর যাবে না মন, এবার চোখ-কান খুলবে, জগৎ দেখবে, শুনবে, বোঝবার চেষ্টা করবে। তবু, হায় র‍্যাঁবো!

র‍্যাঁবোর কথায় আসবার আগে আমাদের এই ভূমিকাটুকুর দরকার ছিল ম্যাজিকের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক কী, সেই সম্পর্ক কতখানি বজায় রাখা চলতে পারে আগামী কালের কবিতায়, সেটুকু আলোচনা করবার জন্যে।

২

'ইন্দ্রধনুর দ্বারা অভিশপ্ত' র‍্যাঁবোর জীবনই হ'ল তাঁর কাব্যের ভূমিকা। কোনটা আসল, তাঁর কাব্য না জীবন, বলা মুস্কিল। একাধিক মৃত্যু ঘটে

কাপুরুষদের—কিন্তু এই দুর্জয়তম বীরেরও মৃত্যু ঘটেছিল দুবার—প্রথম মৃত্যু উনিশ বছর বয়সে। তাঁর প্রথম জীবন নিয়ে একটু আলোচনার দরকার, কারণ সেইখানেই মায়াবী কবির সমস্ত মায়ার বীজ—সার্থক আবহসংগীতের মত তাঁর সেই প্রথম জীবন মূল স্বরের সঙ্গে আশ্চর্য সংগতি রেখে গেছে।

শার্লভিল বেলজিয়ামের ধারে ফ্রান্সের প্রান্ত-সীমানায় ছোট্ট একটি শহর—সেইখানে জন্মালেন র‍্যাঁবো ১৮৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর। ছেলেবেলা থেকেই গোল্লায়-যাওয়া ছেলে, সমস্ত রকম শাসন ও শৃঙ্খলার ঊর্ধ্বে। বাপ ছিলেন ভবঘুরে এবং অপূর্ব খরচে, সংসারী হবার জন্যে যারা জন্মায়নি, তাদের অন্যতম। মায়ের ছিল আশ্চর্য ধৈর্য, নিষ্ঠা, এবং যে পথে চলতে চান, হাজার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও নিঃশব্দে নিজেকে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা। চাষীর ঘরের মেয়ে তিনি, মন ছিল ব্যবসায়ী, অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন তিনি, উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকেও ক্ষমা করেননি কখনো। ছেলের বাড়াবাড়িতে মনে মনে তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠলেও মুখ ফুটে একটি কথা বলেননি, আসলে তার সম্বন্ধে সমস্ত হালই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ইজাবেল, র‍্যাঁবোর বোন, বলতে গেলে সারা জীবন যুদ্ধ ক'রে গেছেন ভাইয়ের সর্বরকম অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। তার মৃত্যুশয্যা এনে দিল তাঁকে জয়ের সম্মান। মায়ের কাছে চিঠিতে লিখছেন (২৮-১০-১৮৯১), 'ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ। গত রবিবার এমন একটি সুখবর পেলাম যা আমি পরম আনন্দের সঙ্গে স্মরণ রাখব চিরকাল। আর আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে মরবে না একটা পথভ্রষ্ট হতভাগ্য জীব—আজ সে মানুষের মত মানুষ, শহীদ, পুরুষোত্তম, যাকে তুমি নির্বাচন করেছ, ভগবান! ধন্যবাদ তোমায়, অজস্র ধন্যবাদ।'

এই আশ্চর্য অবিশ্বাসকে র‍্যাঁবো বহন ক'রে গেছেন তাঁর জীবনে, বিশেষত তাঁর কাব্যে, এক ঋজু, দৃঢ়চেতা, নির্লজ্জ, অতুলনীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে। নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন বহু দূরে, দেখতে চেয়েছেন পরিষ্কার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে, যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ মনে। বেদনা থেকে বিরাম খুঁজেছেন এক অপূর্ব ছেলেমানুষি আনন্দে, যে আনন্দ শুধু শিশুরাই উপভোগ করতে পারে। তাই আশ্চর্য হই না যখন এই কিশোরকে রায় দিতে দেখি উগো ও দ্য মুস্সে সম্বন্ধে—ওঁরা

নাকি 'colossal vulgarians'। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসকে এই গোল্লা
যাওয়া ছেলে যেন অগস্ত্যের এক গণ্ডূষ জলের মত একটি মাত্র ফুঁ'তে উপহা
ক'রে উড়িয়ে দিলেন। লিখলেন ষোল বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত
ব্যস, তারপর সব শেষ। 'ওসব নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না,' প
বলেছেন। আসলে, লেখবার আর কিছু ছিল না; তাঁর সমাজ, তাঁ
পারিপার্শ্বিক তাঁকে এমন কোনো নতুনতর মালমশলা জোগাতে পারেনি
নিয়ে তিনি আরো পরীক্ষা চালাতে পারতেন। নিরাসক্ত জাদুকর, কবি
তাঁর অনেকগুলি খেয়ালের একটি মাত্র বই তো নয় ('une de mes folies')

ফিরে যাওয়া যাক তাঁর জীবনে, পারী-কম্যুনের সেই গৌরবময় দিনগুলিতে
যখন সমস্ত ফ্রান্স বিপর্যস্ত, প্রুশীয় সেনাবাহিনী উপকণ্ঠে পৌঁচেছে—তখ
বলা বাহুল্য, রাজ্যেরও আর অস্তিত্ব নেই। পারী 'কম্যুনার'দের হস্তগত
ষোল বছর বয়স তখন, কবি হেঁটে আসছেন শার্লভিল থেকে প্রায় দেড়
মাইলের ওপর, পায়ে ঘা এবং শেষের দিকে প্রায় চলৎশক্তিহীন। প্র
বিপ্লবী শিবির যেটি পেলেন, সেখানে গিয়ে বললেন, আমাকে নাও তোমাদে
সংগ্রামে। এর আগে আরো এ-কবার এরকম ক'রে পারী পৌঁচেছিলে
—কিন্তু সেবার ধরা প'ড়ে যান, বন্দী হন এবং শেষে ফিরে আসেন বাড়িতে
এবার এক পক্ষ কালের মধ্যে শুধু আন্দোলনকারীদের দলে নামই লেখালেন ন
অনেক উল্লেখযোগ্য কীর্তিস্তম্ভ জ্বালিয়ে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া ইত্যা
ব্যাপারে হাত লাগালেন তাঁদের সঙ্গে। তবু এইভাবে আর কতদিন চল
পারে ? এবারও ফিরতে হ'ল—ছিন্ন কুটিকুটি জামাকাপড়ে, চরম রিক্ততা
দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মা, ছেলেকে ঘরে তুললেন। ছোট্ট সেই মফস্ব
শহরের নির্জনতা ও বিষণ্ণতা তাঁর যেন টুঁটি চেপে ধরল। শৈশব
কেটে গেছে এই একই ভাবে, কখনো পথে পথে, কখনো অর্বাচীন শহরে
নাম-না-জানা বাগানে বাগানে। তবু এবারের এই নির্জনতা আরো ভী
ঠেকল তাঁর কাছে। মনে রাখতে হবে, কবির সমগ্র কাব্যের পটভূমি
এই আশ্চর্য নির্জনতা। তাঁর ট্রাজেডিই হ'ল একেবারে একলা পথ হাঁটার।

ষোল বছরের একটি লেখা এখানে উদ্ধৃত করি—

'নিদাঘের সুনীল সন্ধ্যায় যাব আমি পায়ে-চলা পথ দিয়ে, করকরে শস্যের ওপর পা ফেলে, দ'লে যাব ছোট ছোট তৃণদল। স্বপ্নবিলাসী, পায়ে আমার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব—বাতাস যদি চায়, দিক সে ধুয়ে আমার নগ্ন মুখ।

'বলব না কথা, ভাববও না কিছু, অনন্তের প্রেমে পূর্ণ আমার হৃদয়—প্রকৃতির পথ দিয়ে চ'লে যাব দূরে, দূর হ'তে আরো দূরে ভবঘুরের মত—মন খুশিতে ভরপুর যেন সঙ্গিনী নিয়ে চলেছি কোনো।'

সঙ্গিনীর প্রয়োজন নেই, তাকে নিয়ে চলার অনুরূপ আনন্দ আপনার মনেই পেতে পারে এই কিশোর। এত অল্প বয়সে সঙ্গিনীর কথা কেন এবং সেই মোহ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রশ্নই বা কেন ? স্ত লায়ে বলছেন, শার্লভিলে সমবয়সী একটি প্রেমিকা ছিল র‍্যাঁবোর—সে পারী পর্যন্ত কবিকে অনুসরণ করে ও পরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। তাই তার কথা উঠলেই কবির মেঘাচ্ছন্ন মুখ, সমস্ত সত্ত্বেও মেয়েদের প্রতি এক অদ্ভুত ভাবপ্রবণ নির্লিপ্ততা, কখনো বা ঘৃণাও।

'প্রিয় আমার প্রেমিকারা, কত যে ঘৃণা তোমাদের করি !'

অথবা 'মাতাল তরণীর' সেই নির্বেদ, অথচ নির্বিকার ভাব :

তবু বৃথা কাঁদা ! জানি মর্মান্তিক উষার কালিমা,
চন্দ্রমা অসহ চিরকাল, তিক্ত রবি-রশ্মি-কণা :
কটুস্বাদ প্রেমে শুধু স্ফীত হবে মাতাল জড়িমা—
হায় দীর্ণ তরী, হায় নিরুদ্দেশ সমুদ্র-মন্ত্রণা !

শুধু প্রেম অথবা নারীর ব্যাপারেই নয়, ধর্মের ব্যাপারে, ঐতিহ্যের ব্যাপারে, জাগতিক সমস্ত সংস্কারের ব্যাপারে এই বালক ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত। তাই তার বাসনা, একবার ডুব দেবে সমস্ত আবেগের মধ্যে, চেখে চেখে দেখবে রাজ্যের যত রোগ, তাকে হ'তেই হবে বিশ্বের সব চেয়ে দুরারোগ্য রোগী, মুক্তি পাবার অযোগ্য অপরাধী, চিরকালের অভিশপ্ত আত্মা এবং সেই সঙ্গে, প্রবীণদের মধ্যে যিনি প্রাজ্ঞতম, তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত। অর্থাৎ এক কথায়

আজ পর্যন্ত সভ্যজগতের যা কিছু 'ট্যাবু', তাতে তো হাত পাকাবই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রধনুর যে স্বর্গীয় অনির্বচনীয়তা, তাকেও একবার ছোঁ মেরে কাছে টেনে আলিঙ্গন ক'রে নেব। হেন জাদুকরের রসায়নাগারে যে বস্তু উৎপন্ন হবে, তাতে নিশ্চয়ই সাধারণ প্রেম অথবা সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখ-বেদনার কথা সঞ্চিত হবে না। তাই একদিকে যেমন :

সুখের জাদুকরী অনুধ্যানে
রাখিনি কোনো ফাঁকি কোনোইখানে—

এবং

আশার পথে কখনো নয়,
উদয় পথে নয়—
সাধ্য আর সাধনা, সবই
বিড়ম্বনাময়।
আগামী চিরকালের তরে
আছে তো জানো প্রিয় :
রেশমে ঢাকা আগুন সেই
তোমার বহনীয়।

অন্যদিকে তেমনি :

'আমাকে টানে অর্থহীন ছবি, দরজার ওপর দিকটা, অসারগর্বীর পট, বিজ্ঞাপন-ফলক, লোকশিল্পের রং-চং, সেকেলে সাহিত্য, গির্জার ভাঙা ল্যাটিন, বানান-ভুলে ভর্তি আদিরসের বই, প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শিশুদের বই, রং-চ'টে-যাওয়া কাব্যগীতি, সরল, অস্থায়ী, অমার্জিত ছন্দ।'

এমন কি :

'আমার পছন্দ মরুভূমি, জ্বলে-যাওয়া ফলের বাগান, বিবর্ণ ম্লান দোকান, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া পানীয়। নিজেকে টেনে নিয়ে যাব পচা দুর্গন্ধের অলিগলি দিয়ে বদ্ধ আঁখির কাছে, উৎসর্গ করব সূর্যের চরণে, আগুনের যিনি দেবতা।...দংশ আসুক সরাইয়ের পেছনে প্রস্রাব-

খানার গন্ধে মাতাল হ'য়ে, মূত্রবৃদ্ধিকারক গুল্ম-উদ্ভিদের প্রেমিক সে—একটু রশ্মি ছিটিয়ে দিয়ে যাক।'

কাব্যের জগতে যা 'ট্যাবু' বা নিষিদ্ধ ঐতিহ্য-অনুসরণকারী কবির কাছে, জাদুকরের হাতে তা অস্ত্র।

ভেরলেনের কথা খানিকটা আনতে হয় এখানে। 'নরকে এক ঋতু'-র শেষে 'ঋতুর দল, বল দুর্গ-দল—কোন হৃদয়ে নেই ভুলের ছল' ইত্যাদির পরে র‍্যাঁবোর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ভয়, তাঁর মতিভ্রম তাঁর মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়েছে বড্ড। ভেরলেন তাঁকে নিয়ে পারী ছাড়তে চাইলেন—নতুন নতুন দেশ, সমুদ্র ইত্যাদির আশা দেখালেন। প্রলুব্ধ হলেন র‍্যাঁবো। উভয়ে উত্তরের দিকে পাড়ি দিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই ভেরলেনের সঙ্গ কবির কাছে অসহ হ'য়ে উঠতে লাগল। দুজনের স্বভাবগত বৈসাদৃশ্য প্রকট হ'তে আরম্ভ করল। ভেরলেন তাঁর চাপা কপাল, গর্তে ঢোকা ছোট দুটি ধূর্ত চোখ এবং স্থূল ও ক্ষুদ্র নাসিকা নিয়ে স্বভাবতই উদ্ধতপ্রকৃতি ও উন্নতগঠন র‍্যাঁবোকে নিয়ে কী করবেন ভেবে পেলেন না। ফলে তিনি হ'য়ে দাঁড়ালেন 'নরকে এক ঋতু'র 'পাগলিনী কুমারী', নির্বোধ ও ব্যর্থ প্রেমিকা। সদাসর্বদাই আহত হন, অথচ কাছ ছাড়তে পারেন না। একমাত্র ভয় তাঁর, দয়িত যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়। র‍্যাঁবো তাঁর উত্তর দিচ্ছেন 'নরকে এক ঋতু'তে :

'নরকের এক সঙ্গীর অকপট স্বগতোক্তি হ'তে :

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, তোমার সেবিকাদের মধ্যে দুঃখীতমা যে, তাকে অধিকার দাও আত্মনিবেদনের—"

'আমি ওর হৃদয়ে ছিলাম এক প্রাসাদের মত যা রিক্ত হ'য়ে গেছে ...কেন যে ওর ওপর এত নির্ভর করেছিলাম! কিন্তু আমার এই আলগা নীরস অস্তিত্ব নিয়ে কী করতে চেয়েছিল ও? ওর সংস্পর্শে তা' এতটুকু উন্নত হ'ল না—এক যদি মরতে পারি!...এই ভাবে দিনে দিনে আমার দুঃখ বেড়েই গেল, নিজেরই ভুল নিজের চোখে প্রকটতর

হ'য়ে উঠছে…। আবার ভ্রমণে বেরোব, শিকার করব মরু-প্রদেশে, ঘুমোব নাম-না-জানা শহরের পথছায়ায় অযত্নে, অক্লেশে। জাগব যখন, কুহকিনী শক্তির দাপটে রীতিনীতি সব গেছে পালটে—পৃথিবী সেই সমতা থেকেও মুক্তি দেবে আমাকে আমার ইচ্ছায়, আমার আনন্দে, আমার অনুদ্বেগে। ওঃ সেই দুঃসাহসী জীবন যা কেবল শিশু-সিরিজের বইয়ের পাতাতেই বিরাজ করে, নিজেকে ভোলবার জন্যে, মুক্তি পাবার জন্যে যার কথা ভেবে আমি এত দুঃখ পেয়েছি, তুমি কি তা দেবে আমায়?—ও তা পারবে না। ওর আদর্শে আমি বিশ্বাস করি না। আশা রাথবার জন্যে, অনুতাপ সঞ্চয়ের জন্যে কতই না বলেছে ও—তাতে আমার কী লাভ!…এই যে ফিটফাট যুবকটিকে দেখছ, ঢুকছে নিঃশব্দ সুন্দর বাড়িটির মধ্যে, নাম এর দুভাল, দুফুক্, আর্থা, মোরিস—আমি কি জানি না? এমন পাপী গর্দভটিকে একটি নারী সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল—আজ সে মৃতা, এতদিনে স্বর্গে সে নিশ্চয়ই কোনো মুনিঋষির আসনে অধিষ্ঠিতা। তুমিও আমায় মারবে তেমন ক'রে যেমন এই লোকটা মেরেছে সেই নারীকে।'

র‍্যাঁবোর এই জটিল কবি-মানসের পিছনে আছে বিচিত্র ঘটনা-সমাকীর্ণ তাঁর জীবন। সমস্যাগুলি সমস্তই সামাজিক। ফ্রান্সে, যেখানে বিশেষ ক'রে ধনতন্ত্রী সমাজের সংস্কৃতি তার সকল দোষগুণ নিয়ে বিকশিত হ'তে পেরেছিল, একমাত্র সেখানেই এই রকম কবির জন্ম সম্ভব। যে র‍্যাঁবো voyou, পানোন্মত্ত ছন্নছাড়া, তিনি হ'তে চাইলেন voyant, যথার্থ অর্থে দার্শনিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যের পথে না গিয়ে গেলেন ম্যাজিকের পথ ধ'রে আপাতসত্যের দ্বারীকে নমস্কার করতে, হ'লেন জাদুকর। অন্য ভাবে বলতে গেলে, যে র‍্যাঁবো voyou এবং যে র‍্যাঁবো voyant, তাঁদের দুজনের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এ ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না—একে কিশোর (যতই বিজ্ঞ হোন), তায় সেই সমাজ। কিন্তু সে-প্রশ্নে পরে আসব।

নারী সম্বন্ধে র‍্যাঁবোর এক ভাবপ্রবণ নির্লিপ্ততার কথা বলেছি।

আবার অন্যভাবে বলতে গেলে, নারী তাঁর কাব্যে এক মস্ত বড় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাকে তিনি দেখেছেন যথার্থ প্রকৃতির আসনে, পুরুষের থেকে পৃথক ক'রে, এবং বলেছেন, মনুষ্যত্বের ত্রুটি এইখানেই যে সে নারীকে মুক্তি দিতে পারেনি, বন্দী ক'রে রেখেছে। এই মুক্তির আকাশের দিকে চেয়ে থাকা বন্দিনী নারীর কথা অনেক জায়গায় তিনি বলেছেন। যেমন 'মাতাল তরণী'তে শহীদের প্রসঙ্গে নারীর কথা:

প্রান্তদেশে কটিবন্ধে আবদ্ধ শহীদ—নিরুপায়
নাচে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিরহ-নিশ্বাসে অনুক্ষণ:
আঁধার পুষ্পের দ্যুতি পীত হ'য়ে নয়নে ঘনায়,
আর আমি ব'সে থাকি নতজানু নারীর মতন!…

তবে এক্ষেত্রে যা উল্লেখযোগ্য ও বিস্ময়ের কথা, তা হচ্ছে এই যে ভেরলেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নারীর এই রকম প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে আর নেই বললেই হয়।

র‍্যাঁবোর কাব্য প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিকাটুকু ছাড়াও আরো যা আলোচনা করার থাকে, তা হচ্ছে তখনকার কাব্যিক আন্দোলন। চরম আত্মকেন্দ্রিকতা, অকারণ মানসিক বিক্ষোভ-জনিত অনুভূতি, আবেগ ও বাসনার সংকেত, ছায়াবাজি, এসব থেকে রেহাই পাওয়ার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সিম্বলিস্টদের পাগল ক'রে তুলেছিল। মুক্তি আনলেন বোদলেয়ার তাঁর 'মন্দ দিনের কুপুষ্পচয়ন' দিয়ে। সেই বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোর ভাষায় যিনি 'প্রথম দার্শনিক, কবিদের রাজা, সার্থক এক ঈশ্বর যেন।' বোদলেয়ার প্রবর্তিত 'আর্টিস্টে'র দুটি ধারা দুদিকে প্রবাহিত হ'ল—একদিকে রইলেন মালার্মে ও ভালেরি, অন্যদিকে র‍্যাঁবো ও তাঁর অনুসারী দুর্গম যাত্রীর দল। এঁরা অনুভব করলেন এমন একটি প্রয়োজন যার দ্বারা কবি তার সমস্ত জীবনকে রূপান্তরিত করতে পারবে, একেবারে সত্তার শুদ্ধ স্বরূপে গিয়ে আঙুল ছোঁয়াবে। 'আমি' ও বিশ্বের যে দ্বন্দ্ব, তার একটা সমন্বয় চাই। বোদলেয়ারের 'সম্বন্ধ' ('Correspondances') সনেটটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর র‍্যাঁবো সম্বন্ধে সবচেয়ে যা স্মরণীয়, তা তাঁর

১৮৭১ সালের ১৫ই মে তারিখে লেখা বিখ্যাত চিঠিটি যাতে তিনি কবির আদর্শ ব্যক্ত করেছেন, voyant হ'তে চেয়েছেন। তিনি বললেন, চোখ আর দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যে কাল্পনিক পর্দা আমরা টাঙিয়ে রেখেছি, তাকে তুলে দিতে হবে—যা দেখব, তা সরাসরিই দেখব, এবং সেইভাবেই তাকে ব্যক্ত করব।

মালার্মে, যদিও সমগোত্রীয় (অবশ্য একটু ভিন্ন অর্থে), র‍্যাঁবোর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ কতখানি অনুসৃত হয়েছে, -সে বিষয়ে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। র‍্যাঁবোকে বলেছেন 'spiritually exotic', একটা বিস্ফোরণ, যেন একটা উল্কা, কেবল আসার জন্যেই এসেছিলেন, তারপর সহসা অন্তর্হিত হলেন। র‍্যাঁবো তাঁর জবানবন্দী দিচ্ছেন, 'আমি' 'আমি' ক'রে চেঁচাচ্ছ তোমরা, কিন্ 'আমি' একটা অন্য জিনিস—ইন্দ্রিয়ানুভূতির চিরাচরিত জ্ঞানটাকে একটু ওলটাও পাল্টাও। বললেন, তামা থেকে যদি ভেরী তৈরি হয় এবং সেই ভেরী বেজে ওঠে, তার তো কোনো দোষ নেই—সেইটাকে বাস্তব জগতের একটা সত্য ব'লে মেনে নাও, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। কিন্তু ট্রাজেডি হ'ল এই যে র‍্যাঁবো নিজেই (মালার্মে, ভালেরি, কেউ বাদ নন) কাল্পনিক দর্শনের দ্বার আচ্ছন্ন, পানপ্রেমিক—আর মত্ততার ফলে চোখে যে রঙিন পর্দা চড়ে, সে পর্দার আলোকে তিনি দেখছেন নিজেকে—সে ধিক্কার এবং চেতনাও তাঁর বর্ণিত 'মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক' অনুতাপের হাসির মত দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। র‍্যাঁবোর অন্তরতলে যে-জাদুকরের বাস, সৃষ্টি তার ম নয়, তার মন্ত্র ধ্বংসের, বিপ্লবের—ঘাতকদের সময় তিনি বহন ক'রে এনেছে ('le temps des Assassins')। 'দীপালি'র মধ্যে অন্তত এমন তিন চার কবিতা আছে যার মধ্যে তাঁর এই আদিম বর্বর মনের ছবি ঝলকি হ'য়ে উঠেছে।

'মাতাল পূর্বাহ্নে'র শেষের দিকে বলছেন :

'মাতাল জাগরণের ছোট্ট একটু ক্ষণ, তুমি তখনই পবিত্র হয়েছ যখন আমাদের পুরস্কৃত করেছ তোমার এই মুখোসটুকুর দানে।

তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা যাব রীতির পথে—ভুলব না, আমাদের সমবয়সী সকলকে তুমি কাল ধন্য করেছ। গরলে আমাদের বিশ্বাস আছে। প্রতিটি দিন কী ক'রে জীবন উজাড় ক'রে দিতে হয়, জানি আমরা।

এই তো ঘাতকের সময়।'

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই কবিতাটির সঙ্গে বোদলেয়ারের 'Enivrez-vous'-র ('মাতাল করো তোমাদের') তুলনা না-ক'রে পারি না। র‍্যাঁবো যেন অনেক জালে জড়িয়ে পড়া। তাঁর কাব্য অতুলনীয়—কিন্তু তা ভিন্ন।

সবচেয়ে বড় কথা যা এবং যা আমাদের মুখ্য আলোচ্য, র‍্যাঁবোর দর্শন ঐন্দ্রজালিক আলোকে ধৌত। এ শুধু একটা কথার কথাই নয়, বা যে অর্থে সমস্ত কবিই অল্পবিস্তর জাদুকর, সে অর্থে তিনিও জাদুকর, তাও বলা নয়—আসল সত্য এই সামান্য কথার চেয়ে অনেক বেশি। নৃতত্ত্বের এলাকায় পা যদি না-ও বাড়াই, যদি না দেখাই তাঁর কোন কবিতার কোনখানে পরস্পর-সংক্রামক (contagious) বা সহানুভূতি-সূচক (sympathetic) ম্যাজিকের নমুনা রয়েছে, তাতেও কিছু যায় আসে না। অনর্থক কতগুলো গূঢ় পরিভাষা ঢুকিয়ে আলোচনাকে ভারাক্রান্ত ক'রেও লাভ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা হচ্ছে এই, জাদুকরী বিদ্যার ওপর র‍্যাঁবোর একটু নেকনজর ছিল। তাঁর গদ্য ও পদ্যাংশের নানা জায়গায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই প্রবণতা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। 'স্বরবর্ণ' সনেটটি তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। কিন্তু আরো আছে। বাঁভিলকে উৎসর্গিত কবিতাটি, 'ফুলের প্রসঙ্গে কবিকে কী বললে সে', তার মধ্যে কোনো এক ফিগিয়ে-র (Figuier) নাম পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক ছিলেন একজন লেখক। তাঁর বই বার করতেন 'হাশেৎ' প্রকাশকরা। ভদ্রলোক বই লিখতেন গূঢ় সমস্ত তন্ত্রের ওপর, ম্যাজিকের ওপর, alchemy-র ওপর। শুধু তাঁর বই-ই যে র‍্যাঁবো অল্পবিস্তর মনোনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন, তা-ই নয়, গত শতাব্দীর শেষার্ধের খ্যাততম গূঢ় তান্ত্রিক এলিফাস লেভির রচনাবলীতেও তাঁর রীতিমত জ্ঞান ছিল। এগুলি প্রমাণিত সত্য।

'আগুন চুরি করা' যাঁর খেলা, যিনি 'অধ্যাত্ম-পথে নিজেকে শিকার' করতে বেরিয়েছিলেন, voyant হ'তে চেয়েছিলেন, 'absolute'-কে জয় করবেন ব'লে পণ করেছিলেন, ম্যাজিক ছাড়া তাঁর গতি কী? তাঁর ক্ষণায়ু সাহিত্যিক জীবনকে পিছনে ফেলে গেলেন অসীম জয়ের স্পর্ধায়, অভূতপূর্ব নির্লিপ্ততায়, সেই উনিশ বছরের কিশোর। নতুনতর খামখেয়ালির হাতে আবার আত্ম-সমর্পণ করলেন। কিন্তু হাজার ঝাড়-ফুঁক করেও যে রোগ সারাতে পারে নি, সেই জাদুকরেরই নিয়তি র‍্যাঁবোরও। কোনো 'absolute' পাননি তিনি। শুধু আশা রেখে গেলেন :

'ভোরবেলা ধীর এক আগ্রহে সম্পন্ন হ'য়ে আমরা পৌঁছব আশ্চর্য নগরীতে।'

৩

মনে পড়ে কোনো এক রবীন্দ্র-স্মৃতিসভায় এক নাম-করা গায়ককে রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি তার উত্তরে কিছু না-ব'লে শুধু কয়েকখানি গান গেয়ে দিলেন। এর চেয়ে ভালো উত্তর গায়ক দিতে পারতেন না। মায়াবী কবি র‍্যাঁবো সম্বন্ধে অনেক বললাম আমরা। বেশি বলায় আলোচনা শুধু ভারাক্রান্ত হয়। এবার কিছু উদ্ধৃতি করি তাঁর কাব্য থেকে। এক ধরনের সমালোচকদের মত, বেশি উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হ'য়ে যায়—কিন্তু র‍্যাঁবোর লেখা এত সংহত, এত ঐশ্বর্যপূর্ণ যে তাঁর থেকে উদ্ধৃতিতে আলোচনা তরল হ'য়ে যাওয়ার কোনো ভয়ই নেই কোনোখানে। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে যত প্রশ্ন, তার সবেরই উত্তর একমাত্র তাঁরই লেখার মধ্যে খুঁজতে হবে, আমাদের আলোচনার মধ্যে নিশ্চয়ই নয়।

উদ্ধৃতির প্রসঙ্গে আসলে তাঁর কাব্য থেকে পাতার পর পাতা তুলে দিতে ইচ্ছে করে। তবে সে লোভ সামলাতে হবে। অবকাশ কম আমাদের। আপাতত তুলে দিচ্ছি 'নরকে এক ঋতু'-র মুখবন্ধটুকু—পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম এই উনিশ বছরের জাদুকরটিকে বিচার করার দায়িত্ব :

'আগেকার দিনগুলো, ঠিক যদি স্মরণ হয়, জীবন আমার ছিল উৎসব যেন, যেখানে নিখিল হৃদয় এসে মেলে, সমস্ত সুরার স্রোত অনুকূল হয়।

একদিন সন্ধ্যায় সুন্দরকে বসিয়েছি কোলে, দেখি সে তিক্ত হ'ল, দেখি তাকে আঘাত করেছি আমি।

ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালাম মুখোমুখি।

পালালাম—হায় জাদুকরী, ভয়ংকরী, হায় রে ঘৃণা, যা কিছু সম্পদ আমার লুকোনো তোমার হাতে।

মন থেকে মানুষী আশার সমস্ত মুকুল নির্মূল ক'রে দিলাম। হিংস্র পশুর এক বীভৎস বধির বন্ধে গলা টিপে ধরলাম প্রতিটি আনন্দের।

ডাকলাম জল্লাদদের, মরবার আগে তাদের খাঁড়ার বাঁট কামড়ে ধরব ব'লে—জড়ো করলাম জাঁতার কল, তারা যেন দ'লে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে আমায় বালুর সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে। দুঃখই হ'ল ভগবান। কাদার মধ্যে বিছিয়ে দিলাম নিজেকে—পাপের হাওয়ায় হাওয়ায় শুকনো হলাম, অনর্থের পাকে পাকে চরকিবাজি খেলাম চমৎকার।

আর বসন্ত এনে দিল আমায় নির্বোধের অপূর্ব এক হাসি।

অবশেষে শেষ প্রবঞ্চনার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মনে হ'ল দেখি না কেন খুঁজে আমার হারিয়ে যাওয়া উৎসবের চাবিটি, পেলেও পেতে পারি আবার স্পৃহা জীবনে!

সেই চাবিটি, দয়া তার নাম। হঠাৎ এই প্রেরণা—এ শুধু স্বপ্ন, জানি। স্বপ্নই দেখলাম। "থাক এইখানে, তরক্ষু কোথাকার" ইত্যাদি, চেঁচিয়ে উঠল দৈত্য, যার দেওয়া এমন আশ্চর্য মালা পরেছি আফিম গাছের, "সঞ্চয় ক'রে চল মৃত্যু তোর স্পৃহায় স্পৃহায়, তোর মূঢ় আত্মম্ভরিতায়, তোর পাপের যত অমূল্য উপচারে।"

একটু বাড়াবাড়ি হ'ল না? হে শয়তান, বন্ধু আমার, কথা

২

রাখো, কটাক্ষটা স্তিমিত করো—লেখকের কাছে তুমি যা চাও,
বর্ণনা নয়, উপদেশ নয়, শুধু ছোট সেই সব অর্ধস্ফুট ভীরু কথা—
তার বদলে আজ তোমাকে ছিঁড়ে দিই আমার অভিশপ্ত ইস্তাহারের
কয়েকটি গোপন পত্রপুট।'

'নরকে এক ঋতু' সম্বন্ধে অনেকে বলেছেন, এতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশি হয়েছে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা—অন্তত সাময়িকভাবে নরকে কাল কাটাতে হয় মানুষকে। আমাদের মনে হয়, এ-ভাবে না-দেখলেও চলে এবং এ-ভা দেখা উচিতও নয় র‍্যাঁবোকে। এ-নরক তাঁর একান্তভাবে আপনার, এ সে ধ্বংসোন্মুখ জটিল সমাজ ও সভ্যতার অনিবার্য সৃষ্টি যেখানে মানুষ নিজে ঘৃণা করতে শেখে ('merde pour moi') নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকে কিম্ভূতকিমাকার সব সম্বন্ধ গজিয়ে ওঠে, ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, ঈশ্বরে গালাগাল দেয় ('merde `a Dieu', 'merde' মানে বিষ্ঠা)।

আমরা চলে আসছি তাঁর এক অতি বিখ্যাত কবিতায়, 'বুভুক্ষা'তে- উনিশ বছর বয়সেই লেখা। যে-র‍্যাঁবো voyou, পানোন্মত্ত ছন্নছাড় তিনি অন্য কোনোখানেই তাঁর এই প্রবণতা এত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেননি যেমন এখানে করেছেন। এখানে দুটি জিনিষ লক্ষ্য করবার। প্রথম সেই জাদুকর যে, কোনো বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মত চক্রবাক-হৃদয়, ফুটো হাঁ ও নানান অর্বাচীন গুল্ম-উদ্ভিদের শিকড় একত্র ক'রে অদ্ভুত সাধনায় ব্র হয়েছে—কী সে তৈরি করতে চায়, কে জানে! অন্যদিকে এখানে লক্ষ করবার সেই র‍্যাঁবোকে যিনি সমাজের সমস্ত গরল পান ক'রে নীলক হ'তে উদ্যত।

কবিতাটি সম্পূর্ণভাবে না তুলে দিয়ে আমার উপায় নেই—এর প্রতি পংক্তির মধ্যে দিয়েই সেই জাদুকর ও সেই সর্বধ্বংসী র‍্যাঁবো নিজেকে ঘোষ করেছেন যেন রক্তের অক্ষরে :

রুচি যদি থাকে কিছুতেই,
তবে মাটিতেই আর নুড়িতেই—

শুধু হাওয়া খেয়ে আমি ভরপুর,
খাই অঙ্গার, শিলা, লোহা-চুর।

হায় বুভুক্ষা ওন্টাও,
তুমি চ'ষে বেড়াও
ভুষি, যতু, তৃণদল,
চুম্বন করো ধুতুরার নীল উজ্জ্বল হলাহল;
ঝামা আর ভাঙা পোড়া ইট থান থান,
ভক্ষণ কর গির্জার বুড়ো পাথর বিলীনজ্যোতি,
ধুসর উপত্যকায় রোপিত যে-গম হারানো নাম,
বিস্তৃত কোন বন্যা-তাড়িত যে-নুড়ি লুপ্তগতি।

নেকড়ে যেমন চেঁচায় পাতার আড়ালে,
কুটিকুটি করে চারু সুকুমার ডানা,
মুরগির ভোজে মজায় মনটা মাতালে—
আমারও খাওয়ার ধরন তেমনিপনা।

ফল বল আর শাকসব্জীই বল,
মরসুম চেয়ে কাল তারা গুনবেই—
লতিকাবনের উর্ণনাভের খল,
ভায়োলেটে ছাড়া রুচি নেই তার নেই।

নির্ভাবনায় তাই ঘুম দিই; সলোমন মহারাজের
যজ্ঞবেদীতে টগবগ করে জল:
সে-ঝোল তরল মরচে পুড়িয়ে ছুটেছে সকল পথের
পারে যেইখানে পাতাল প্রবাহ গর্জায় কলকল।

কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে 'নরকে এক ঋতু' ও 'দীপালি'-র ('Illuminations') মধ্যে মূল তফাৎ হ'ল এই যে প্রথমটিতে অজ্ঞানতার আবহাওয়ায় আত্মানুসন্ধান, যে-অনুসন্ধানে ধ্বনিত হয়েছে কোনোরকমে অপরলোকে পৌঁছে যাওয়ার এক প্রাণপণ অথচ সামঞ্জস্যহীন উদ্যম; কিন্তু অন্যটি শুধু প্রতিচ্ছবি, প্রভাব, যাতে মন যেন দর্পণে প্রতিফলিত। অনেকে আবার উল্টে বলেছেন, এ-দুয়ের মধ্যে কোনোরকম যোগসূত্র স্থাপন করাই

বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, এখানেও এমন কিছু কিছু লেখা পাওয়া যা যা অন্ধকারময় গূঢ়তন্ত্রের আলোকে আলোকিত। দুটি মাত্র উদাহরণ দিই। 'শৈশবে'র তৃতীয় অংশটি নেওয়া যাক প্রথমে :

'ঐ বনে একটি পাখি আছে, তার গানে তুমি থেমে দাঁড়াবে, তা তোমায় লজ্জা দেবে। একটা ঘড়ি আছে যা বাজে না।

প্যাচপেচে ঐ কাদার মধ্যে আছে একটি নীড় যাতে থাকে শাদা শাদা সব পাখিরা। একটা গির্জা আছে অধোমুখী, এবং একটি হ্রদ ওপরে উঠে গেছে।

ঝোপের মধ্যে ছোট্ট একটি গাড়ি পাবে—পরিত্যক্ত; অথবা সে রেশমি সুতোয় জড়ানো, পায়ে-চলা পথ দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে ছুটতে ছুটতে।

ছোটখাটো একটা যাত্রার দলও পাবে, তাদের বিচিত্র সাজগোজে —বনান্তের ধারের রাস্তায় তাদের দেখা মিলবে।

সব শেষে, যদি তোমার খিদে পায় কি তেষ্টা পায়, এমন কাউকে কাউকে খুঁজে পাবেই তুমি যে তোমায় পেছু-তাড়া করেছে।'

বিখ্যাত গুহ্য তান্ত্রিক এলিফাস লেভির নাম আগে করেছি। তাঁর তপস্যা র‍্যাঁবোও হলেন উদ্বুদ্ধ। 'দীপালির' 'H' কবিতাটিতে যৌন আচারকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক কথায়, কবিতাটি যেন যোনি সংক্রান্ত কোনো বীজমন্ত্র।

'যত রকম পাশবিকতা আছে, সকলকে হার মানায় অরতাঁসের (Hortense) উৎকট অঙ্গভঙ্গি। তার একাকীত্ব শৃঙ্গাররসের কৌশল, তার ক্লান্তিতেও প্রেম প্রাণবন্ত। বহু যুগযুগান্তরে যখন সে ছিল কোনো শৈশবের অভিভাবনায়, তখনো জাতির শরীরে সেই তো বহ্নিমান অংশ। তার দ্বার মুক্ত রয়েছে, মূর্তিমান দুঃখ।'

উদ্ধৃতির এই প্রসঙ্গ শেষ করি 'স্বরবর্ণ' দিয়ে। প্রতীক বা সিম্বল এখানে কোন পর্যায়ে পৌঁচেছে, তা দেখবার মত বস্তু। আসলে শোনা যায়, অক্ষরগুলির সঙ্গে রঙের এই সম্বন্ধের ধারণা কিশোর কবি পেয়েছিলেন এক পুরোনো বর্ণপরিচয়ের বই থেকে। 'নরকে এক ঋতু'তে 'জাদুকরী ক্রিয়া'র মধ্যে বলছেন, 'বার করেছি স্বরবর্ণের রং—আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ—প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ ক'রে দিয়েছি; আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম ক্রিয়াপদ আবিষ্কার করতে যা একদিন না একদিন প্রযোজ্য হ'তে পারবে সমস্ত অর্থে; এই অনুবাদের সর্বস্বত্ব আমি সংরক্ষিত ক'রে রাখলাম।'

এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে—সে বলছিল, যখন সে গান শোনে, স্বর ওঠা-নামা করে, তখন সে যেন মনে মনে নানান রকম রঙের খেলা দেখতে পায়। সেখানে সংগীত ও বর্ণ, এখানে বর্ণ ও সাহিত্য।

এই সনেটটিতে আমরা দেখব, র‍্যাঁবো আরম্ভ করছেন 'একদিন' তিনি স্বরবর্ণদের পরিচয় বলবেন ব'লে—কিন্তু পরে হঠাৎ কোন এক মিষ্টিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ব'লে যাচ্ছেন তাদের পরিচয়, যেন তারা বাস্তবিকই সেই রকমই, যেহেতু তারা তাঁর মনে সেইভাবে স্থান পেয়েছে। এই চেতনা সম্পূর্ণভাবেই ঐন্দ্রজালিক। এখানেই প্রশ্ন ওঠে কল্পনার সর্বশক্তিমত্তা অথবা 'omnipotence of ideas'-এর। পাঠকরা আমাকে ক্ষমা করবেন যদি ঋগ্বেদের একটি ম্যাজিক মন্ত্রের (১০.৯৮.১—৭) প্রসঙ্গ এখানে আনি যেখানে যজ্ঞ পুরোহিত দেবাপি প্রথমে প্রার্থনা করছেন দেবতার কাছে বৃষ্টির জন্যে, তারপর কোনো দেবতার কোনো ধার না ধেরেই নিজেই বৃষ্টি নামিয়ে আনলেন এক আশ্চর্য ক্ষমতায়।

প্রথমে সনেটটি তুলে দিই। তারপর তার প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ নিয়ে ভিন্নভাবে আলোচনা করব।

আ কৃষ্ণ, অ শ্বেতবর্ণ, ই রক্ত, উ সবুজ, ও নীল :
স্বরবর্ণ, একদিন তোমাদের গূঢ় পরিচয়
শোনাব : আ, কৃষ্ণ নীবিবাস, ক্রূর পূতিগন্ধময়
রোমশ মৌমাছি তারে অবিনয়ে স্ফীত করে, থিল

মহা গুহার ;   অ, বাষ্প অথবা শিবির ঋজুরেখ,
বল্লম হিমবাহের, শ্বেত রাজা, কম্প্র পুষ্পদল ;
ই, লোহিত, রক্ত ইতস্তত, হাসি কোপন চঞ্চল
অথবা মদের শেষে ম্লান মধু অধরে ক্ষণেক ;

উ, আকাশবৃত্ত, স্পন্দমান দিব্য সবুজ সাগর,
শান্তি তাপিত জীবের, যে-শান্তি নিখিল জাদুকর
আঁকে স্নিগ্ধতার রসে চিন্তাশীল কুঞ্চিত কপোলে ;
ও, পরম ভেরী বাজে তীক্ষ্ণধার অপূর্ব স্বরিত,
লোক-লোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচকিত :
—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে।

'আ'—মূলে আছে A। ফরাসীরা উচ্চারণ করে আ-ই। তাই A-কে 'আ' করেছি। 'আ' কৃষ্ণ, সেই শূন্য যার থেকে সমস্ত কিছুই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—বর্ণমালার প্রথম বর্ণ, তাকে তুলনা করা হয়েছে তাই সৃষ্টির আরম্ভের সঙ্গে যা বর্বরতার দুঃস্বপ্নে কুটিল। 'A'কে যদি উল্টে V-র মত ক'রে দিই, তা যোনি-চিহ্নে পরিণত হয়। 'আ' তাই সেই নীবিবাস যা ক্রূর পূতিগন্ধময় রোমশ মৌমাছিদের দ্বারা অবিনয়ে স্ফীত, খিল মহা গুহার।

'অ'—মূলে আছে E। 'E'-র ফরাসী উচ্চারণ আমাদের 'অ' আর 'ও'-র মাঝামাঝি এমন একটা ব্যাপার যা বিদেশীদের আয়ত্ত করতে রীতিমত বেগ পেতে হয়। আমি বেগতিক দেখে 'অ' বসিয়ে দিয়েছি। 'E' মূর্তিমতী স্ত্রী, সৃষ্টির নিষ্ক্রিয় উপাদান, চাঁদ, ফুল, দৃষ্টি, মিথ্যা—আলোকের পথে উঠতে গেলে এদের সাহায্য অথবা অতিক্রম অপরিহার্য। 'E'-কে শুইয়ে দিয়ে এই রকম করা যাক : ш। হ'য়ে গেল ঋজুরেখ, শাদা থেকে এল হিমবাহের বল্লম ও শ্বেত রাজার প্রশ্ন। এই ভাবে E-কে শুইয়ে দিলে মনে হয়, এ যেন ভোরবেলার কোনো ফ্যাক্টরির চিমনির সারি, তলার রেখাটি নেমে-আসা সরলরেখ মেঘের পুঞ্জ।

'ই'—মূলে আছে I। যদিও ইংরিজি উচ্চারণ 'আই', ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'ই'। 'ই'-ই রেখেছি। 'ই' লোহিত, রক্ত ও কামের চিহ্ন (তুলনীয়

—'নরকে এক ঋতু'-র 'দুষ্ট শোণিত'), সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদানের সংগম এতে। 'I' কে যদি শুইয়ে দিই, হয় ⊢⊣, ঠোঁটের রূপ। ঠোঁটও লাল এবং তা থেকে হাসির কল্পনা, ম্লান হাসি, মত্ততার পরে অনুতাপের।

'উ'—মূলে আছে U। ফরাসীরা উচ্চারণ করে 'য়্যু'। 'U' শান্তি, ধ্যান ও বিজ্ঞানের রূপ। ক্লান্ত চোখে সবুজ প্রান্তর শান্তির স্নিগ্ধতা আনে। 'U'ও সবুজ। সমুদ্রের রংও সবুজ কোনো কোনো জায়গায়—তার তরঙ্গে তরঙ্গে অনেক 'U'-র সৃষ্টি হয়। সবুজের ফরাসী 'vert'—তাই আকাশবৃত্ত ও বিশ্ব-জগতের ('univers' ফরাসীতে বিশ্ব, তাকে ক'রে দেওয়া যাক 'U'ni+vert) প্রসন্ন দক্ষিণ রূপের কল্পনায় সবুজ চ'লে এল।

অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে ফরাসী 'vert' যেমন শুনতে পাতলা পাতলা লাগে, তেমনি ফরাসী 'U'-ও ততটা জোরালো ও গম্ভীর নয় যতটা জার্মান 'ü'। জার্মান grünএর (মানে ইংরিজিতে 'green' বা সবুজ) কল্পনা তাই আপনা থেকেই আসে তাদের ü হ'তে। ডাচ 'groen' ও ('খ্রুন' উচ্চারণে) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাই যাঁরা মৃদু আপত্তি তুলেছেন, তাঁরা বলেন, ফরাসী 'U-তে সবুজের কথা ততটা মনে হয় না যতটা নীল বা blue-র কল্পনা জাগে।

র‍্যাঁবোর কাব্যে সবুজের একটি বিশেষ আসন আছে। যেখানে সবুজের কথা আপনা হ'তে আসে না মনে, সেখানেও তিনি সবুজ চালিয়ে দিয়েছেন—যেমন 'মাতাল তরণী'তে : 'স্বপ্ন দেখি, ঝলসিত তুষারের সবুজ রজনী…'

'ও'—মূলে আছে O। ফরাসীরা উচ্চারণও করে 'ও'। 'O' ওমেগা, প্রাণ—'O'-র মধ্যে 'ডায়েলেকটিকে'র চেতনা। ওমেগা বা শেষ, দুই অর্থেই। বর্ণমালার শেষ অক্ষর, তাই একদিকে যখন নিছক অবসানের ইঙ্গিত, অন্যদিকে শেষ, লক্ষ্য বা গন্তব্য স্থান। ভেরী (ভেরীরও পিছন দিকটা 'O'-এর মতনই আকার) বাজছে অসীম নীলে—তাতে লোকলোকান্তরে দেবযোনি-পুরে মৌন সচকিত। 'O' ফিরে পাওয়া শাশ্বতীর প্রতীক।

আবার ফিরে পেয়েছি তারে।
কারে ?—শাশ্বতীরে।

'রোমশ মৌমাছি' থেকে উঠলেন র‍্যাঁবো 'নীল কিরণ-হিল্লোলে'।

কাণ্ড-কারখানা দেখে এলিঅট বললেন : 'After such knowledge, what forgiveness ?'

কিন্তু ক্ষমা চেয়েছিল কে ?

তিনটি কবিতা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আর একটু আগে

আঁধার নামে গগনে, রাত্রি নামে নয়নে আমার—স্মরণে আমার ফিরে-পাওয়া সুরভির ঢেউ :

রাত্রি নামে শ্রান্তির পরে, মায়ের স্নেহের হাত দূর হ'তে দুরান্তরে—রাত্রি নামে বনানীর চেতনায়।

আর একটু আগে, যখন সারাদিনের ঝড়ের শেষে সন্ধ্যার সূর্য ফিরে পেল ছলছল জ্যোতির কণিকা,

সহসা শুনলাম মানুষের শ্রমের যে-সম্মান ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে মাঠে, তাকে নমস্কার ক'রে গেল চিরকালের দেবতা।

সেখানেও

চোখে আমার জল, সে-জল শুধু তন্দ্রার, সে শুধু স্বপ্নের—তার দিকে চেয়ো না। হৃদয়ে আমার ব্যথা, সে-ব্যথা শুধু ক্লান্তির—তাকে ভুল বুঝো না।

প্রবাসী মন আমার বিভ্রান্ত পারাবাত, উড়েই চলেছে : অন্ধকার কাটল না।

বড় ভয় করি এই কথাকে—সে আমায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে কেবলি নিয়ে যায় যে-পারে যেতে চাই তার অন্য পারে ;

জেনো শুধু, আমার অক্ষম বাণী যেখানে পৌঁছোল না, সেখানেও আমি আছি, ভালোবাসি।

সে

লিখেছিলাম দিনের পর দিন, আজ তাদের ছিঁড়ে ফেলে দিলাম : বহু যোজন পার-হ'য়ে-আসা পথের নামলো অবচ্ছেদ। কুটিকুটি ছিন্ন মেঘে সন্ধ্যাও হ'ল এক বিষণ্ণ পাণ্ডুলিপি।

রাত্রি নামেনি এখনো।

আঁধার ভেদ ক'রে সে আমার দিকে চেয়ে আছে, চেয়েই আছে—আসন্ন অমানিশায় দূর হ'তে শুনি সমুদ্র-গর্জন :

সে যে আমার পাশে, আমার ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায়, সে রয়েছে নিলীন আমার কালকের রাগিণীতে।

দিনযাপন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কী তবে আমার কাজ : কী কর্তব্য বলো না যখন
প্রত্যহ দৈনিকে পড়ি পৃথিবীর আসন্ন বিলয়
যন্ত্রের বিকৃত দ্বন্দ্বে। রাজনীতিবিদ্ অনুক্ষণ
মাতায় বিমর্ষ দেশ বক্তৃতায় ; ক্লান্ত চোখে ভয়
রমণীর, দয়িতার,—শান্তিপারাবত খুঁজে-খুঁজে
যদিও উধাও প্রাণ, অন্যদিকে যুদ্ধবাজদের
উন্মত্ত হুংকার শুধু, স্মিত শিশু মাঠের সবুজে
ছায়া দেখে চোখ বোঁজে। পশ্চিমেও ইউরোপে ঢের
জোট, দল, আন্দোলন ; দ্রুততাল প্রচারের ফলে
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যার ছায়া ; পক্ষান্তরে সুদূরপ্রাচ্যের
দুর্গম অরণ্যে দ্বীপে রজনীর অন্ধকারে চুপে
কোরিয়ায় তাইয়ানে ইন্দোচীনে মালয়-জঙ্গলে
ষড়যন্ত্র চলে রোজ ; বর্বরের লালসার যূপে
রক্ত ঢালে নির্বিরোধ অজস্র শহীদ অবিরাম।
রাম নেই, অযোধ্যাও নেই ; আছে রাজনীতিবিদ্
প্রকৃত বিমূঢ়প্রাণ নায়কেরা ; সংবাদকাগজে
তাঁদের বিচিত্র কীর্তি রোজ পড়ি—যদিও শহীদ
এদিকে সংখ্যায় বাড়ে, সাধারণ লোকের মগজে
বাষ্পের উত্তাপ শুধু, শস্যহীন ফসলের মাঠে
ধু-ধু জ্বলে খররৌদ্র, ম্লানছায়া জনশূন্য হাটে।

কী তবে আমার কাজ : আমিও তো নিরীহ মানুষ
শান্তি খুঁজি জীবিকা অর্জনে ; আরো অনেকের মতো
সংসারের ঘূর্ণাবর্তে হন্নে হ'য়ে ওড়াই ফানুষ

অপার্থিব কল্পনার ; যদিও রয়েছে সমুদ্যত
সমুখেই ব্যর্থতার নিশ্চিত বিকার। আছি ভুলে
বিড়ম্বিত মৃত্যুভয় ; অবিরাম সংসারের কাছে
নৈপুণ্য প্রার্থনা ক'রে আবর্তের জট খুলে-খুলে
সমুখে এগোই ধীরে-ধীরে। আমি যদিও নাস্তিক
প্রকাশ্য বিতর্ককালে, তবু যেন মনের গহনে
কোথায় সংশয় বাধে। পরিপূর্ণ নির্মম নির্ভীক
হ'তে যে পারিনি সেই ভাবনাই সন্তাপিত মনে
বাজায় বিষণ্ণ একতারা। পক্ষান্তরে বন্ধুজন
অনেকেই প্রতিষ্ঠিত, বিয়োগান্ত সংসারকে ছেঁকে
অন্তত কিছুটা রসে রঙ্গময় ক'রেছে জীবন।
তোষামোদে আপ্তবাক্যে অভ্যস্তই, দিয়ে জলাঞ্জলি
সুমার্জিত রুচিবোধে সংসারের সাগরসঙ্গমে
ডুব দিয়ে তোলে সোনা, দেখায় নিয়ত বৃদ্ধাঙ্গুলি
আজন্মসঞ্চিত যতো আদর্শকে ; এমনকি, প্রেমে
যদি পড়ে, সহজেই অবশেষে প্রেমাস্পদা ছেড়ে
পিতৃসত্য পালনার্থে পঞ্চদশীকেই পত্নী মেনে
ভাসায় সোনার তরী ; পক্ষান্তরে কালের প্রাচীরে
লাল অক্ষরের লেখা ; মাঠে-মাঠে বজ্রাহত লোক
বেকারির ঘূর্ণাবর্তে খাবি খেয়ে বিমর্ষ মিছিলে
বারংবার ভিড় করে, ঝলকিত করে বিশ্বলোক
সর্বস্বান্ত পণ্ডশ্রমে, কৃষ্ণছায়া অবরুদ্ধ নীলে।

কী তবে আমার কাজ : অবিরাম উত্থানপতনে
বিদীর্ণ কল্পান্ত কাঁপে, মধ্যবিত্ত ছা-পোষা মানুষ
আরো অনেকের মতো আমিও ছুটেছি প্রাণপণে
নারী, স্বর্ণ, গান নয়, লুপ্তপ্রায় স্বস্তির সন্ধানে

পথে মাঠে তেপান্তরে ; পথকষ্টে প্রায় দীর্ণপ্রাণ ;
তবুও দুর্মর আশা মুহূর্তেই আনে চঞ্চলতা
বিধ্বস্ত প্রাণের পাত্রে,—বারংবার তীব্র আত্মদান
করার সংকল্প নিয়ে ফিরে আসি ; প্রাণের শূন্যতা
ভরে না সংকল্পে শুধু ; অন্ধকারে যে দিকে তাকাই
নিষ্ফল জোনাকি ছাড়া অন্য কোনো আলোর মশাল
রিক্তপ্রাণে আনে না আশ্বাস ; সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরে
বারান্দার কোণে ব'সে আকাশের নীল তারা গুনে
কিছুটা সময় কাটে। কখনো বা রোগীর শিয়রে
ব'সে-ব'সে নানা কথা ভাবি তার পরিচর্যাকালে
জন্ম-মৃত্যু-ভবিষ্যৎ নিয়ে। চন্দ্রালোকে ঘর ভরে
সহসা নিথর রাতে। কোথায় দু'হাতে স্নিগ্ধ ফুল
ছড়ায় আঘ্রাণ বনতলে ; মত্ত বাতাসের ঢেউ
মুখে চোখে বেগে লাগে, মনে পড়ে এদিনেও কেউ
দূরের মাঠের পথে বাড়ি ফেরে শিস দিতে-দিতে
জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় মুখ রেখে ; কালো দীর্ঘ এলোচুল
তারই বউ চেয়ে দ্যাখে দূর মাঠে যেখানে শিমুল
দাঁড়ায় প্রাণের জোরে আকাশের দিকে ডানা মেলে
পরিপূর্ণ প্রতীক্ষায় ; মেঘলোকে নিভৃত পাখায়
বালুহাঁস উড়ে যায় জ্যোৎস্নামত্তা অজ্ঞাতযাত্রায়
অনুমিত অগ্রণীর অদৃশ্য সংকেতে। আর আমি
তন্দ্রাভাঙা শেষরাত্রে গলিপথে হরিধ্বনি শুনে
চমকে স্বরাজ্যে ফিরি, কল্পনার পাখা ছিন্ন ক'রে
শ্মশানযাত্রীর ধ্বনি হেঁকে যায় দূর থেকে দূরে।

কী তবে আমার কাজ : আমি জানি বাঁচে না মানুষ
স্মৃতিকে সম্বল ক'রে ; কল্পনার অনিত্য ফানুষ

উড়িয়েও শেষরক্ষা হয়নি কখনো কোনো কালে।
শুধু গতি, দুরন্ত দুর্বার বেগে একটি পদ্ধতি
সৃষ্টির গোপন মূলে কাজ করে,—যোগসূত্রহীন
আমরা তলিয়ে যাই সমুত্থিত ঢেউয়ের আড়ালে
বল্গাছাড়া ঝোড়ো দিনে; ব্যর্থকাম, থাকি রুদ্ধরতি,
জোয়ারের তীব্র টানে অনিবার্য হয় অধোগতি।
আজো তাই ক্রুদ্ধ বল্গাছাড়া দিনে দিগন্তে তাকিয়ে
নিশ্চিত আশ্বাস খুঁজে বারংবার রুদ্ধশ্বাস শ্রমে
স্তিমিত শরীর কাঁপে; ইউরোপে এশিয়ায় হানে
ক্রান্তি তার ক্রুদ্ধ বর্শা, কল্লান্তের নক্ষত্রসন্ধানে
দিগন্ত খণ্ডিত করে; আর আমি আবদ্ধ নগরে
আপন কর্তব্য খুঁজে নিদ্রাহীন রাত্রি যাপি ঘরে
বেদনাবিহ্বল ক্ষণে; বহুদূরে শোনা যায় যেন
গর্জনে উচ্ছ্বাসে জাগে অন্ধকারে সমুদ্র সফেন,
অন্বিষ্ট প্লাবনবেগ; কারা দৃঢ় পদক্ষেপে বেগে
সমুখে এগোয় পথে রাত্রিশেষে মরীয়া আবেগে
দীর্ঘ দৃপ্ত অভিযানে; সে-গতির তাপ ভগ্ন মনে
অকৃত্রিম অভিজ্ঞান সৃষ্টি করে যুগসন্ধিক্ষণে॥

আগ্নেয়

ফণিভূষণ আচার্য

তবে তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো দাহ
আমার এ-দেহে হেমন্ত-হিল্লোলে
আর দুলিয়ো না বৈদেহী হিন্দোলে
এ-হৃদয়ে আনো প্রণয়ের উৎসাহ।

তুমি গাও গান আনন্দে অনবদ্য
সুরের প্রসারে বুকে ডেকে আনো মেঘ
নীল আশ্বাসে কেড়ে নাও উদ্বেগ
উত্তাপে তুমি ফোটাও যে শ্বেতপদ্ম।

তোমার দু' চোখে আমার অহংকার
কী গভীর স্নেহে আকাশে ছড়াও সন্ধ্যা
রক্তে রক্তে বুনে যাও নিশিগন্ধা
বেণীবন্ধনে জড়াও অন্ধকার।

শ্বেত বাসনায় শাশ্বত অবগাহ
তাই যদি হয়, রক্তপলাশ ছিঁড়ে
কান্নায় আনো গান এ-অগ্নিনীড়ে
তবে তাই হোক, ক্ষমাতেই আনো দাহ॥

পুরোনো তৈলচিত্র

শামসুর রাহমান

পৃথিবী ঘুরছে নিত্য, ডিঙিয়ে শীতের বেড়া বসন্তের শিশু
প্রথামতো হানা দেয় উড়িয়ে নিশেন।
ফিরতি-পথে ফুল কিনে সন্ধ্যার পথিক
কড়া নেড়ে দরজায় যাকে পায় তার
আঁচলে প্রদীপ কাঁপে, প্রাণের হাওয়ায়
জানা কবিতার
উন্মীলিত ধ্বনি,
সামান্যের জিৎ :
দু'দণ্ড পুণ্যের জলে ডুবোও হৃদয়,
ধুয়ে নাও নরকের কালি।

তুমি আর পারবে না দাঁড়াতে সেখানে
জীবনের মুখর সারিতে
স্থানাভাবে,
দেয়ালেই আপন পৃথিবী।

বুক-ডোবা শান্ত জলে পাখি মেরে সূর্যাস্তের পরে
নিত্যসঙ্গী কুকুরের গলার শিকল শ্রান্ত হাতে
সুন্দরবনের রাতে ধোঁয়া-ওঠা তাঁবুর আরামে ফিরে আসা,
রহস্যসিরিজে ডুবে কাঁটা আর চামচের বিতর্কে উৎসুক
প্রহর কেটেছে যার জায়াপুত্রকন্যার সংসারে
অথবা চিল্কায় ছুটি সিমলায় ফগে আর পাহাড়ি হাওয়ায়

পত্নীর অভ্যস্ত প্রেমে তৃপ্ত মন (আপাতদর্শনে)
ব্যাঙ্কের অঙ্কের স্ফীতি ছিল যার স্বর্গসিঁড়ি তার

প্রস্থানের নেপথ্য নাটকে

সে কি তবু জেনে গেছে পৃথিবীর শেষ কোনো শ্লোক,
স্বপ্নে তাকে করেছে কি তাড়া চন্দ্রবোড়া, অন্তরালে
কে জানে হৃদয়ে তার ছিল কিনা কীটের উৎসব ॥

৩

এসো বধূ

আনন্দ বাগচী

আমার পিপাসা তুমি, অন্ধকার নিয়ে ঘর করো,
মৃত্যুকে নিপুণ ব্যঙ্গে ব্যর্থ করো এ এক বিস্ময়
করুণ গল্পের ঘর বারে বারে ঊর্ধ্বে তুলে ধরো
কী বিরল ব্যঞ্জনায় তাকে তুমি আঁকো বিশ্বময়।

আমার জিজ্ঞাসা তুমি। দেবতাকে পরাভূত ক'রে
মাটিকে বানাও তীর্থ, যৌবনের কলাবতী ক্ষয়
প্রেমের প্রার্থনা করো, দগ্ধ ঘুম বিস্ময়ের ঘোরে
পূর্ণ করো। আশ্চর্যাক্ষী পৃথিবীতে তুমি সুনির্ভয়।

ত্রিকালভামিনী দেখ কেকাসংহারের আয়োজন
নগরীর নগ্ন নখে; আলোকতীর্থের আনো বারি
অন্ধকার কথামৃতে মিটবে না আমার যৌবন;
নির্জন নায়িকা নও, তবু তুমি অকল্পিতা নারী।

কাকে যে চিনি না, যার যন্ত্রণার উত্তরাধিকার
আমার স্নায়ুর স্বপ্নে, সে কি তুমি সে কি তুমি হায়,
রৌদ্দুরে বিরহ জাগে এ কি কোনো মৌন রাধিকার?
দোরের কড়ায় শুনি দরবারি কানাড়া বেজে যায়।

এসো বধূ খুঁজে নাও তোমার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর,
ঘরকে পৃথিবী করো অনায়াসে, পৃথিবীকে ঘর॥

ভরা আঠারোর গান

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ভীরু চোখ লুব্ধ হলো জীবনের পণ্যবিপণিতে;
দূরের দ্বীপের ঘ্রাণ কাছের গভীর গূঢ় টানে
ভেসে এলো এ-হৃদয়ে। তীব্রবহা প্রগাঢ় শোণিতে
মাতাল মাল্লার মোহ ভাষা পেল পাল-ছেঁড়া গানে,
তবু যতো অনিয়মী, ততো যেন মনে হয় পরে
আরেক বন্দর আছে, বিচ্ছুরিত আঙুরের আভা
বিলাসী আঙুলে, ঠোঁটে, দেহতটে নিভৃত নারীর
ঢেলে দেবে পাথেয় প্রচুর। জীবনের হিংস্রতম থাবা
সহসা লুকাবে ভয়ে,—দাহদীপ্ত এ-তরবারির
উজ্জ্বল শরীরে তারি জরাজয়ী মন্ত্র ঝ'রে পড়ে।
বাতাসে সমুদ্রস্বাদ, জীবনের লবণাক্ত স্বেদে
শিল্পীর অতন্দ্র শ্রম সাড়া দেয় নিহিত নিয়মে,
তাকে চিনি যাকে চাই জাতিস্মর তারি প্রাণবেদে
প্রাণের পরাগ ভ'রে আকাঙ্ক্ষার গাঢ় মধু জমে;
ক্ষরিত রক্তের মতো বাসনার তীব্র অনুভূতি
ঢেউয়ের চিরায়ু সঙ্গী স্পর্শসহ গতির গভীরে—
কখনও সন্ধ্যার তীরে দু'দণ্ডের ব্যথার বিভূতি
জাগিয়ে আবার আসে কামনার একই মনে ফিরে।
কী বিচিত্র স্থিতিস্থাপকতা!
প্রেরণার একই স্তাবকতা
কখনও ডোবায় তরী, কখনও বা অনুকূল জলে
ভাসায় আবার তাকে পুরাতনী প্রণয়ের ছলে,
আঠারো বসন্ত ধ'রে কোকিলের একই বাঁধাবুলি
আমাকে শেখালো শুধু যা দূরের সবি যেন ভুলি,

ভুলি না যা কাছে এলো, যা আমার ব্যগ্রতার বুকে
সৃষ্টির নিহিতমন্ত্র ঢেলে দিলো সুপার্থিবা সুখে,
যা কখনো তার মুখ, সুনিবিড় তারি ভরা চোখে
সজল শ্রাবণ-শান্তি নিয়ে আসে খরদাহ শোকে,
কখনো আকাশ জুড়ে সে নারীর দেহ ভ'রে ওঠে—
যেখানে বাড়াই চোখ—তাকে ছুঁই, একই রং ফোটে
পৃথিবীর প্রতি ফুলে বাসনার বর্ণরাগে জ্ঞানী,
হৃদয়চারিণী
যাকে নিয়ে পাড়ি দিই অনিঃশেষ অজানার কূলে
দিগন্তে দ্বৈরথ তার মাটি পায় আরেক ভূগোলে,
যেখানে প্রাণের মন্ত্রে প্রাণে প্রাণে মিলিত মোহানা
যুগল পাখির মতো একই সুরে অপার সাহানা
তুলে ধরে অমলিন দিনে। মধুমূর্ত মমতার তাপে
প্রাণের নিভৃত ইচ্ছা স্পর্শাতুরা তন্ত্রী হ'য়ে কাঁপে,
অদূরে অনেক বাঁকে হয়তো বা নিখুঁত নিখাদে
খুঁজে নেবে সংগীতের মায়ারেখা মুগ্ধ অবকাশ,
আলোর আশ্বাস আজ হৃদয়ের অন্তহীন সাধে—
আঠারোয় আরক্ত আকাশ ॥

ক্লেমেণ্ট টাউন

রাজলক্ষ্মী দেবী

দিগন্তের স্তব্য হ'তে স্তব্ধ মধু ঝরে।
একটি কথাই পড়ি বার বার, রৌদ্র-লিপি, ছায়ার অক্ষরে।
শীতের দুপুরে বাড়ি-ভরা জানালায়
মিষ্টি রোদ একবার ছড়ায়, গড়ায় আর কখন পালায়!
বাইরে চেয়ার টেনে বসার ব্যর্থতা,
তাই তো, ফুরোয় দিন একে একে! মনে জমে কতগুলো কথা,
—যেগুলো বলার নয়, সেই সব কথা মন বলাবলি করে।
উলের সোনার কাঠি, উলের রুপোর কাঠি নড়ে আর চড়ে।

ঘুম ভেঙে শীতের সকালে
রোদ্দুর ছড়ায় এই সামনে মাঠের ঘাসে।—ডালিয়ার ডালে
হঠাৎ প্রচণ্ড লাল সদ্যফোটা ফুলের বিস্ময়।
জীবনটা একেবারে একঘেয়ে নয়।

ঝাঁকে ঝাঁকে কচি মুখ জমে ওঠে রাস্তার পাশে,
ইস্কুলের মস্ত বাস কাঁটা গুনে আটটায় আসে।
ধুলো ওড়া, কলরব,—পেট্রোল-সৌরভে মেশা,
আমারো অলস মনে কী-একটা করবার নেশা।
ঠিক যেন, রোদ্দুরে ব'সে ব'সে ঢের উল বুনবারো পরে
মিথ্যেই, মনে হয়, ফিরে যাওয়া ঘরে।

শাদা-শাদা দেশলাই-বাক্স সাজানো সারি সারি,
আমাদের বাড়ি।
দিগন্তে আঁকা আছে প্রভাতের আলোয় গৈরিক
স্তব্ধ শিবালিক।

এখানে শীতের রোদে ব্রেকফাস্ট সারা হয়ে গেলে
রুটির টুকরো ফেলে
ব'সে থাকি, লেজফোলা কাঠবেড়ালিটা ঠিক আসে,
শুঁকে শুঁকে ঘাসে,
রুটির টুকরো নিয়ে তখুনি নিখোঁজ।
রোজ।

দুপুরে রোদের বৃত্ত ঘুরে যায়। নেমে আসে ঘুম।
মুদিত পদ্মের মতো প'ড়ে থাকে ক্লেমেণ্ট টাউন।
ঘুমহীন কারো চোখ মিছিমিছি চেয়ে থাকে দূরে
লাল রাস্তাটা গেছে যে-খানটা ঘুরে।
চেয়ারটা টেনে এনে রোদে পিঠ দিয়ে উল-বোনার ব্যস্ততা।
মন ভাবে কতগুলো কথা।
কথা নয়, যেন এক ব্যঞ্জনায় ওতপ্রোত অনির্বচনীয় গুনগুন।
হৃদয় আকণ্ঠ ভরে সমস্ত দুপুর ধ'রে ক্লেমেণ্ট টাউন।

বিকেলে স্বল্পায়ু রোদ প'ড়ে আসে—
আঁকাবাঁকা ছায়া দেখি ঘাসে।
তারপর হাই তুলি,—ঘরে কিছু গোছগাছ প'ড়ে আছে যেন।
শীতের আরেক দিন ঝ'রে গেলো,—কেন?
অপূর্ব অতৃপ্তি নিয়ে সন্ধ্যা নামে,—কালকে পূর্বাশা
আবার জাগাবে সেই আশ্চর্য প্রত্যাশা।

আবার শীতের রোদ ঝলকাবে মাঠের শিশিরে,
একটি পুরোনো কথা মন আওড়াবে ফিরে ফিরে,
প্রত্যেক সকালে তা-ই রোদের রঙের মতো লাগবে নতুন।
হৃদয় ভোলালো, আহা,—ক্লেমেণ্ট টাউন।

নৌকাডুবি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে:
চক্রবালে শুভ্র মেঘপাল
নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে; কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল
স্নিগ্ধ বনান্তরে॥

খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু,
পায়ে-চলা পথে কে একাকী?
দু-চোখে সোনার স্বপ্ন; পসরার ফাঁকি আর বাকী
সহসা অগুরু॥

কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে: দ্রুত উবে যায়
মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ;
নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায়॥

নৌজীবী অগত্যা পান্থ; অনন্য সম্বল
মজ্জমান সাধের তরণী:
উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,
উদ্বৃত্ত মঙ্গল॥

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক:
অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা;
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক॥

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে,
হবে স্বাভাবিক ॥

অনুচিন্তন

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরসন্ধেয় বাদুড় যখন বেরোয়
অম্বর বেগে আকাশের নীল মন্থর পাখে পেরোয়—
আলো ক'মে এলে দিনের পাখিরা নেমে আসে যেই কুলায়ে
গৃহকাজ-সারা অবসর দেয় আনমনা মন ভুলায়ে
শহুরে আকাশে ঘুড়িগুলো সব একে-একে যেই নাবে
ছাদের আল্‌সে ধ'রে সে তখন কোনো কিছু যদি ভাবে—
সেই ভাবনাই আমার দু'চোখে রাত্তিরে আনে ঘুম
ঘুমের স্বপ্নে আনে এক ঝাঁক রূপকথা মরশুম !
সে-ছায়াই ক্রমে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে হ'য়ে যায় নিঃঝুম ।
সে-ছায়াই ডেকে আনে কোন্ ফাঁকে
ছায়া-রেণু-ঝরা শ্যামা সন্ধ্যাকে—
সাঁঝের দীপের শিখার শিখরে জমে কাজলের ধূম—
তখনো কি ধরা পড়ে নাকো তার মনে কোথা জাগে মরু,
কোথা জাগে দ্বীপ সজল শীতল, কোথা জাগে ছায়া-তরু ?
হলফ ক'রেই ব'লে দিতে পারি—ধরা পড়ে, ধরা পড়ে ;
একা-একা সেও ভোগে নিশ্চয় সারা রাত স্মৃতি-জ্বরে ।
সকালে আবার কাজের প্রবাহে
সেই সব স্মৃতি কোনখানে যায় ভেসে !
সন্ধে হ'লেই মন ওড়ে ফের
পুরোনো কথার জাবর কাটার দেশে ।
চিন্ময় চিরকালের জমিতে
শুরু ফের পদচারণা ।
দুর্নির্ণেয় জাদুর গণিতে
প্রাচীন ছন্দে নবীন ধ্বনিতে

পুন-পুন একই অনুপাতে অবতারণা!
অবাক্ কাণ্ড! বুঝিনে কিছুই, ভেবেও পাইনে দিশে—
ধ্যানে অনুচিন্তনের ছায়ায়
ভাবনা আমার তার ভাবনায়
একাত্ম হ'য়ে কখন যে যায় মিশে!

আজকে প্রার্থনা নয়

শান্তিকুমার ঘোষ

সে-দিনো ফিরেছে মেঘ দেশে-দেশে বার-বার কতকাল ধ'রে
বিজয়ী সৈন্যের মত ক্রীতদাস নারী আর গজদন্ত নিয়ে:
কেঁপেছে অনেক শিশু দীর্ণ ঘরে দুঃখী মার আঁচলের তলে।

রচিত মেঘের ছাদ নিকষ পাহাড় যেন চেপে ধরে বুক,
বজ্র আর অভিশাপ নামলো সমান বেগে—একাকী কৃষক হাহা মাঠে,
নিয়তি নিয়তি ব'লে দিয়েছি অনেক পূজা নুড়ি কিংবা বটবৃক্ষমূলে।

আজকে আকাশে দ্যাখো চূর্ণ নীল রশ্মি ঝরে চিড়-খাওয়া মেঘে—
চকচকে প্লেন এক কেমন সহজে চলে তাই চিরে-চিরে,—
মানচিত্র ভাসে নীচে দ্রাঘিমায়-দ্রাঘিমায় বিস্তীর্ণ জীবন সমুদ্রের।

শ্রমিক বন্ধুরা সব জ্বেলেছে প্রদীপ আজ পথের দু-ধারে কিংবা দূর
বাতিঘরে,
কত না সতর্ক দৃষ্টি বিজ্ঞানীর চোখে জাগে কত মানমন্দিরে যে প্রতি
মুহূর্তেই;
দণ্ড সে নিয়েছে তুলে অব্যর্থ পেশল হাতে—থেমেছে কালের পাশা
ভবিতব্যতার।

পাহাড় প্রান্তর পারে সমানে পাঠাও ভার দড়িকল বেয়ে,
বিরহ ক্ষণিক ছেদ; তোমার স্বদেশ হল সবজি-নীলে ঘেরা উপত্যকা,
এখন প্রার্থনা নয়, আদেশ করতে পারো, নিয়ে যাবে মেঘ।

কেয়া নেই

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সেই গাঁয়ে কতোদিন কেয়া নেই আর।
পুবালি বাতাস কেন পুরোনো জলের কথা ছিটিয়েছে এ-ঘরে আবার!
জানালার ধার থেকে মুছে নিয়ে গেছে আর্দ্র চুল তার এমনি ব্যথিত
অনেক আঁধার বেলা, মেঘের মন্থর খেলা, পাল তোলা, কাঁপা, অকথিত।
মেদুর মাটিল তার উরুর সুডোল রেখা ফুটে ওঠে হাওয়ার ঝাপটে,
আঙুলের ছায়া তারা ঝরিয়েছে কত জল, এক ফোঁটা আজো লাগে ঠোঁটে।
সেই চুলে যত ঘুম ঘুমিয়েছি, হ'য়ে গেছে চোখ মেলে চেয়ে থাকা আজ,
পুবালি বাতাস কেন মুখ চোখ পার হ'য়ে খোঁজে এত আনাচ কানাচ।
এমন নোঙরছেঁড়া ভরাবদরের দিন ভেসে এলো আকাশের চরে,
সেই গাঁয়ে কেয়া নেই, তবু জল, স্থল সেই সব জাগে বুকের ভিতরে।
মেঘ নামিয়েছে ঝুরি, চোখ তার ভরোভরো ভাদরের ধারার মতন,
ব্যথা নিয়ে চ'লে গেছে বৃন্দাবন পার হ'য়ে সময়ের উজানে কখন।

দুটি কবিতা

তরুণ সান্যাল

সমুদ্র

"For the sky and the sea, and the sea and the sky
Lay like a load on my weary eye,
And the dead were at my feet."
—S. T. Coleridge

সমুদ্র দেখিনি আমি, সমুদ্র কোথায় কত দূরে
কতটা দক্ষিণে, পুবে, কতটা পশ্চিমে আছে, তার
জানা আছে পরিমাপ ভূগোলের পাঠ্য তালিকার
বাল্যের অতৃপ্ত সাধ অসম্ভাব্য প্রাণের অঙ্কুরে।
অবশ্য নিশ্চিত জানা সমুদ্রের বিশাল উপমা,
জানি দিগন্তের ফ্রেমে বাঁধা এক যুগোত্তর ছবি—
কখনো তরঙ্গে তার ভৈরোঁ কিংবা সন্ধ্যার পূরবী,
অথবা মৃত্যুর দণ্ড কিংবা পরিশুদ্ধতার ক্ষমা।

অন্তত এটুকু জানা—সমুদ্রের প্রতীকলক্ষণ—
যত দূর পুরী, কন্যাকুমারিকা, বম্বাই বা জুহু
অথবা বিখ্যাত দ্বীপ, ফিঅর্ড লেগুন বহু, বহু
উদ্‌ভ্রান্ত স্মারকচিহ্নে ছেয়ে থাকে জীবন মরণ।
বাল্যে সে-সাগর চেনা। সে-কাল দিয়েছি তবু পাড়ি
উদ্ধত অস্তিত্বে শেষে প্রাণপণে করেছি জাহির—
মেয়েদের অন্ধ মনে কতখানি ভিতর বাহির
এবং সেখানে কত দ্বীপ, বাঁধ, বন্ধ্য বালিয়াড়ি।

যতবার ভালোবাসা দিয়ে আমি ভিজিয়েছি মন
জেনেছি সমুদ্রে হাত ডুবিয়েছি, জ্বলন্ত আত্মার

অনিবার্য বীজমন্ত্র আকাশের এপার ওপার
ফুঁড়ে ছুটে গেছে খুঁজে নীলকণ্ঠ অনন্ত যৌবন।
সমুদ্র অতৃপ্ত সাধ তৃষ্ণার ব্যাকুল সমাহার—
এটুকু বুঝেছি তাই রক্তের গভীর স্তরে কথা
যদি কেউ বলে তার সঙ্গীহীন অনন্ত ব্যর্থতা
বুদ্বুদের বিস্ফোরণে চেনে শুধু নিঃস্ব অহংকার।

সমুদ্রও শিল্পক্রীড়া। কাব্য আর কলার প্রসাদ
ভেবেছি অনেক পরে ফলিত বিদ্যার কাছাকাছি—
তিমির নির্জনে শূন্যে যখন গুটিয়ে ব'সে আছি
সমুদ্রকল্লোলে যেন কানে আসে মুক্তির সংবাদ।
বুঝেছি বালির মুখে মুখ গুঁজে অনেক কাঁকড়াও
স্বচ্ছন্দ উত্তাপ পায়—স্বাধীন হাঙর আর তিমি
হার্পুনের তীক্ষ্ণ ধারে গাঁথা হোলে ধূর্ত কালনেমি
কর্মিষ্ঠ নিক্তির ভাগে ভাগ্যবান—উদ্বৃত্ত ছাড়াও।

সগরসন্তান নই, শতমুখী গঙ্গার প্লাবনে
কোনোদিন পাবো কিনা শিবালিক পাহাড়ের স্মৃতি।
জানিনা কেবল জানি রক্তে গাঢ় বন্যার স্বীকৃতি
আরণ্যক অন্ধ ইচ্ছা টেনে আনে স্রোতের প্রাঙ্গণে।
একান্ত শৈশব থেকে সমুদ্র দেখার সাধ আছে—
অজান্তে সে সাধ মেটে দুধ আর ঘোলের তফাতে
সুনির্ভর পাণ্ডাদের পাওনা গণ্ডা দিয়ে হাতে হাতে
যেতে চাই সত্যকার চিরন্তন সমুদ্রের কাছে॥

অভিজ্ঞান

ভেবেছিলাম তোমার কথা সূর্যতারা সমন্বিত,
ভেবেছিলাম তুমিই আছো, তাই
দিনের ঠোঁটে রাতের ছোঁয়া সন্ধ্যা মেঘে অলংকৃত
ক্লান্তি দিয়ে শান্তি ফিরে পাই।
কত যে আশা ভালোবাসায়, তোমার নীল আসক্তিকে
সাগরসেঁচা মুক্তো ভাবি, আর
যে-কথা আছে রক্তে মিশে তোমাকে তাও জনান্তিকে—
জেনেছি—সে কী বুঝিয়ে বলা ভার॥

গিয়েছে দিন গিয়েছে রাত—ঋতুর হাতে বারোটা মাস
পড়েছে ঝরা ফুলের মত ঝরে—
হারিয়ে গেছে পরাগ তার আকাশ জুড়ে, হতাশ্বাস
কখন যেন হৃদয় দিলো ভ'রে।
তোমার যত কথার দোলা—খেয়াল খেলা বিপর্যয়ে
ঝরিয়ে দিলো পাপড়ি গোটা-গোটা,
যে-মন তুমি জড়িয়ে ছিলে, অনেক পাওয়া অসংশয়ে
সেখানে ফোটে রক্ত ফোঁটা-ফোঁটা॥

ভাবিনে আমি ভাবিনে তবু তোমার জ্বালা কতটা ব্যথা
সে-ব্যথা নাকি চোরাবালির চর—
জানিনে আমি জানিনে তাও, তোমার স্থির নির্ভরতা
উপমা দিই সাঁঝের সরোবর।
যে-প্রেম তুমি জালিয়েছিলে, যে-শিখা তুমি তৃপ্তিহীন
অকম্পিত বিজুরি রেখা—তাকে
কী দেবো আমি দেবার মতো, যে-আমি একা দীপ্তিহীন
সে-আমি জ্বলি দিনের বাঁকে-বাঁকে॥

প্রাণের যত মূল্য ছিলো, হে মেঘবতী, তোমাকে সে তো
দিয়েছি পুরো দানের অধিকার—
তোমার স্থির ঘাটের বাঁকে যে জ্বালা আছে অসংবৃত
জানি সে-জ্যোতি চন্দ্র তারকার।
ব্যথার ভীরু মূর্ছনাকে জেনেছি আমি, সে জেলে রাখে
কত না আশা প্রত্যাশার চাওয়া,
—আমায় তুমি দিয়েছো ঢের—এমন বড় মিথ্যাটাকে
জেনেছি আমি মস্ত বড় পাওয়া॥

একটি প্রশান্ত প্রার্থনা

সত্যেন্দ্র আচার্য

খেয়ালি আকাশের সঘন তন্দ্রায়
বনহরিণী চোখে কী ছায়া নিরজনে?
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায়?

সাগরে দীপ জেলে কেমনে সে-নাবিক
হাওয়ার নিকেতনে রূপসী তারা গোনে
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক।

হয়ত আকাশের খেয়ালি সে-খেলায়
তারারা দীপ জ্বালে নগরে উপবনে,
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায়?

তবু তো সুর আজ আকাশে সমধিক
নাবিক চমকায় চকিত উচাটনে,
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক।

স্পর্শ-মায়া কেন শিউলি যূথিকায়,
বৃষ্টি টলমল মেঘের রাঙা মনে,
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায়?

কী কথা আসে মেঘ সজল সে-মায়ায়
মায়াবী তন্দ্রার এ-কোন মণিদীপ?
কার সে ছায়াছবি চকিতে চমকায়?
জলের উপছায়া মমতা এনে দিক।

চতুর্দশপদী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি কবিতার শত্রু। কবিতার মদির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়—তুমি এলে আমার এ-ঘরে।
শুধু থাকে যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব
কামনার অন্ধকার বিশাল বৃষ্টির মতো ঝরে।

আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন ক'রে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন তমসায়,
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে ইচ্ছা করে সেথা যাই ভেসে
যেখানে তোমার মেঘে কবিতার ক্ষীণ শিখা নিঃশেষে মিলায়।

তুমি চ'লে গেলে দূরে—সূর্যমুখী উষার মতন
ফিরে আসে অন্য সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে
শূন্যের বিস্তার থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার-ভীরু মন
সে আমার যন্ত্রণাকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে।
কাব্যের সপত্নী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে,
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

সমর্পণ

নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে
জোয়ার এলো জলে,
লুকিয়ে-রাখা আশার মতো
বাঁশের ফাঁকে ইতস্তত
একটি দুটি ম্লান জোনাক
ক্বচিৎ নেবে, জ্বলে।
আকাশ ভরা মেঘের ভারে
বিদ্যুতের ব্যথা
গুমরে উঠে জানায় শুধু
অবোধ আকুলতা।
আকারহীন, হিংস্র, খল,
অনিশ্চিত ফেনিল জল
মিলিয়ে গেলো অদৃষ্টের
মৌন ইশারাতে ;—
তোমায় আমি রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

তাকিয়ে-থাকা একটি দীপ
জ্বলছে ছোটো ঘরে,
একটি হাত এলিয়ে আছে
কম্পমান বুকের কাছে
ছিন্ন-স্মৃতি-শেলাই-করা
শীতল কাঁথার 'পরে।

মনে পড়ার ইন্দ্রজালে
ঝাপসা হ'লো দ্বার,
আমার হাতে লাফিয়ে ওঠে
তীক্ষ্ণ তলোয়ার।
সুদূর কালে হারিয়ে-যাওয়া
দেশান্তরী উঠলো হাওয়া ;—
ছেলেবেলার গন্ধভরা
অন্ধকার রাতে
আমার প্রেম রেখে এলেম
ঈশ্বরের হাতে।

পালের ভাঁজে ভবিষ্যের
গর্ভ ওঠে ফুলে,
অনাগতের রুদ্ধ চাপে
পাটাতনের পাঁজর কাঁপে,
ত্রস্ত মাছের অস্থিরতায়
গলুই ওঠে দুলে।
কঠিন হাতে নাবিক ধরে
আকাঙ্ক্ষার হাল,
কপট স্রোতে ভাসে আমার
মৃতদেহের ছাল।
হৃদয়-তলে দাঁড়ের টানে
অমর নাম প্রলয় আনে
ঢেউয়ের আর দিগন্তের
মাতাল সংঘাতে ;—
আমার প্রাণ রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

উল্টো দিকে ছুটলো আমার
আঁধার আরাধনা ;
অসীম নীল ঘুমের 'পরে
যন্ত্রণায় জড়িয়ে ধরে
মুক্তিহীন জাগরণের
মূর্খ প্রতারণা।
তবুও আছে একটি ঘর
কুঞ্জলতায় ঘেরা,
দাওয়ায় ব'সে জটলা করে
পূর্বপুরুষেরা।
তাঁদের মৃদু ফিশফিশানি
পড়ুক ঝ'রে সাবধানী
হাজার ভয়, সংশয়ের
অন্ধ অজানাতে ;—
আমি তোমায় রেখে এলাম
ঈশ্বরের হাতে।

যাওয়া-আসা

আবার আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা,
নয়তো আমার মরণ-বেলায় কেমন ক'রে
হবে ক্ষমা।
কোথায় আমি চলেছি আজ বাঁকা পথে
ঘুরে-ঘুরে,
অস্ত-রবির অশ্রু-জলা আকাশ থেকে
অনেক দূরে।

এগিয়ে আসে অন্ধকার, দ্বন্দ্বে ঘেরা,
পিছনে ধায় আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গেরা,
সকল দিকে হাওয়ার বেগে বিশ্বময়
পরিক্রমা
বলে, আমায় ফিরতে হবে তোমার কাছে,
প্রিয়তমা।

অনেক ঢেউয়ের নোনায় ধরা ঝাপট-খাওয়া
নৌকো আমার
আলিঙ্গনের আবেগ-ভরা পাগল জলে
ভাসলো এবার।
স্রোতের টানে অন্তহীন স্মৃতির গান
কলস্বরে
ছড়িয়ে যায় ঝাপসা-নীল কৈশোরের
দিগন্তরে।
সেথায় কোন মায়ার-চোখ ছলোছলো
সান্ত্বনার প্রান্ত মোর ছুঁয়েছিলো,
সেই জলে না ডুবলে পরে কোনোখানেই
পৌছবো না ;—
তোমার কাছেই আবার আমায় ফিরতে হবে,
প্রিয়তমা।

দূরকে আমি ছুঁয়ে আছি অকূল জলের
কণায়-কণায়,
বিরামহীন তরল তান চিরকালের
মন্ত্র শোনায়।

বুঝি না তার কঠিন দয়া, কী নিষ্ঠুর
ভালোবাসা,
কেবল এই স্বপ্ন-রাতে এক হ'য়ে যায়
যাওয়া, আসা।
দেখেছি এক সাগর-তটে ইন্দ্রধনু
দহনহীন আগুন দিয়ে সাজায় তনু,
জেনেছি তার আলোয় ভরা শান্তি কোথায়
রইলো জমা ;—
আবার আমায় ডুবতে হবে তোমার গাঙে,
প্রিয়তমা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[১২৯৪—১৩৬১]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কাব্যের সেই যুগের প্রতিভূ, যখন রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেটা জেগে উঠেছে, কিন্তু অন্য পথ ঠিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেন একটা আলো-আঁধারি সময়, যখন নতুনের ঝিলিক দিচ্ছে জানলায়, অথচ ঘরের মধ্যে জড়ো হ'য়ে আছে পুরোনো আসবাবপত্র, ভারি, অনড়, মমতাময় অভ্যাস।

সব ক-টা জানলা খুলে নতুনের হাওয়া প্রথম যিনি সবেগে বইয়ে দিলেন, তিনি নজরুল ইসলাম। নজরুলের ছিলো দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই আজ উজ্জ্বলতম সেতু ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই শতকের তৃতীয় দশকে যে-কবিরা যুবক কিংবা কিশোর ছিলেন, তাঁদের নতুন কাব্য ইঙ্গিত পেয়েছিলো আরো দু-জন অগ্রজ সমসাময়িকের কাছে: তাঁরা মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

মোহিতলালের চরিত্রলক্ষণযুক্ত 'বিস্মরণী' যখন বেরোলো, ততদিনে, যতদূর মনে পড়ে, যতীন্দ্রনাথের 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' দুটোই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা 'কল্লোলে'র অর্বাচীনেরা যখন বিস্মিত হ'য়ে শুনছি 'বিস্মরণী'র বড়ো-বড়ো তাল, ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে-চলা কল্লোল, সেই সময়েই যতীন্দ্রনাথ আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে—সহজ, টাটকা, আটপৌরে, এবড়ো-খেবড়ো মাঠের উপর দিয়ে চৈত্র মাসের শুকনো হাওয়ার মধ্যে খুব ক'ষে গোরুর গাড়ি চালিয়ে নেবার মতো সুর]।

যতীন্দ্রনাথের কাছে কী পেয়েছিলাম আমরা? পেয়েছিলাম এই আশ্বাস যে আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎ থেকে সাংসারিক সমতলে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে। পেয়েছিলাম একটি উদাহরণ যে পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চ'লে এলেও কবিতার জাত যায় না। 'মরীচিকা'য় তিনি যে-তিন মাত্রার ছন্দকে অনেকটা গদ্যের ভঙ্গিতে বন্ধুরভাবে ব্যবহার

করেছিলেন, সেই ছন্দেরই একটি নির্দিষ্ট, সুপরিমিত প্রকরণ নিয়ে গ'ড়ে উঠলো অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র কবিতাবলী।

আরো কিছু পেয়েছিলাম। প্রথমত, প্রবন্ধধর্মী যুক্তিতর্কের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ এক-একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি ('রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা')—বিরল ব'লেই তাদের চমৎকারিত্ব যেন বেশি। দ্বিতীয়, একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ভিন্ন মানে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন থেকে ভিন্ন। যেমন রবীন্দ্রনাথের অবিরল অতীন্দ্রিয়তার পরে মোহিতলালের নির্ভয় দেহাত্মবোধে আমরা উৎসাহ পেয়েছিলাম, তেমনি, অন্য দিক থেকে যেন একটা নিশ্বাস-ফেলা নিষ্কৃতি ছিলো যতীন্দ্রনাথের সরল, বৈঠকী দুঃখবাদে। সৃষ্টির আনন্দময় অভিনন্দনে আবাল্য অভ্যস্ত আমরা সেই প্রথম শুনলুম ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ। 'আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য, মন্দ যদি সাতচল্লিশ ভালোর সংখ্যা সাতান্ন'—এর একেবারে বিরুদ্ধ কথা ব'লে যতীন্দ্রনাথ আমাদের মনোহরণ করলেন—

বন্ধু, বন্ধু গো,
ভালো চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশি নাহি তায় সন্দেহ।

স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিলেন তাঁর অবিশ্বাস—

ঈশ, মুশা আর বুদ্ধ
কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান:
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তার—তোমাদেরি তিনি চান;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
র'বে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ!
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল!
কি হবে কথার ছলে?
ভগবান চান—তবু হয় নাকো, একথা পাগলে বলে!

কথাটা উপাদেয় সন্দেহ নেই, হঠাৎ অকাট্য ব'লেও মনে হ'তে পারে, কিন্তু এ থেকে কোনো গতিশীল চিন্তার যে সূত্রপাত হ'তে পারে না সে-কথা

অবশ্য না-বললেও চলে। মানুষের জীবনে বা বিশ্ববিধানে দুঃখ জিনিশটা ঠিক কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেটা দেখতে হ'লে আর্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন হয়, কবির মধ্যে সেটা সব সময় আশা করাও সংগত হয় না। সমসাময়িক বাংলা কাব্যের উপরে যতীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে রূপের দিক থেকে, ভাবের দিক থেকে নয়; এতেও বোঝা যায় তাঁর দুঃখবাদ বা নেতিবাদের প্রধান গুণ ছিলো—অনুপ্রেরণার শক্তি নয়, শ্রান্তিহারক রমণীয়তা।

সুখের বিষয় এই যে যতীন্দ্রনাথের কবিত্ব তাঁর মতবাদের উপর নির্ভরশীল নয়, আর এই মতবাদও তাঁর কবিজীবনের প্রথম এবং একটি পর্যায়েই আবদ্ধ। তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যের পরিমাণ যদিও অত্যধিক নয়, তবু তাতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই; সাংসারিক জীবনের হাস্যচ্ছুরিত বর্ণনা থেকে ঈষৎ-গম্ভীর ভাবনা-মন্ত্রিত স্বগতোক্তি পর্যন্ত নানারকম বিভাগেই তাঁর আনাগোনা ছিলো! আজকের দিনের পাঠকের পক্ষে তাঁর কাব্য শুধু ঐতিহাসিক কারণে ঔৎসুক্য-জনক নয়, সেখানে উপভোগের জন্যও বিভিন্ন উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। বু. ব.

[গ্রন্থপঞ্জী : মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্, ত্রিযামা, অনুপূর্বা (সংকলন).]

বিজ্ঞপ্তি

কবি হেমচন্দ্র বাগচী আজ বহুকাল যাবৎ মানসিক পীড়ায় অসুস্থ আছেন। তাঁর সাহায্যকল্পে কবিতাভবনের উদ্যোগে ও প্রতিভা বসুর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" নাটক নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৩ই জুন ১৯৫৪ তারিখে অভিনীত হয়েছিলো। এই অভিনয়লব্ধ আট শত টাকা কবিকে পাঠানো হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর চিকিৎসা বা স্বাচ্ছন্দ্য যদি যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় তাহ'লে 'কবিতা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই তৃপ্তিকর হবে। আজকের দিনের পাঠকের হয়তো ঠিক স্মরণে নেই যে হেমচন্দ্র 'কল্লোল'-কালীন কবিদের অন্যতম, এবং, যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন, তাঁর রচনা 'কবিতা'য় নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা
কবিতা
পৌষ ১৩৬১
উনবিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮০

জীবনানন্দ দাশ

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনো ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে—সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-এর মতো সংক্ষিপ্ত, সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলো-ছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্‌টিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা', 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে' 'কবিতা'য় আর কোনো-কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গ্রথিত হয়নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকে উত্তেজনারও অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে-পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পংক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে মন্তব্য প'ড়েও তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ

লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের সূত্রপাতে, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্চ্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও,

অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে: প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্য্যন্ত মোটেই popularity অর্জ্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটে নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ;...তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, এবং আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।

জীবনানন্দ বাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।...তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়।...তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে মনে হয় না।...[তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্ব্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করে নি—যথা, "ফেঁড়ে," "নটকান," "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য এনেছে সে-কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এ জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। * * *

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্র বাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান;—সে মায়াপুরী হয়-তো আমরা কোনোদিন

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

স্বপ্নে দেখে থাকবো।…[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমচ্ছন্দ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে ;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মত তোড় এর নেই ;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এর প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর…বহু কবিতায়…পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সেই ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।…দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে।
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে।
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান।
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে।

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয় নি;—সব কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার…ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মত গুঞ্জন করে ভেসে যায়।

('প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি ?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ ? কখনো নাম শুনি নি তো !

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'…আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইন আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি…উভচর ভাষা অবলম্বন করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে ? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি ?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,

রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু—ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ ॥ তোমার, মতন কেউ। নাই আর ॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি।…শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল।…ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ।…ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়বে। ছাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।…অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে' লিখেছেন:

সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা?…যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে…কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?…আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দর কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয় করার প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐকাহিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই

নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পংক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে-করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমসাময়িক অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি

খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। অথচ সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে; 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে; তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পংক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনো হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পংক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমার পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না—কখনোই না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে

পারি যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত : যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধে'র সঙ্গী-কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই–কোনো এক বাণী,—আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক', পড়ি নাক' দুর্দশার গান···শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান'); আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায়, চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'); দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রোদ আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায়

আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়, চিলে' দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাতে' অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উত্তরোল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তল মূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পংক্তিগুলিতে, কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'সেই সব শেয়ালে'রা ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর

'O curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায়, চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'ওড টু এ নাইটেঙ্গেলে'-র কোনো-কোনো পংক্তি 'অবসরের গানে' বাংলার মাটিতে নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত, সুরবহুল, এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ;—এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা কয়েছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তু'লছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফ'ড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গভীর জয়' তিনি প্রকাশ করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এর আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে'। ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে ফের রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।...
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বথের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থু-থুরে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই...

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি হ'তো পরাজয়ের কবিতা, আর সেইজন্য নঙর্থক। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা আস্থার স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ, ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান উপাদান, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পংক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার, 'হাওয়ার রাতে' 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁরা ভেবে দেখবেন ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আরো দুটি কথা বিবেচ্য : জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা' ,-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন ; আর, তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানান ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে গানের অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে অন্য কেউ ব্যবহার করেননি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পংক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয় ; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনো-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রূপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা' ; আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা

সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী; 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই বৈজ্ঞানিক অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা আভাস এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত, অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি বাইবেলের সেই গল্প থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলো। অনেক বিশেষণও এই রকমই মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষ্যণীয়। শুধু বিশেষণে নয়; বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও নেই, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের;

যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা'; 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস অথবা সবুজ বুঝি ঘাস), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে সমস্ত পংক্তি আলোময় হ'য়ে উঠবে।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে।

ভব্যসমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, —শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়, আমাদের হৃদয় সুদ্ধু ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
> হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
>
> প্রেম ছিল, আশা ছিল, তবু সে দেখিল
> কোন ভূত?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

এই অনন্যতা বিষয়ে তাঁর অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি এই কথাটার অত্যধিক পুনরুক্তিবশত ধার ক্ষ'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনো সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, প্রশান্তির। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো, আধুনিক কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো উজ্জ্বল; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই

যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনাও যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণীয় যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

রবীন্দ্রোত্তর কোবিদ কবি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

'ঝরা পালকে'র দিন থেকে সুরু করে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-সংকলনের কাল, সময়ের হিসেবে যেমন দীর্ঘ তেম্নি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পক্ষেও প্রশস্ত। জীবনানন্দ দাশ এই দীর্ঘদিনব্যাপী কাব্য-অভিজ্ঞতা আহরণ ও পরিবেষণ করেছেন। এ-সময়টাতে শুধু এ-কাজে ব্রতী থাকা যে-চিত্তের প্রেরণায়, তাকে চিনতে পারাই সম্ভবত জীবনানন্দর বিশেষ চেতনায় অবগাহন এবং অনুভবে তাঁর কাব্যাস্বাদ গ্রহণ।

লৌকিক অভিজ্ঞতা আর কবির অভিজ্ঞতা জ্ঞানের তারতম্যে আলাদা চেহারায় দেখা দেয়। জ্ঞানের স্বভাবই উৎক্রমণ ঘটানো। অজ্ঞানীর চাইতে জ্ঞানী বেশি উৎক্রান্ত, উৎকৃষ্ট এবং মানসিক অবস্থায় উন্নত। এ একটা ধার্য সত্য। কিন্তু জ্ঞানপাপীর দৃষ্টান্তও সমাজে বা সমাজের বৃহদায়তন ইতিহাসে প্রচুর আছে। মানসিক অবস্থাকে অনুন্নত রাখবার পাপ তাঁরা ক'রে থাকেন। পাপ মানে অবশ্য স্বভাব-বিরোধিতা। জ্ঞান আহরণ ক'রে প্রসারিত হবার কামনা মনে সুস্পষ্টভাবে বিরাজিত, সে-স্থলে মনের প্রসর্যমাণতা রোধ করা স্বভাবের পথ রুখে দাঁড়ানো, সুতরাং পাপ। সৎ কবি এ-পাপ থেকে নিবৃত্ত থাকেন। কবি জ্ঞানী। জীবনানন্দ দাশ জ্ঞানী কবি। তিনি বিজ্ঞানী নন, ভারতীয় মতেও বিজ্ঞানী নন, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ত ননই।

অতএব জীবনানন্দর অভিজ্ঞতা একটি অ-লৌকিক, স্বতন্ত্র বস্তু। তাঁর জীবন-বোধ, প্রেম-বোধ, ইতিহাস-বোধ, সমাজ-বোধ সবই স্বাতন্ত্র্যে বলয়িত এক-একটি আলোক-মণ্ডল। কল্পনার আলোতে বোধগুলো উজ্জ্বলকায় হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে-কল্পনা প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার বৃত্ত ছেড়ে অলৌকিকতার পথে বিচরণশীল হয়নি। জীবনানন্দকে এজন্যেই ইতিহাস-চেতন কবি বলা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যে মানব-শিশু বিচ্ছিন্ন হয়ে, আলোর চেতনা মনে বহন ক'রে, আলো-কেই সত্য ব'লে জেনে জীবন

যাপন ক'রে যাচ্ছে, জীবনানন্দর কাব্যে আমরা তারই অভিজ্ঞতার খবর পাব। প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু আকাশ বা শুধু পৃথিবী নয়। যেম্নি 'দূর ছায়াপথ', তেম্নি 'দুরন্ত সৈকত'। দুরন্ত সৈকতের কথা ইতিহাস-বিজ্ঞান থেকে নেওয়া আর 'দূর ছায়াপথে'র কিংবদন্তী ভারতীয় মনের প্রাঙ্-নিবিষ্ট রতির কাছ থেকে পাওয়া। কিংবদন্তীর রতি যে-দুরন্ত কল্পলোক তৈরি করেছে কবির মনে 'ঝরা পালকে'র দিনে, তা-ই তাঁকে 'সাতটি তারার তিমিরে' ধাবমান করিয়ে সেই তিমির হরণ করবার গতিবেগ দান করেছে। কল্পনার স্বাতন্ত্র্য যে-গতিতে চিহ্নিত হয়, জীবনানন্দ সে-গতি আয়ত্ত করেছিলেন।

তারপর, কল্পনার গতিবেগ আয়ত্ত করবার পর, কল্পনারই স্পর্শে বা ঘর্ষণে পথের সব-কিছু আলোকিত হয়ে যায়। ইতিহাসে, জীবন-বোধে, সমাজ-বোধে, নরনারীর সম্পর্কে আলো প্রবেশ করতে সুরু করে। ইতিহাসের এসিরিয়া-মিশর-বিদিশার অন্ধকারকে, সত্যপ্রসূতি 'বসুন্ধরার অন্ধকার'কে অথবা 'বনলতা সেনে'র চারদিককার অন্ধকারকে অস্বীকার ক'রে কবি জীবনানন্দ তাঁর আলোকিত কল্পনা-বলয় নির্মাণ করেন নি। তবে, আমরা বিস্মিত হয়ে দেখতে পাই তাঁর উৎক্রমণ 'তিমিরহনন' ক'রে চলেছে। 'মাটিও আশ্চর্য সত্য' ব'লে অনুভব করছেন কবি তাঁর 'আবহমান' কবিতায়, কিন্তু 'সিন্ধুসারসে'র অনুভবে তিনি দেখতে পাচ্ছেন: 'রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে' 'কাঞ্চী-বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে'। ইতিহাস নিওলিথ যুগ থেকে সুরু করে আবহমান স্তব্ধতায় মূর্ছিত, 'দুরন্ত সৈকত' তাই জীবনানন্দের দর্শনে শেষটায় 'কোন এক অন্ধকার স্তব্ধ সৈকতের বিন্দু' ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। ইতিহাস-চেতনা তাই 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতায় সমাপ্ত হয় কবির মৃত্যুর প্রাক্কালে। সেই 'মহাজিজ্ঞাসা' মনে বহন ক'রে তিনি তাঁর জীবনের শেষ কবিতা 'অবিনশ্বর' আলোর গাথা লিখে গেছেন।

উৎকৃষ্ট চিত্তের মহাজিজ্ঞাসা রাষ্ট্রনীতি-সমাজনীতি-ব্যক্তিনীতির আবর্তে ঘুরপাক খায় না, জীবন-নীতির উপর প্রশ্ন-পাত করে। জীবন কি পার্থিব বৃত্তের নিয়মাধীন, না তার ঊর্ধ্ব আকাশ-গতি কিছু আছে, এই জিজ্ঞাসা জ্ঞানীর

হৃদয়ের হৃষীকেশ। যখন শেলির মতো অনুভবে কবির বোধে দেহটি অতি বেশি স্থূল প্রতিপন্ন হয়, তখন

বৃষ্টি বাতাস হলুদ পাতা ছাতকুড়ো ঘুণ মাকড়সাজাল এসে
বলছে : 'আরো কঠিন আঁধার নেমে পড়ার আগে
আমরা এলাম, কোথাও কিছু নেই ;
একটি শুধু মূর্খ আছে মানবইতিহাসে
চণ্ডে চ'ড়ে চেয়েছে নীল আকাশ ধরবেই—('অবিনশ্বর')

এ-কঠোরোক্তিতে ইতিহাস ও কোবিদের মন অন্ধকার ও অন্ধতামসীর দিকে আকর্ষিত হয়, কিন্তু কবি, যিনি জ্ঞানী জীবনানন্দের মতো কবিতা-ধ্যান করতে পেরেছেন তার মহা-চেতনা অন্ধকারের অকূল সীমার অন্তর্গত আলোর বলয় অনুভব ক'রে ব'লে যাবে : 'হয়তো সত্য আলো'। আলোর প্রতীতিতে সুরু করেছিলেন জীবনানন্দ তাঁর কবি-জীবন, আলোর প্রতি নিটোল বিশ্বাস না থাকলেও, আলোর বৃত্ত থেকে তিনি বিচ্যুত হ'য়ে কবি-জীবন সমাপ্ত করেন নি বা জীবলীলা সমাপ্ত করেন নি।

কবির সমগ্র জীবনই কবিতাময়। বাঙ্ময় জীবন সমাপ্ত হয় শুধু তাঁর মৃত্যুতে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর আমরা সানুরাগ চিত্তে অনুভব করতে পারি যে তিনি তির্যক গতি-পথ নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধার মাল্য ভূলুণ্ঠিত করেন নি। মন-ভেজানো কবিতা লিখে মাকড়সাজালের তুষ্টি বিধান করার কৌশল তাঁর হাতে আমলকির মতো এসেছে, কিন্তু হস্তামলক তিনি তুচ্ছ-জ্ঞানে বর্জন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় এ-ধরনের কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেননি এমন নয়। করুণ আর্দ্রতায় বা শক্তির কঠোরতায় ধ্বনি-ব্যঞ্জনা তুলতে অনেকেই কৃতকার্য হয়েছেন, কিন্তু মনোভঙ্গির একাগ্র সাধক রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ প্রথম। জীবনানন্দ আমাদের যুগের প্রথম কবি। তাঁকে নিয়েই ভাঙা-গড়া চলছে ইদানীং। যাঁরা দ্বিতীয়ের বা তৃতীয়ের ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল, তাঁরা নিশ্চয়ই আজ জীবনানন্দের 'অবিনশ্বর' কবিতার এই পংক্তিদ্বয় মনে-মনে আলোচনা করবেন :

তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো ;—হয়তো সত্য আলো।

জিজ্ঞাসা এ-শতকের একটি প্রগাঢ় মানসিক অধিবাস (fixation)—বা মনোভঙ্গি। এ-ভঙ্গি অর্জিত হতে সুরু করেছে কোবিদ-চিত্তে বহু সহস্র বর্ষ পূর্বে। এর যাত্রা-পথ মানবিক সভ্যতার আলোর গতিপথের মতোই অর্ধবোধ্য। ইতিহাস-গত মানুষের জীবনের মতোই তা প্রাচীন। এই প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী ছিলেন জীবনানন্দ, যার কথা মানবিক প্রেমের মতোই জীবনের অতি-গভীরে প্রোথিত। প্রেম আর প্রমাকে এক পর্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে রেখে গেছেন এ-যুগের বাঙালি কোবিদ-কবি জীবনানন্দ দাশ।

আমাদের কবি

অশোক মিত্র

ভয়চকিত মফস্বলের মানুষ, কলকোলাহলমুখর নগরজীবনের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন অন্বয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলাদেশের সে মফস্বলশান্তি আর ফেরবার নয়। দেশভাগের কথা ছেড়ে দিলেও, আধো-শহর আধো-গ্রাম যে-রূপবতী বরিশাল, তা হারিয়ে গেছে কোথায়। সেই নারকেল-শুপুরির সারি, শুরকি-ছাওয়া শড়কের পাশে খাল, খালের ওপারে নিবিড় হয়ে ঘিরে আসা পল্লীশ্রী; খোড়ো ঘর, ঘাস, ধান, শিরীষ, আম, জাম, নিম, জামরুল। কোঠাবাড়ির পিছনে স্তব্ধতা, টলমল পুকুর, হাঁস, মাছ, শামুক, গুগলি। শুপুরির দীর্ঘ ইশারা বেয়ে সন্ধ্যা; পেঁচা, ডাহুক আর ঝিঁঝিঁ, বিশাল আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্র। অপেক্ষাকৃত ঘনতর বসতি ছাড়িয়ে গেলেই হয়তো ধানসিড়ি নদীর ঢল, শর-কাশ-হোগলার বন, তারই পাশে বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে প্রান্তরের নীরবতা। আরো একটু এগিয়ে গেলে এমনকি পলাশবনের ভিড়েই হারিয়ে যাওয়া যাবে বোধহয়: কে জানে, হীরা-ঝরা চোখ নিয়ে দু'একটা হরিণই খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

এই পরিবেশে জীবনানন্দ নিজের মনে কবিতা লিখে গিয়েছিলেন বিশ-তিরিশের বছরগুলো ভ'রে। শান্তির কবিতা, শ্রান্তির কবিতা: গোরু, ঘোড়া, হরিণ, ঘাস, কীটপতঙ্গ, পাখিপাখালির পরিমণ্ডলে যে-শান্তি, সেই একবুক শান্তির কবিতা। 'হাঁসের নীড়ের থেকে খড় পাখির নীড়ের থেকে খড় ছড়াতেছে; মনিয়ার ঘরে রাত শীত আর শিশিরের জল' এরকম অখণ্ড উপলব্ধির কবিতা। উদ্ভিদ্‌জীবনের, প্রাণীজীবনের, গৃহস্থজীবনের অনায়াস নিয়মকলায় যে কোমল পরিপুর্ণতা ব্যাপ্ত, তার কবিতা। অথচ জীবনের আরো গভীরে যে-কান্না, প্রেম অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা সব-কিছুর পরেও যে বিপন্ন বিস্ময়ের আলোড়ন, সেই বিক্ষোভের কাব্যও।

সত্যিই আমাদের পৃথিবীর ছিলেন না কোনোদিন। মানুষের সঙ্গে

প্রকৃতির, সভ্যতার সঙ্গে শান্তির যে-সংঘর্ষে ক্রমেই হ'টে যাচ্ছে প্রকৃতি, ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শৈশবস্বস্তি, সেই দ্বন্দ্বে বুনোহাঁস-হরিণ-শঙ্খচিলের মতো তিনিও অহরহ নিহত হচ্ছিলেন। যে-পৃথিবী 'প্রদাহ প্রবহমাণ যন্ত্রণা', তার ভয়াবহ আরতি এড়িয়ে 'অন্ধকারের সারাৎসারে' মিশে যাওয়ার ক্ষুব্ধ আকৃতিতে অতএব কোনো অনৃততা ছিল না। জড় ও উদ্ভিদ্‌জগৎ নিয়ে প্রগাঢ় সংবেদনাশীল কাব্য অবশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আজ পর্যন্ত অজস্র রচিত হয়েছে, কিন্তু জীবনানন্দ অনন্যতা ছুঁয়ে গেছেন এই কারণে যে তাঁর কাব্য নিছক সংবেদনার নয়, পরম অন্তর্বেদনার। 'কোনো নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার' থেকে নেমে জন্মলাভ করবার যে-আনন্দ, একটি কচি ঘাসের চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে না-পারলে সেই অনুভূতির ঐরূপ শাণিত প্রকাশ অসম্ভব ব'লে মনে হয়। বিষয়কে নিজের কবিসত্তা থেকে জীবনানন্দ কখনো আলাদা ক'রে দেখেননি; বিষয়কে আশ্রয় ক'রে একটি সম্পূর্ণ চেতনা কল্পনা করেছেন, সেই চেতনাকে সম্মানের সঙ্গে পরিচর্যা করেছেন, সবশেষে মানবিক হৃদয়ের অনুভূমিকাতে সে চেতনার আন্তরিকতম প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ('যেই সব শেয়ালেরা' কবিতাটি তাঁর কল্পনার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ার পরাকাষ্ঠার নিদর্শন হয়ে থাকবে।)

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে সব-কিছু অতিক্রম ক'রে যে-শান্তি, যে-শ্রান্তি: এ-সমস্ত বোধবিষাদের প্রসঙ্গ নিয়ে জীবনানন্দ বাংলা দেশের মফস্বলে কাব্যরচনা ক'রে গিয়েছিলেন। অনুভবের গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের কোনো তুলনাই নেই। অথচ এ-স্বীকৃতি পাবার জন্য তাঁকে দীর্ঘ দিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে। 'প্রগতি' 'কল্লোলে'র উদ্দাম অধ্যায়ে জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিত্বশালী বিচিত্র পুরুষেরা তখন অঙ্গন মুখর ক'রেছিলেন: বরিশালের নির্জন আকাশ নিয়ে হিজিবিজি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চুপচাপ প'ড়ে থেকেছে। আরো বছর-দশেক বাদে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রধান স্রোত থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেলেন।

কারণটি স্পষ্ট। এ-কথা বললে এখন বোধহয় আর কোনো দ্বিরুক্তি হবে না যে নিতান্তই বিদেশী সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে বাংলা কাব্যের সেই অধ্যায়ের মূল প্রেরণা এসেছিল। 'মননশীল' কাব্যরচনার ধুয়োতে হাওয়া তখন ভারি। তত্ত্ব এবং ভঙ্গি, দুয়েতেই চাতুর্য তথা পাণ্ডিত্যের রাজযোটক না-ঘটলে সে-রচনা সার্থক নয়, এ-রকম একটা তুখোড় কানাঘুষোর কাল গেছে সেটা। আবেগ-প্রধান, বিশুদ্ধ প্রেরণাধর্মী কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সহজ ক'রে সহজ কথাটা বলবার মতো বালখিল্যতা আর নয়—ইত্যাকার নানা অভিমত সেই দশকের কাব্য-সমালোচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। এরূপ দৃঢ়চক্র প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যের কোনো ব্যাপক সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'মাঝে-মাঝে ভালো উপমা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ওসব ক'রে আর কী হবে।' বাঁকা ঠোঁটে এ-ধরনের অক্ষম উক্তি ক'রেই অনেক বিদগ্ধ সমালোচক নিজেদের কর্তব্য সুচারুসম্পন্ন ব'লে ভেবে নিয়েছিলেন। বালিশে মাথা রেখে যাঁদের ঘুমোবার, তাঁরা ঘুমিয়েই ছিলেন: একমাত্র সম্মানীয় ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসু।

এই উন্নাসিক কাব্যদর্শনের অসারতা প্রমাণ হ'তে-হ'তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ হয়ে এল। শুভবোধ যেহেতু কালজয়ী, সেই 'মননধর্মী'-পর্বের খুব অল্পসংখ্যক কবিতাই সময়ের উচ্চাবচতা ডিঙিয়ে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। অন্য পক্ষে, প্রতীক্ষার খিন্ন গোধূলিলগ্নে, তাঁর প্রাপ্যের সামান্য কিছু অন্তত জীবনানন্দ পেতে লাগলেন চল্লিশের দশকের উপান্তে। যে-তরুণতরের দল প্রায় দশ-বারো বছর ধ'রেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে সংগোপনে অভিসারব্রতী ছিল, সমকালীন প্রয়াসের নিষ্প্রাণ বিশুষ্কতায় ব্যাহত-বিক্ষত তারা, পূর্বসূরীদের বিচারকে পাশে ফেলে রেখে জীবনানন্দকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ ক'রে নিলো তারা। জীবনানন্দ-চেতনা তাই বলতে গেলে মাত্র বিগত কয়েক বছরের ফল। কবিতার দেশ নাকি বাংলা, কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে কবিপ্রতিভার প্রতি যে-অসম্মান জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারার ইতিহাসে তা কলঙ্কের এক চরম চিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

২

আঘাতের বেদনা আমাদের কাছে এতটা দুর্বিষহ লাগছে এই কারণেই: বরাবরই অনুভব ক'রে এসেছি জীবনানন্দে একমাত্র আমাদেরই অখণ্ড অধিকার। আমরা এখন যারা তিরিশের এদিকে ওদিকে, জীবনানন্দ-বিভোর কৈশোর কেটেছে আমাদের সকলের। বৈয়াকরণেরা বিমুখ: তাঁকে আমরাই তো আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের উপভোগের নিবিড়তা দিয়ে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়ের কোনো তুলনা নেই: যেন সব-ক'টি ইন্দ্রিয়ের যৌথ মধ্যবর্তিতায় নতুন একটি ভূমণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টে গেলো। আমাদেরই পৃথিবী, প্রত্যহের স্পর্শ স্বাদ গন্ধের প্রত্যেকটি বিভঙ্গই উপস্থিত, অথচ নতুন ক'রে তাকে চিনতে শিখলাম। চেতনাতে কোনো মোহিনী মায়ার জাদু এসে লাগলো, স্নায়ুতে শিরায় তন্ত্রীতে আমূল কোনো বিপ্লব। অভ্যস্ত পরিচিত রূপ বদলে গেলো, রূপকথা হয়ে ফিরে এলো; গন্ধে এলো শিহরিত বিভাস; স্পর্শে পৃথক এক রোমহর্ষ। জীবনকে, মৃত্যুকে, কান্নাকে, কাব্যকে হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে শিখলাম: ঘাস আর শিশিরের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হ'য়ে মিশে গেলাম: কীটপতঙ্গ পশুপাখির হৃদয়রেখার গহনে আমরাও স্বতঃসিদ্ধতা হ'য়ে প্রবেশ ক'রে গেলাম যেন। চালের ধূসর গন্ধ-মাখা তরঙ্গ দু'বেলা যে নির্জন মাছের চোখে রূপ হয়ে ঝ'রে যায় তা আর আমাদের কাছে কষ্টকল্পিত তত্ত্ব হ'য়ে রইলো না, বিশ্বাসেরও আরো অনেক গভীরে, সেই অনুভব আমাদের চেতনায় রূপান্তরিত হ'লো। কৈশোরের সিঁড়িতে সদ্য-পা-দেয়া আমরা, জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আবিষ্কার ক'রে উল্লসিত, চকিত, অভিভূত হয়ে গেলাম। সে এক অদ্ভুত মমতা-মাখানো অধিকারবোধ, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত: সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম, সে-সাম্রাজ্য সুতরাং আমাদের। শোকের এই নিদারুণ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও এখনো সেই গর্ব।

৩

কিন্তু গর্ব ক'রেই বা কী হবে, আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের কতটুকুই বা

আমরা পালন করেছি। তাঁর কাব্য নিয়ে মাতামাতি করেছি প্রচুর, অথচ ব্যক্তিহিসেবে তাঁকে প্রায় ভুলেই থেকেছি। বিগত সাত-আট বছর নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁর কলকাতায় কেটেছে। বিভিন্ন অভিজাত সাহিত্যিক-গোষ্ঠী কোনোদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি : লোকমঞ্চ থেকে দূরে, জীবনানন্দ চুপি-চুপি পালিয়ে বেড়াতেন কলকাতায়। তরুণতরদের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অজস্র হওয়া সত্ত্বেও কাউকেই তাঁর কাছে তেমন যাওয়া-আসা করতে দেখা যেতো না। অথচ, স্বভাবগত প্রাথমিক জড়তাটি কাটিয়ে উঠলে, লোক-সমাগমে জীবনানন্দ আনন্দ পেতেন, ভরসা পেতেন। এই হতভাগ্য দেশে, কবিকর্মের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার যেখানে নিশ্চিত আড়াআড়ি, অনুরাগী পাঠকদের মুগ্ধতাবোধের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক জবানবন্দিও কবির তৃপ্তির পক্ষে অনেকখানি। অতটুকু অর্ঘ্যও তাঁকে দেয়া হয়নি।

আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গত চার-পাঁচ বছরে তাঁর একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তাসম্বন্ধ গ'ড়ে উঠছিলো। চতুর পৃথিবীর কলরোলের ক্লান্তিকে পিছনে ফেলে রেখে নিমগাছের আশ্চর্য ছায়া-আঁকা উঠোনসম্পন্ন তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে গিয়ে হাজির হয়েছি। বারান্দার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতাম, নিমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে হয়তো জ্যোৎস্না এসে পড়তো—কী-এক জাদুবলে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ডুবে যেতো—অনেক সরল প্রাণখোলা গল্প হ'তো তাঁর সঙ্গে। পর্যাপ্ত খুশির একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কোনো কথার প্রসঙ্গে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে হঠাৎ প্রাণবন্ত হেসে উঠতেন তিনি, কৌতুকে চোখ দুটি নৃত্য ক'রে উঠতো। যতবারই গেছি কৃতজ্ঞ অন্তরে ফিরে এসেছি : প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, যেন পৃথিবীর নিষ্পাপ বিস্ময়ের শৈশব থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে এলাম।

অথচ, করুণ আক্ষেপ হয় এখন, খুব বেশিদিনও যাইনি। বহুবিধ নাগরিক উত্তেজনায় ব্যস্ত আমরা, কবিদর্শন তো এর মধ্যে বিরলতম ব্যাপার : বিবেকের কাছে আজীবন এখন জবাবদিহি দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আরো মনে হয়, তাঁর জাগতিক সুখসংবিধানের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে-দায়িত্ব মেটাবারও তেমন-কোনো তন্নিষ্ঠ চেষ্টা আমরা করিনি।

'সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর ; হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' এ রকম একটি উপমাও যিনি কল্পনা করতে পেরেছেন, তাঁর আসন মহত্তম কবির পর্যায়ে : আন্তরিকতার উৎসাহে এ ধরনের কথা বহুবার চেঁচিয়ে ব'লে বেড়িয়েছি। এই মতের সপক্ষে অনেক-কিছু বলবার ছিল, আছে—হয়তো মনে-মনে ভাবাও ছিল সে-সব কথা—কিন্তু আমাদের উৎসাহ, স্বীকার করতেই হয়, আজ পর্যন্ত তেমন সুষ্ঠু দানা বাঁধেনি। আমাদের আন্দোলনে অধিকতর ঋজুতা আর দার্ঢ্য থাকলে হয়তো বা মৃত্যুর আগে জীবনানন্দকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের একটি বৃহৎ অংশই কৃতজ্ঞ নম্রতার সঙ্গে সাজিয়ে নিবেদন করতে পারতাম।

জীবিকানির্বাহের তাড়নায় প্রবাসে প'ড়ে থাকবো। দু'বছর-তিন-বছর বাদে অল্প কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসবো, দেশপ্রিয় পার্কের কোণে বাস থেকে নামবো, ট্রাম-লাইনের দিকে চোখ পড়ামাত্র ছলাৎ ক'রে উঠবে হৃদয় : আকাশে ঝিকিমিকি শরতের রোদ্দুর, নিজের বিবেকের কাছে আরেকবার মাথা হেঁট হবে।

যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার

অমলেন্দু বসু

সময় আসে, যখন সমালোচক রুদ্ধলেখনী, শিল্পবিচার হৃতসূত্র। যে-কবির অবিস্মরণীয় সুরের রেশ দীর্ঘকাল অন্তরে বেজেছে, তাঁর সদ্যপ্রয়াণের পরে সে-সুরে আবার নতুন ক'রে আচ্ছন্ন হতে হয়। ঠিক এ সময়টিতে সুর-বিশ্লেষণ হৃদয়হীন, বিশেষত যদি কবির সঙ্গে মুগ্ধ পাঠকের সুহৃদ্‌সম্পর্ক থেকে থাকে।

সামান্য বিচারে মৃত্যু শোকোদ্দীপক ঘটনা। তবুও, তার নিষ্ঠুর আকস্মিকতা সত্ত্বেও, জীবনানন্দের মৃত্যু, তাঁরই নিরিখে, হয়তো শোকাবহ নয়। সুরু থেকে শেষ অবধি তাঁর কাব্যে মৃত্যুর অজস্র ভাবনা অপূর্ব গীতরূপ পেয়েছে, কখনো অপার বিষণ্ণতায়, কখনো বেদনার উল্লাসে, কখনো শকুন-ক্লান্তির কলরোলে। 'সব ভালোবাসা যার বোঝা হ'ল—দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে।' সেই বহু-অভিলষিত, বহুবার প্রিয়-নামে-ডাকা মৃত্যু লৌকিক নিরিখে শোকাবহ, কিন্তু এ-মৃত্যু কি জীবনানন্দর অনন্য নিভৃত কবিসত্তার অতি সহজ পূর্ণতাপ্রাপ্তি নয়?

মৃত্যুর ভাবনা জীবনানন্দে নিরবচ্ছিন্ন। "বনলতা সেন" অবধি রচনান্তরের প্রতি কবিতায় মৃত্যুর কোনো-না-কোনো উল্লেখ, স্পষ্ট উচ্চারণে অথবা তির্যক প্রতীকে উপস্থিত। কবির জীবনোপলব্ধির নাভিমর্মে মৃত্যুর অব্যয় ভাবনা, অন্য সব ভাবনা ঘুরে ফিরে এই কেন্দ্রের সংযোগে সঞ্জীবিত।

যখন ঝরিয়া যাব হেমন্তের ঝড়ে

হলদে পাতার মত আমাদের পথে ওড়াউড়ি

কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইসারায়

ঝ'লে গেছে কতবার; ঝ'রে গেছে তৃণ, রাত্রিদিন পড়িতেছে ঝ'রে

ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন

পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর

একবার যখন দেহ থেকে বার হ'য়ে যাব

মরণের পরপারে বড় অন্ধকার

গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ

এমন কি "সাতটি তারার তিমিরে", যেখানে ইতিহাসচেতনায় শিল্পীচিত্ত প্রবুদ্ধ, যেখানে "নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে" মানুষ চেতনার দিনে অলক্ষ্য অরুণোদয়ের গান গায়, সেখানেও মৃত্যুর উপমার পুনঃপৌনিক আবির্ভাব।

নির্মল আগুনে ঐ আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মত

বেরিল মণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু

পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপোষে।

এই তো জীবন:
সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে

মানবের মরণের পরে তার মমির গহ্বর

দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক
কেবলি আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়

এই মৌল মৃত্যুমুখী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে এমন কি কবির বহু-ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলিতেও: ঝরিয়া গেছে; মুছিয়া গেছে; থাকিবে না; কেঁপে; ছিঁড়ে; হাওয়া হ'য়ে; ভূত হ'য়ে; (গান কোন্ দিকে) ভেসে যায়; উড়ে যায়; রহিবে না। এ কয়টি ক্রিয়াপদ কুড়ি ছত্রের একটি মাত্র পাতায় পাচ্ছি। আরো কুড়ি ছত্রের মধ্যে নেতিসূচক শব্দ কতগুলি: আসেনি; বোনে নাহি; নিরাশা; যাব নাক'; নির্জন; নিঃসাড়: থামিতে হয়; নিস্তব্ধ; নিমীলিত; াদহীনতা। আর এই মৃত্যুমুগ্ধ অনুভূতিতে স্বপ্নলোকবাসিনী মোহিনী ("পরী নয়,—মানুষও সে হয়নি এখনো") বলতে পারে "ফুলগুলো বাসি নয়,—আমি শুধু বাসি"। আর তাই হৃদপ্তের শান্তি-দেওয়া নারীর "ঘুচে গেছে

জীবনের সব লেনদেন", আর "স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে ব'লে যায়, স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো"।

যেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে র'ব বিছানায় শুয়ে;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে র'ব
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।
স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে বল তো।

এই নিরন্তর মৃত্যুচেতনা, স্থবিরতা-স্পৃহা, পীড়াজীর্ণ চিত্তের অসুস্থতা নয়, কেননা জীবনানন্দর শিল্পীমানস নিশ্চেতন স্থবিরতাকে যত আহ্বান করেছে, উত্তাল ক্ষমতাকেও ততই আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

হে ক্ষমতা,—বিদ্যুতের মত তুমি সুন্দর—ভীষণ!
মেঘের ঘোড়ার 'পরে আকাশের শিকারীর মত;—
সিন্ধুর সাপের মত লক্ষ ঢেউয়ে তোল আলোড়ন।
চমৎকৃত কর,—শরীরেরে তুমি করেছ আহত।

আসলে জীবনানন্দের মৌল জীবনোপলব্ধি সামান্য লৌকিক বিচার থেকে আলাদা। সব জিনিষকেই পৃথক্কৃত স্বতন্ত্র সত্তায় চিন্তা করা সামান্য যুক্তিবাদী বিচারের স্বভাব। স্থবিরতা ও বেগ, প্রেম ও অপ্রেম, জীবন ও মৃত্যু, আলো আর অন্ধকার, এদের মধ্যে নিঃসংশয় সীমানা, অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, এমন কি পরস্পর-বিনাশী বৈপরীত্য বর্তমান ব'লেই আমরা ভেবে থাকি। কিন্তু যে সীমানা বুদ্ধির কাছে সুস্পষ্ট, হৃদয়ের সহজ অনুভূতিতে তা অবলুপ্ত হ'তে পারে। আলো-অন্ধকার দিয়ে বোনা সে-অনুভূতি "দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে" "ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া" "হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়"। জীবন মৃত্যুর ব্যবধান-লোপী মনোভাব দার্শনিক মতের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়; এই দার্শনিক মত যদিচ আদৌ সুপ্রচারিত নয়, তবু জীবনানন্দর মনোভাব যুক্তি-নির্ভর ছিল বলে মনে হয় না, অন্তত "বনলতা সেন" অবধি কাব্যগ্রন্থে নয়। এ-মনোভাবে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান গ্রাহ্য নয়, বরং জীবনে মৃত্যু, মৃত্যুতেই

জীবন, গতি ও নিশ্চলতা অভিন্ন, গোধূলি ও কুয়াশায় দিনের ও রাত্রির আলো মিলিয়ে একাকার। এই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা কাব্যে অভিনব। ক্বচিৎ রবীন্দ্রনাথের মানসনেত্রে গোধূলির আবছায়া হয়তো উজ্জ্বল শরীর পেয়েছে, কিন্তু প্রেতলোক কখনোই মনুষ্যলোকে রূপায়িত হয় নি। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কলিন্স ও কোলরিজে এই একাত্মদৃষ্টি সম্ভব ছিল, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারে ও ইয়েটসে এই মায়াবী দৃষ্টির আবির্ভাব পুনরাবৃত্ত, কোনো-কোনো ফরাসী কবিও আলো-আঁধারি জগতে বাস করেছেন। জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের ধীমান পাঠক ছিলেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিদেশী প্রভাবে গ'ড়ে বা বেড়ে উঠেছিল এমন মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ দেখি না, কেননা তাঁর মায়াবী দৃষ্টিভঙ্গি, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য একাত্মদৃষ্টি তাঁর নিজস্ব কল্পনায় উদ্ভূত আর বহু-পরিচিত পরিবেশের রসে পুষ্ট। মনে হয় এই একাত্মদৃষ্টি বাঙালি কবির পক্ষে সহজ হওয়া উচিত, কেননা বাংলাদেশের কোনো-কোনো অঞ্চলের নিসর্গ-পরিবেশ এ-দৃষ্টির পক্ষে সহজেই অনুকূল, আর কবিমাত্রেই নিসর্গ-পরিবেশ দ্বারা কমবেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন, বিশেষত বাঙালি কবি। কিন্তু খুব কম কবিই জীবনানন্দের মতো এত সহজ সহানুভূতিতে নিসর্গ পরিবেশের সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, দুই নদীর সংগমের মতো সহজে, জলধারা মিলনের অনির্ণেয় সীমারেখায়। সব কয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে নিসর্গ-পরিবেশের অসংখ্য বিচিত্র প্রভাব তিনি গ্রহণ করেছেন নিয়ত, তাই তাঁর কাব্যে শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ, এমন কি স্বাদেরও বাচনিক রূপ নিরন্তর প্রকাশিত। জীবনানন্দর এই নির্দ্বিধ সানন্দ নিসর্গ-সহানুভূতি, আর তাঁর তুরীয় অনুভূতিপন্থা—যাকে তিনি বলেছেন "বোধ"—তাঁর দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যুকে একীকৃত করেছে, সে-একীকরণের ফলে জীবন ও মৃত্যু উভয়েরই ঐশ্বর্য বেড়েছে সহস্র গুণ। যে-মৃত্যু লৌকিক ধারণায় অবসান ও সর্বনাশ, সে-মৃত্যু এই আনন্বিক ধারণায় জীবনেরই অভিন্ন রূপ, এমনকি জীবনের পরাকাষ্ঠা।

এই বিরল মানসের অধিকারী ছিলেন ব'লেই জীবনানন্দ বিশেষ অর্থে নির্জন, নিঃসঙ্গ কবি।

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা ?
আমার পথেই শুধু বাধা ?

* * *

তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় না কি ?—তাহাদের মন
আমার মনের মত না কি ?
—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী।

* * *

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মত ঘুরে' ঘুরে একা কথা কয়।

কবি জীবনানন্দ বাস্তবিকই "আলাদা"। তাঁর শিল্পকর্মের বিশেষ ক্ষেত্র "ফ্যান্টাসি"তে, প্রকল্পনায়, সে-প্রকল্পনা স্বচ্ছন্দ তুরীয় যুক্তি-না-মানা বেগবান পথে চলেছে সব পর্যায়ের কাব্যে, প্রথম দিককার তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুগত কাব্যে যেমনি, তেমনি শেষ দিককার তত্ত্ব-সন্ধানী মনীষিতা-প্রয়াসী কাব্যে। সুরু থেকে শেষ অবধি জীবনানন্দর রচনা একই কাব্যোত্রীর জলসিঞ্চিত। বিষয়বস্তু তাঁর কাব্যে শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকেনি—থাকবেই বা কেন ?—কিন্তু সর্বত্র কবিচিত্তের নিঃসঙ্গতা সমানে পরিস্ফুট, আর সেই নিঃসঙ্গতার মূলে একই অনন্ত পারলৌকিক সংবেদনা উপস্থিত। যে-মৃত্যুর অবিরাম স্তবগুঞ্জন জীবনানন্দর কাব্যে, সে-মৃত্যু জীবনেরই রূপান্তর। আলো-আঁধারি কুয়াশার দৃষ্টিতে দেখা জীবন, তবুও জীবন—সূক্ষ্মভাবে, ব্যাপকভাবে, কৌতূহলী-দৃষ্টিতে দেখা স্থবির ও অস্থির জীবন। জীবনমৃত্যুর এই সমন্বয়ে, ভাবনার কুহেলিময় পরিমণ্ডলে, জীবনানন্দর শিল্পশক্তির আশ্চর্য অবৈকল্য।

জীবনানন্দ দাশের আস্তিকতা

অরুণকুমার সরকার

কাব্যরসাস্বাদনে কবির বক্তব্যের আলোচনা কতদূর সহায়তা করে সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমি অনুভব করেছি যে প্রত্যেক মহৎ কবি বিশেষ একটি সত্য, 'বাণী' কথাটায় আপত্তি না থাকলে, তা-ই, সাধারণ্যে উদ্‌ঘাটন করেন। সুতরাং জীবনানন্দ দাশ যে-শব্দসৌন্দর্য রচনা ক'রে গেছেন তার আস্বাদন আপাতত পাঠকের ব্যক্তিগত বোধশক্তির উপরে ছেড়ে দিয়ে আমি যদি শুধু তাঁর অভিমতের পরিমাপে অগ্রসর হই তা হয়তো নেহাৎ অনর্থক হবে না। বিগত ১৩-১৪ বছর ধ'রে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, খুব অল্প লোকই বোধ হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে এখনো তিনি নির্জনতার কবি, প্রকৃতির কবি ; তাঁর খ্যাতি এবং অখ্যাতি সংসারবিমুখ পলাতক কবি হিসেবেই। এই ধারণা কিন্তু, আমার বিবেচনায়, পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। শেষদিকের রচনায় জীবনানন্দের চিন্তা ভিন্নমুখী এবং স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল। মনোময় জগৎ ছেড়ে কিছুদিন তিনি কর্মময় জগতে ভ্রমণ করেছিলেন এবং পুনরায় নবতর উৎসাহে মনোময় জগতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এই স্বল্পকালের ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে জিজ্ঞাসা আছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত বিক্ষোভ আছে, প্রাথমিক বোধে সীমাবদ্ধ মেনে-নেওয়ার নিষ্ক্রিয়তা ছাড়িয়ে চোখে-দেখার জগৎটাও এখানে বিস্তৃত এবং অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, যাঁর মন মূলত বহিরাশ্রয়ী, ধারণা-তৈরির খেলায়, অর্থাৎ, চিন্তা নিয়ে চিন্তা করায়, তিনি হয়ত ততটা মজা পান না ; ছবি-আঁকাতেই তাঁর আনন্দ, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারলেই তাঁর নিষ্কৃতি। শেষের দিকের রচনায়, কিন্তু, জীবনানন্দ সমাজচিন্তায় ভাবিত এবং চিন্তাবস্তুকে আবেগগ্রাহ্য ক'রে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই'—এই কথা ব'লে সমস্ত সাংসারিক উৎসাহ

এবং উত্তমের দিকে পাশ ফিরে 'জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ' যিনি জ্ঞাপন করেছিলেন, বলা বাহুল্য, সেই কবির মনোবিপ্লব রাতারাতি সংঘটিত হয়নি। লোকালয়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, বিগত মহাযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ আবর্তে, জীবনানন্দ দাশ প্রথম-প্রথম খুবই অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। সন্ধিকালের কবিতাগুলি, তাই, কখনো পরিহাস-তরল, কখনো বা সামাজিক বৈপরীত্য এবং অসংলগ্নতার বোধে জটিল। কিন্তু এ-অবস্থাটা স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। কেননা, অপরাপর কবির মতো জীবনানন্দের কাছে বিগত মহাযুদ্ধ পক্ষনির্বাচনের সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে 'মধ্যম পথে' রুদ্ধগতি হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণায়, 'একটি পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে' এবং তার জায়গায় 'আর একটি পৃথিবীর দাবী' স্থির করার কর্তব্য হিসেবে, সর্বোপরি, বেদনার্ত বাংলাদেশের হ'য়ে এবং সবকিছু জড়িয়ে মানুষের সৌন্দর্যচেতনার তিরোভাবজনিত দুরবস্থারূপে :

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে ?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে ?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্য পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিল প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এখানে 'বনলতা সেনে'র ঘোর কেটে গেছে। ছবি এঁকে, গতস্ব শোচনায় অবগাহন ক'রে মাঝপথে বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকায় আর তৃপ্তি নেই। যে-পৃথিবী নষ্ট হ'য়ে গেছে, যাক ; নূতন পৃথিবী-নির্মাণ কি একেবারেই অসম্ভব ? জীবনানন্দ 'গ্রন্থকে বিশ্বাস ক'রে' পড়লেন, কিন্তু সেখানে কোনো আলোক পেলেন না : 'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্য কাগজের ডাঁইয়ে পড়ে আছে।' প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজলেন, সেখানে দেখলেন—হিংসা :

প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়…

নূতন পৃথিবী-নির্মাণে, অতএব, জীবনানন্দ বুঝলেন গ্রন্থ বা প্রকৃতি কেউই সাহায্য করবে না : 'ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।'

আলোকের আশায় জীবনানন্দ মানুষের কর্মরাজ্যে প্রবেশ করলেন, তাকালেন শিল্পীদের দিকে। ক্ষুব্ধচিত্তে দেখলেন, 'কোনো আমলকী নেই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।' আরো বৃহত্তর পরিবেশে 'ভোট দিয়ে জন-মতামতে মিশে' গিয়েও বুঝলেন 'কোথাও প্রীতি নেই।' হতাশ না হ'য়ে অতঃপর তিনি সমাজকর্মীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন ; সেখানেও উৎসাহ পাওয়া গেল না। তারা সব 'স্টালিন, নেহেরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে' বেড়াচ্ছে ; 'নকল সৈন্যের মত কলরব পাঁচালীর দেশে' ; বুলিসর্বস্ব পায়রার মতো মনে হল তাদের :

…মাঠে ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

তবে কি বিপ্লবেই মুসকিল আসান হবে ? জীবনানন্দ স্বীকার করেন :

চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত
অন্ধ কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে

কিন্তু তাতেও, তাঁর মতে, সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা বিপ্লব মানে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম' ; বর্তমান সমাজের ভোঁতামি আর ভাবী সমাজ-পরিকল্পনার নয়নাভিরাম হৃদয়হীনতার দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ ; ফলে যে-সমাজ সৃষ্ট হবে তাও তো আজকের মানুষকে কোনো বিশ্বস্ত আশ্রয় দিতে পারে না।

অতএব, জীবনানন্দ অনুধাবন করলেন, নিজের মন ছাড়া কারুর উপরেই নির্ভর করা চলে না : 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।' আর, যেহেতু জীবনকে অস্বীকার ক'রে জীবিত থাকা অসম্ভব, ঈশ্বরসাধনাও কোনো কাজের

কথা নয়। মৃত্যুহীন কৃষক আর প্রবহমাণ ইতিহাসের কাছ থেকে, যারা তাঁর চেতনায় সুরু থেকেই অস্পষ্টভাবে উপস্থিত, জীবনানন্দ বেঁচে থাকার নির্মোহ নূতনতর প্রেরণা পেলেন। পুনরায় বুঝলেন

> …জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
> পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
> অম্লান, অক্লান্ত হ'য়ে বেঁচে থাকা চাই।
> একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো।

এই নূতন ক'রে পাওয়া পুরোনো উপলব্ধি নানাস্থানে তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন, 'আরেকটি পৃথিবীর দাবী স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে সকালের আকাশের মতন বয়স।' জীবনানন্দ যা বলতে চান তা হয়ত এই যে বেঁচে থাকতে হ'লে দরকার সহিষ্ণুতা আর প্রত্যয়; যে-অবিচলতা নিয়ে কৃষক তার মাঠ আর বলদের মধ্যে হাজার হাজার সাম্রাজ্যের উত্থান পতনকে অগ্রাহ্য ক'রে লাঙলে নিযুক্ত রয়েছে, সেই স্বধর্মনিষ্ঠা। জীবনানন্দের কাছে, এখানে উল্লেখ করা দরকার, কৃষক সর্বদাই মাটি-আকাশের সগোত্র।

> কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই;
> একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে;
> সূর্য উদয়র সাথে এসেছিলো খেতে;
> সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
> সূর্য উঠবে জেনে স্থির হ'য়ে ঘুমায়ে রয়েছে।

কৃষকের দৃষ্টান্ত সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার প্রতারণা নয়, বিভ্রান্ত মানুষের কানে স্থির এবং সৃষ্টিশীল হ'য়ে ওঠার ইঙ্গিত। ইতিহাসেও জীবনানন্দ অনুরূপ সত্যের সন্ধান পেলেন: 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে…আছে আছে আছে—এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়…।'

যা ঘ'টে গেছে তার সঙ্গে যা ঘটছে এবং ঘটবে তার যোগসূত্র খুঁজে না পেলে ইতিহাসবোধ নেহাৎ ভূতুড়ে অনুভূতির জন্ম দেয়। এই প্রত্যয়,

অবশেষে, জীবনানন্দকে স্থিতাবস্থার বিশ্লেষণে সাহায্য করল। লোভহিংসা-রক্তক্ষয়দুষ্ট সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি এক লহমায় উপলব্ধি করলেন যে আধুনিক মানুষের ব্যবহার যন্ত্রের মতোই নিখুঁত এবং যন্ত্রের মতোই প্রাণহীন; কথায় এবং কর্মে সত্যকার আত্মীয়তা না থাকায় তাদের উচ্চারিত প্রত্যয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসার শব্দাড়ম্বর মাত্র। আজকাল দর্শনবিজ্ঞান-নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত অনেক গুরুভার শব্দ এবং একাধিক বিমল সিদ্ধান্ত আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাকে অলংকৃত করে; আমরা অনেক কিছু জানি, মানি এবং বুঝি; জ্ঞানের রাজ্যে আপাতত আমরা অনেক দূর অগ্রসর। এ-কথা স্বীকার্য, জীবনানন্দ বলেন, অর্জিত বুদ্ধি আমাদের উপকরণ বর্ধিত করেছে, আমাদের মার্জিত করেছে, চতুরালি শিখিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময়, ব্যবহারিক জীবনে, দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে, তার নির্দেশ কি আমরা গ্রাহ্য করেছি? ,করিনি; ফলে, জ্ঞান আজ শুধুই খবর-জানা, জ্ঞান আর কল্যাণকর্মের নির্দেশক নয়। তাই যদি হ'ত, তাহলে পৃথিবীর সান্নিপাতিক হিংসাদ্বেষ কলকোলাহলের অবসান আমরাই স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতাম। কেননা, চারদিকের শেষহীন বিরোধবিসংবাদ সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের মনে সুস্থভাবে বাঁচবার সাধ এবং সংকল্প রয়েছে:

> ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায়;
> তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে; মানুষের মন
> জানে জীবনের মানে: সকলের ভালো ক'রে জীবন যাপন।
> কিন্তু সেই শুভ্র রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;
> যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
> মানুষের লালসার শেষ নেই;
> উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
> অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
> অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
> নেই।

মানুষ যদি সত্য-সত্যই জীবনকে ভালোবাসে, সৎ সুন্দর সমবায়িক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে কেন এই পৌনঃপুনিক মন্বন্তর, এই অশ্লীল উত্তেজনা, হিংসার নখদন্ত? ক্রান্তদর্শী জীবনানন্দ এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে আজকের মানুষ শুধু ধ্বনিময় শব্দই শিখেছে, শব্দের অন্তঃসার কি ব্যঞ্জনা তার অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয়নি। কর্মের তাৎক্ষণিক প্রেরণা আবেগ। আধুনিক মানুষের ক্রিয়াকর্মের পিছনে যে-আবেগ চালকের আসনে রয়েছে, প্রায়শই তা কবন্ধ, বুদ্ধিবর্জিত। পক্ষান্তরে, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ বুদ্ধি আবেগের দ্বারা পরিশীলিত তথা সক্রিয় হ'য়ে শুভবুদ্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে না। প্রেমের অভাবে আমাদের জ্ঞান অর্থময় এবং জ্ঞানের অভাবে আমাদের প্রেম কার্যকরী না হওয়াতেই সাধের সঙ্গে সাধনার এতো বিরোধ, বাচনের সঙ্গে ব্যবহারের :

> আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
> কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
> মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
> সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
> মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
> না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল;
> জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
> অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
> আমাদের এই শতকের
> বিজ্ঞানে তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু;
> তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
> জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগের সমাজসংকট জীবনানন্দ দাশের কাছে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ব'লে মনে হয়নি, আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক হৃদয়হীনতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং শোচনীয় ব'লে মনে হয়েছে। 'হৃদয়কে না জাগালে', মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব'কে 'ভোর, পাখি অথবা বসন্তকালে'র সৌন্দর্য সম্বন্ধে পুনরায় অবহিত করতে না পারলে, কিছুতেই আর

মুক্তি নেই—এই বাণীই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন; এবং তার চাইতেও বেশি কিছু, সৌন্দর্য কাকে বলে তার অতুলনীয় নমুনা দিয়ে। সেই সৌন্দর্য শুধু চোখেরই নয়, মনেরও।

ফলত, জীবনানন্দ দাশের সামগ্রিক কাব্যসাধনা প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রয়াস। জ্ঞান এবং প্রেম, ইতিহাস এবং নারী, স্মৃতি এবং সাধ—তাঁর কাব্যে একাত্ম, অবিভক্ত এবং সমার্থবাচক। প্রেমই, তাঁর মতে, সমুদয় মনুষ্যকর্মের উদ্দীপক, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমিতা। এই বোধ যেহেতু জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গ, তাই, যৌন একাগ্রতার চাইতে বিস্তারিত, জীবনানন্দ-কল্পিত নারীরা কদাচিৎ রক্তমাংসের, এই বোধ মনে হয় জীবন-ও-জগৎ-লীন হ'য়ে থাকার অনুভূতি, মাটির সঙ্গে আকাশের সঙ্গে একাত্ম অভিভূত হ'য়ে থাকার বিমিশ্র মরমী আনন্দ। যে-অন্ধকারের দিকে জীবনানন্দের কবিতা আমাদের টেনে নিয়ে যায়, যেটা আমার কাছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, তাও এই প্রেম-প্রজ্ঞার মিশ্রিত-বোধ। 'নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মায়ের মতো', 'নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার', 'অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে', 'একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল', 'মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার', 'স্নিগ্ধ আঁধার', 'অন্ধকার সনাতনে ডুবে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয়', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'—ইত্যাদি পংক্তির ইঙ্গিত, জীবনানন্দের ভাষাতেই বলতে গেলে, 'বাইরের জীবন থেকে সত্যিকারের জীবনে পালিয়ে যাওয়া', যে-জীবন অন্তর্লোকের অনুভূতিময়, 'উজ্জ্বল সময়স্রোতে' ভেসে থাকার চেতনায় সৎ, সাধু এবং সুন্দর। এই জীবনের স্বাদ না পেলে মহৎ মানুষ এবং সমাজ সৃষ্টি অসম্ভব।

আর, জীবনানন্দের কাছে জ্ঞান মানে পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতির কর্মভাবনার আবছায়া; স্থূল গ্রন্থ নয়, বরং ধূসর পাণ্ডুলিপি; কখনো বা কতিপয় মেধাবী মনীষীর মুখাবয়ব। এটা ঠিক সুস্পষ্ট ইতিহাসচেতনা নয়, কেননা ইতিবৃত্তের প্রতি তাঁর কোনো হিসেবী উৎসাহ নেই, কিন্তু যেটা ইতিহাসের অন্তঃসার, একটা জন্মজন্মান্তরের শাশ্বত যাত্রীর বেদনা, একটা যোনিচক্রস্মৃতির

প্রদাহ, উত্তরাধিকার বোধ—জীবনানন্দের কাব্যে তা প্রথমাবধি উপস্থিত। যুদ্ধে নয়, আস্ফালনে নয়, আশায় ভালোবাসায় 'সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন' সম্ভব। স্বভাবতই দুর্যোগের দিনে জীবনানন্দ আমাদের প্রেমিক হ'তে উপদেশ দিয়েছেন, বিশ্বাস রাখতে বলেছেন 'জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা'য় :

> আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
> চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
> খানিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায় ;
>
> জলের মরণশীল ছলছল শুনে
> কম্পাশের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
> সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হ'তে ব'লে
> আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে ;
> পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
> লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
> সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।

এত বড়ো প্রেমিক, আস্তিক এবং সত্যবাদী কবি আমাদের দেশে অল্পই জন্মেছেন।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

নরেশ গুহ

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ছাপা হ'ল মে মাসে, অক্টোবরে জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। তাঁর কবিতা গোড়া থেকেই অভিনব ছিল, এবং বিস্ময়করভাবে স্মৃতিমন্থনকারী। আমাদের মতো যাঁদের বয়স আজ তিরিশ ছুঁয়েছে, কি ছোঁবে, তাদের মনে গত দশ বারো বছর ধ'রে সব চাইতে বেশি গুঞ্জরণ ক'রে ফিরেছে তাঁরই লেখা নানা পংক্তি, উপমা আর অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহিত সব কথা। শুধু যে মজা পেয়েছি তা নয়। মজাও পেয়েছি, আবার নিক্তিনিরপেক্ষ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে কতো সময় অবাক হ'য়ে দেখেছি জীবনানন্দেরই কোনো-না-কোনো লাইন বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। আধুনিক কাব্যের দরজায় এক দুর্ভেদ্য জটিলতার আতঙ্ক অথচ আশা নিয়ে দাঁড়াতেই আমরা অভ্যস্ত। সে-জটিলতার প্রত্যাশাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন জীবনানন্দ—অর্থাৎ, দশ বারো বছর আগে পর্যন্ত লেখা যাঁর কবিতার প্রেমে পড়েছিলাম আমরা। সরল, অথচ তরল নয় ; ভাবালুতার লেশমাত্র নেই কোথাও—যে-কারণে বহুল অনুকৃতি সত্ত্বেও জীবনানন্দে প্রীত কান-মনের সংখ্যা বস্তুতই কম। সেই আমরাও অনেকে থমকে গিয়েছিলাম তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় এসে। থমকে হয়তো তিনিও গিয়েছিলেন। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ করলে তাঁর চোখে-মুখে সেই বিখ্যাত জীবনানন্দীয় কৌতুকের চাপা হাসি দেখা দিতো—যে-হাসি কোনোদিন ভোলবার নয়। দুর্বোধ্য লাগতো, কিন্তু হাল ছাড়তুম না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'—'এক পয়সায় একটি' সিরিজের আদি সংস্করণে বাদামি রঙের ছোট্ট, চটি বইটি—দিয়ে যিনি কিনে নিয়েছেন আমাদের—তিনি আমাদেরও জলাঞ্জলি দিয়ে অন্য কোনো প্রচেতা পাঠকের জন্য বচনাতীত রকমের গভীরতর কাব্য রচনা করছেন ব'লে স্বীকার করতে ইচ্ছে করত না। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় তাই একসঙ্গে এত রচনার সংকলন পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যে পূর্বাপর কবিতার মধ্যে

নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারলে তাঁর শেষ লেখার সঙ্গে আগেকার লেখার কিছু পারম্পর্য নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার সে-আশা নিষ্ফল হয়নি। শেষ পর্বের অন্তত কিছু কবিতার মধ্যে নিজেকে আমি প্রবেশ করাতে পেরেছি। তাঁর শেষতম কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপিটিও সম্প্রতি আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে—যে-সব কবিতাকে সংশোধন—তাঁর ভাষায় 'পরিশোধন'—করবার সময় আর তিনি পাননি। যদিও এ-সব রচনা আমাকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'-এর সম-পরিমাণে আচ্ছন্ন করেনা,—তাহ'লেও বলতে পারি কান-মনকে অভ্যেস করিয়ে নিতে পারলে এ-কবিতাগুলিও আগের মতোই স্বচ্ছ ব'লে ঠেকবে। এবং বার-বার সে-সব কবিতা পাঠ করার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে কাব্যের একটি মহত্তর পর্ব বিবর্তিত হ'য়ে উঠতে-উঠতে অসময়ে থেমে গেল। জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। অন্তপর্বের রচনাবলী অবশ্য অনেকের কাছেই এখনো

> পর্গ্যার ছবির মতো—তবু [ও] পর্গ্যার চেয়ে শুক্নহাত থেকে
> বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে টায়ে—

তাহ'লেও, মনে হয়, আদিপর্বের নিবিড় নির্জন নিসর্গনিকেতনে বহুকাল কাটানোর পর, মানবভাগ্যের এই তৃতীয় অঙ্কে দিনের আলোর সমাজসংসারে যদি তিনি প্রবেশ না করতেন, এ-যুগের বেদনার, তৃষ্ণার, জিজ্ঞাসার অন্ধকারে তাঁকে যদি পথ হাৎড়াতে না দেখতাম তাহ'লেই বরং নিরাশ হতাম আমরা। অভিযোগ থেকেই যেতো।

এ-যুগের পক্ষে অভাবনীয় এক সৎ-কবির জীবন তিনি যাপন ক'রে গেলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রাবন্ধিকও। গল্পে উপন্যাসেও তাঁদের কারো কারো প্রতিভা সমান উৎসাহী। জীবনানন্দ শুধুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেননি। তাঁর যে দু-চারটি প্রবন্ধ সাময়িকপত্রের পাতায় প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে সে-ও একরকম কবিতাই, তাঁর কবিতারই মতো বিশেষ একধরনের গদ্যে লেখা। এবং কবিতা লিখতে ব'সে উদ্দামতম কবিত্ব ক'রে যেতে তিনি দ্বিধামাত্র করেননি। তাঁর গদ্য-

কবিতার কথা মনে রেখেই এ-কথা বলছি। আসিতেছে, কাটায়েছে, ডাকিবার, কয়, করিবে,—এ-ধরনের ক্রিয়াপদশব্দের অনর্গল ব্যবহার তাঁর কবিতার দোষ না হ'য়ে বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ হ'য়েই দেখা দিয়েছিল।

তাছাড়া এ-যুগের আধুনিক নগরবৃত্তিকে আমরা একরকম সবাই যেমন মেনে নিয়েছি, তিনি তাকে বহুকাল আমল দেননি। একদিকে যখন ছাপা হচ্ছে খাঁটি নগরজীবন নিয়ে লেখা সমর সেনের চতুর তুখোড় সব কবিতা, জীবনানন্দ লিখছেন : ঘাস, হাওয়ার রাত, বুনো হাঁস, শঙ্খমালা। বরিশালে জন্ম, বরিশালেই জীবনের প্রধান অংশ কাটিয়েছেন। কলকাতার আকর্ষণ একেবারে যে ছিলো না তা নয়, শেষ দিকে বরং এই জনরোলে-দেয়ালে-ইস্পাতে হাঁপ-ধরানো, এবং তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের কলকাতাকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু এ-আকর্ষণ সেই রকমের যা দুই বিরুদ্ধের মধ্যেই শুধু সম্ভব।

নিতান্ত শেষ ক'বছরের ছাড়া তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা নিয়ে গ্রাম-বাংলা উপস্থিত—বরিশালের, কখনো আসাম-অরণ্যের আরসিতে যে পল্লীপরিবেশকে তিনি চিনেছিলেন। বাল্যে বরিশালের লাশকাটা ঘরটা তাঁর কাছে যে অদম্য এক কৌতূহলের বিষয় ছিল, অন্ধকারে একা-একা মাঠে পায়চারি করতেন আর তারা দেখতেন, ফরেস্টর কাকার সঙ্গে তিনি যে কিছুকাল আসামের অরণ্যে বাস করেছেন কিংবা তাঁদের বাড়িতে যে ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে অসংখ্য শিকারের ট্রফি—বাঘের চামড়া, হরিণের শিঙের ধূসর পাণ্ডুলিপি—ঝোলানো ছিল, এ-সব কথা জানাটা কবিতার উপভোগ বাড়ায় না বটে, কিন্তু শিল্পীমনের বিশেষ প্রবণতার কিছুটা রহস্য উন্মোচন করতে পারে হয়তো। নেহাৎ তালিকা করলেও দেখা যাবে, বাংলাদেশের গাছপালা, ফল, পাখি, জীবজন্তুর এত নাম আর কোনো কবির রচনাতে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল প'ড়ে থাকে জীবনানন্দের কবিতায়। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি খেলা করে, হলুদ পাতায় ভিড়ে ব'সে শিশিরে পালক ঘসে পাখি ; সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ

পিপুলের গাছে ব'সে একা পেঁচা দেখে ; জলপাই অরণ্যের পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ; জোনাকিতে ভ'রে যায় অন্ধকারে আকন্দধুন্দুল। এ-সব 'তুমুল গাঢ় সমাচার' আমরা ইতিপূর্বে আর কারো কবিতাতেই পাইনি। অনেক শিরীষের ডাল, অশথের চূড়া, সুন্দরীর অর্জুনের বন, বাবলার গলির অন্ধকার, শাল পামের নিবিড় মাথা, উঁচু উঁচু হরিতকি গাছ, আম নিম জাম ঝাউ পিয়াল পিয়াশাল আমলকি পিপুল দেবদারু—ভিড় ক'রে আছে। তলায়—ফণিমনসার কাঁটা, জামিরের বন, শরকাশ হোগলা আর মধুকুপী ঘাস। কান পাতলেই কবিতায় অন্তহীন এক অরণ্যের মর্মর শুনতে পাই যেন, ঝর ঝর ক'রে গায়ে মাথায় রাশি রাশি হলুদ হেমন্তের পাতা ঝ'রে পড়ে। আর এই জীবনানন্দীয় আরণ্যপ্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী পাখি কীটপতঙ্গের আসা যাওয়ায় সতত চঞ্চল, প্রাণের নিছক উল্লাসে, অপচয়ে, আলস্যে স্পন্দিত হচ্ছে : থুরথুরে অন্ধ পেঁচা, একা পায়রা, অবিচল শালিখ, সোনালি চিল, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, জলপিপি কিংবা দুরন্ত শকুন। সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমের-ঘ্রাণ-পাওয়া হাঁস—পুকুরপাড়ে ; স্ফটিক-পাখনা-মেলা বোলতা—নীলিমায় ; শাদা বক—নীল হাওয়ার সমুদ্রে। শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে জ্যোৎস্নায় বুনো হাঁস উড়ে যায়। আরো আছে। পদ্য-সাজানো অলংকার হিসেবে নয়, অবয়ব হ'য়ে কবিতায় মিশে। কেননা কাঁচপোকা, গঙ্গাফড়িং, চড়ুই দোয়েল ঝিঁঝিঁর কথা যাই হোক, মাছি আর নীল মশা, পাটকিলে ডানা চিল, ভাঙা ডিম, মাকড়ের ছেঁড়া জাল, পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ অথবা রাতচর ডাঁশ দিয়ে কবিতার যাকে বলে 'শোভাবর্ধন'—সেটা করার কথা কল্পনা করা যায় না। হয়তো 'সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি' (বিশ্বাস ক'রে পড়া গ্রন্থ থেকে এসেছে ?) অথবা 'চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল' সৌখিন কল্পনাকে সুড়সুড়ি দেবে ; 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়াটাও মনে হ'তে পারে বনেদি রোমান্স ঘেঁষা। কিন্তু শেয়াল ? গাধা ? নেউল, বিড়াল, মহীনের ঘোড়া আর ঘাইহরিণী ? সামুদ্রিক কাঁকড়া, গলিত স্থবির ব্যাং আর বাটা মাছ ? এরা সব নিজের নিয়মের প্রয়োজনেই জীবনানন্দের কাব্যে প্রবেশ করেছে। পাসপোর্ট আছে।

শুধু উল্লেখ নয়, জীবনানন্দীয় উপমার ঐশ্বর্যও জীবজন্তু গাছপালার জগৎ থেকে সংগ্রহ করা। রঙের সূক্ষ্মের তারতম্যের কথা বলতে গেলেই বাংলা ভাষার লেখকের অসহায় অবস্থা। জীবনানন্দের বীক্ষণী দৃষ্টিতে তার চমকপ্রদ সমাধান ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতায় আকাশ কখনো 'ময়ূরের সবুজ নীল ডানার' রঙের, কখনো তা কোমল নীল 'ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো'। লালই বা কত রকমের : 'নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল', চোখের লাল হিজলকাঠের রক্তিম চিতায় (উপভোগ করতে হ'লে কাঁচা হিজলকাঠের ছাল ছাড়িয়ে দেখতে হয়)। রোদ্দুরের অন্য রং রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো ; কখনো তা হ'য়ে ওঠে কচিলেবুর পাতার মতো নরম সবুজ। পেয়ারা আর নোনা গাছের সবুজ আবার টিয়ার পালকের মতো। প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মতো ঝলমল করে নক্ষত্র : দেখার দৃষ্টি চাই, সৌখিন কল্পনার কর্ম নয়। আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো ধবল চিতল হরিণীর ছায়া অথবা বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ দেখাবার মতো দৃষ্টি কখনো শহরে জন্মায় না।

আশ্চর্য হ'য়ে আবিষ্কার করলাম—গাছ ঝোপঝাড় মাঠ প্রান্তরের এই বিশাল রাজ্যে ফুল নেই—ক্বচিৎ মোরগফুল, মচকাফুল, দু-একটা শসাফুল আর শাদা মরা শেফালির বিরল উল্লেখ ছাড়া। ফল আছে, তাও সামান্য : তরমুজ-মদ আর লুপ্ত নাসপাতির গন্ধের কথা আছে এক কবিতায় ; লোকসানি বাজারের বাক্সের আতাফলও পাওয়া গেল। বাকি থাকে শুধু বেতফল ('তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল'), আবিষ্ট পুকুরের সিঙাড়ার ফল (পানিফল বললে আরো চেনা লাগবে), আর দু-একটা নষ্ট শাদা শসা। অথচ বার-বার ঘুরে-ঘুরে যে-জিনিশের কথা জীবনানন্দের কবিতায় আসে তা ফল নয়, ফসল : গোধূম, যব, ধান। ধানের গল্প বলতে তাঁর ক্লান্তি নেই। এ-সব হেমন্তের নিজের ভাঁড়ার থেকে এসেছে।

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে প'ড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে—কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও রাখা আছে তাহলেও ফলন্ত ধানের ঋতু

হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য পূর্ণতা বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত। বাংলা কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর। এবং সে-দুটি বিখ্যাত ঋতুই—বিখ্যাত আরো অনেক কিছুর মতো—জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জন্মান্তর ঘটেছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হ'য়ে ছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত শস্যের, তৃপ্তির, বিরতির:

> হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে—
> দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

গর্ভবতী জননীর মতো সে:

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে;

মৃত্যুর শূন্যতা নিয়ে মৃতের শিয়রে সে দাঁড়িয়ে থাকে; সভ্যতার সংকটের কথা ভাবতে গিয়েও মনে হয় হেমন্ত তার প্রতীক। আবার শেষ দিককার কবিতায় তা প্রতীক হ'য়ে উঠেছে সভ্যতার যে ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি, সম্পদ—তার:

> হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে;

কোথাও বা সৃষ্টির অন্ধকার রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত করেছেন তাকে:

> আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
> হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল;

হেমন্ত আসলে একই কালে জীবন-মৃত্যু, সভ্যতা-সংকট, পূর্ণতা আর বিনষ্টির একাত্ম প্রতীক। জীবনানন্দের এই হেমন্ত-দৃষ্টি থেকেই অনুমান করা যায়, অব্যবহিত সংসারের ঋণ রক্ত সফলতা গ্লানি আস্পর্ধা আর পাপ তাঁকে সাময়িকভাবে ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত এবং অস্থির ক'রে তুললেও নিস্তেল নিরাশ্রিতের

অনবলম্ব হতাশা শেষ পর্যন্ত কখনোই তাঁর নাগাল পাবে না। তার আংশিক প্রমাণ 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' শেষ দিকের পাতায় উপস্থিত।

তবে একটা কথা ঠিক। মানুষের কিমাকার সমাজের অনভ্যস্ত পরিবেশে জীবনানন্দ স্পষ্টতই অপ্রতিভ বোধ করেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্ন তিমিরে মারী মন্বন্তরের শৃগাল গৃধিনী এবং হায়েনারা ততদিনে বাংলা-দেশে ইতস্তত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে বিকেলের ছায়া। 'অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস কেবলি শিথিল হ'য়ে যায়'।

> এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
> চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
> রাত্রির মায়ের মতো:

যে-অন্ধকার এসে 'মানুষের বিহ্বল দেহের সব দোষ' প্রক্ষালিত ক'রে দেবে। নেই, নেই। হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে।

> অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বাভাবিক ভাবে পথ দিয়ে
> কি ক'রে তাহলে তারা এরকম ফিচেল পাতালে
> হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে!

দুর্যোগের এমন নিকটে থেকে আর তাকে উপেক্ষা করবার মতো সাধ্য জীবনানন্দেরও ছিলো না। এবং তাঁর মতো জীবনবিহ্বল কবির গলাতেও এই প্রথম তির্যক ব্যঙ্গের সুর লাগলো, প্রকট হ'য়ে উঠল সেই বিসদৃশের দিকে আড়চোখে তাকানো জীবনানন্দীয় কৌতুক-প্রবণতা, নিঃশব্দ অট্টহাসির মতো একবার কেঁপে উঠে যা আমাদের চমকিয়ে দেয়। এ-কালের কবিতায় কাক চিল ধবল চিতল হরিণীর জায়গা নিয়েছে সোমেন পালিত, সুবিনয় মুস্তফী, অনুপম ত্রিবেদী; বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের ইহুদী রমণী, থামে ঠেস দিয়ে লোল নিগ্রো, আধো আইবুড়ো ভিখিরি আর শাঁকচুন্নির মতো ভিখারিনী ('একদিন হাঁস ছিলো হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁস হাঁস!'); ফেঁসে-যাওয়া হাইড্র্যাণ্ট থেকে কুষ্ঠরোগী জল চেটে নেয় এখানে, বাতাস বিশুষ্ক চিনেবাদামের মতো, মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় বিকেল; স্থির পেট্রল ঝেড়ে মোটরকার গাড়লের মতো

কেশে রাত্রিতে মিশে যায়। আর দিকে-দিকে লক্ষ্যহীন অর্বাচীনের উত্তাল ব্যস্ততা শুধু, যেন

> কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
> জলের মতন দামে।

তাই উর্ধ্বশ্বাস সকলে, যদিও 'অনির্বচনীয় হুণ্ডি' একজন দুজনের হাতেই শুধু রয়েছে আজকের পৃথিবীতে।

> বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
> কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।

বুঝতে পারি জীবনানন্দ এতকাল পরে শহরে এসেছেন, এসেছেন তাঁরই মন-প্রাণ নিয়ে। কিস্তুত প্রসঙ্গে কৌতুকপ্রিয় তিনি পূর্বেও ছিলেন,—লাশকাটা ঘরের অন্ধ পেঁচা মনে পড়বে ;—সে-কৌতুক তখন তাঁর নিজেকেও লেগেছে, সেধে গায় মেখেছেন তিনি, যেন প্রাণের রঙ্গ মেনে কৌতুক করছেন। তার মধ্যে বিদ্রূপের জ্বালা ছিলো না। সে ছিলো আর এক পৃথিবীর কথা, যে-জগতে ফিরতে হ'লে এ-যুগের জীবনানন্দকে 'সতেরো বছর আগেকার লেখা' শোধন ক'রে সাধ মেটাতে হ'ত। এখন যখন যুগান্তের কিমাকার মানুষগুলোর কথা ভেবে তিনি লেখেন :

> মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে
> (এ রকম উত্তেজিত হয় ;)
> উপস্থাপয়িতার মতন
> আমাদের চায়ের সময়
> এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।

কিংবা বলেন

> তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
> বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

তখন দেখি কণ্ঠে করুণার আবেশ মাত্র নেই, বন্ধুতা না, কান্নাও না। দেখি ক্রোধ, শুনি বিদ্রূপ, ভৎর্সনা।

পরে আরো গভীরতর জিজ্ঞাসার তিমিরে নেমে পড়েছিলেন, সপ্রশ্ন তাকিয়েছিলেন সমাজের সভ্যতার অন্তিম লক্ষ্যের দিকে, তাঁকে বিচলিত করেছিল অনন্ত ক্ষতি ক্ষয় মৃত্যুতে বলয়িত, তথাপি অক্লান্ত, যে প্রাণরঙ্গ তার আচ্ছন্ন ওঙ্কারধ্বনি। চিত্ররূপময় ঐশ্বর্যের গরবিনী ভাষা শাঁখা-পরা শূন্য হাতের মতো এ-যুগে নিরলংকার হ'য়ে এসেছে, উপমার মণিমানিক্য নিয়ে খেলা করার মন নেই :

> পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম ;
> কাকে তবু ?
> পৃথিবীকে ? আকাশকে ? আকাশে যে সূর্য জ্বলে তাকে ?
> ধুলোর কণিকা অণুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে ?
> নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে ?
>
> ———
>
> কেন আলো ? মাছিদের ওড়াউড়ি ?
>
> ———
>
> হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু ?
> বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন উরের আরশি থেকে ফেঁসে
> অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও—দুপুর বেলায় ;

দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসা আমরা কবির কাছে কখনোই প্রত্যাশা করি না। তবে চিরকাল যে-সব প্রশ্নচিহ্ন সপ্তর্ষির মতো মানুষের প্রাণে প্রলম্বিত রয়েছে, তা আর এক পৃথিবীর আর এক পরিবেশের কবিচিত্তেও স্পন্দন জাগাবে—সেটা স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম মৃত্যু কর্মফল, জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য, আর সভ্যতার পরম উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে সেই অনাদ্যন্ত প্রশ্ন আবর্তিত হয়। ইয়েটস তাঁর শেষ কবিতায় বলেছেন :

> *Cast a cold eye*
> *On life, on death.*
> *Horseman, pass by !*

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

প্রায় একই কথা দেখছি জীবনানন্দের শেষ লেখায়। তিনি যেন সৃষ্টির নাড়ির উপরে হাত রেখে বুঝতে পারছেন

> অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ

প্রাণের সার্থকতা অনন্ত দ্বন্দ্বের হাত ধ'রে চিরকাল এগিয়ে চলার মধ্যে। ভুলের বিনুনি থেকে হৃদয়কে খুলে-খুলে বিশ্বের সৃষ্টিকাণ্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে চ'লে যেতে হবে—যতকাল প্রাণ টি'কে আছে পৃথিবীতে, রাঙা রৌদ্রে স্ফটিক পাখনা মেলে যতকাল বোলতার ভিড় উড়ে যাবে।

> 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়—
> জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয় জয়।

আর এই চলতে-চলতে দশজনের মিলিত সংসারকে নিরাময় ক'রে নিতে পারবে হৃদয়ের সেই অমোঘ গুণ, যার সাধনা মহাপুরুষেরা চিরকাল ক'রে গেছেন :

> দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো

হেমন্তের দৃষ্টিভরা কবির কণ্ঠস্বরটিই আবার শুনতে পাই যেন। ক্রোধ নয়, বিদ্রূপ নয়, উদাসীনতাও নয়, প্রেম প্রীতি করুণায় স্নিগ্ধ হ'লে তাঁর শিল্পচৈতন্য মহত্তর সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েছিল।

* জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা : নাভানা ৫৲

জীবনানন্দের জগৎ

অশোকবিজয় রাহা

জীবনানন্দের কবিতায় কুয়াশা-ঢাকা এক ধূসর জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। ঠিক সজ্ঞান পরিচয় নয়, আমাদের বুদ্ধিদীপ্ত মন এখানে এসে কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, অর্ধ-চেতনার অস্পষ্ট আলোক এখানকার সব-কিছুই অন্যরকম ব'লে মনে হয়, পরিচিত বস্তুগুলিও চারদিকে রহস্যঘন হয়ে ওঠে, অথচ এদের অস্বীকার করতে পারি নে, আপাতদৃষ্টিতে এরা যতই অস্পষ্ট হোক এদের মধ্যে এমন একটি গভীর সত্যের ইঙ্গিত পাই যাকে আমাদের একটি মহৎ প্রাপ্তি ব'লেই মনে করি।

এই অর্ধ-পরিচিত জগৎটি সত্যই বড়ো বিস্ময়কর : এখানকার জল-স্থল-আকাশে যেন একটা প্রকৃতিগত পরির্তন ঘ'টে গিয়েছে : এখানে বস্তুপ্রতীতি আছে অথচ বস্তুভার নেই, বস্তুর গাঢ়তা আছে কিন্তু কাঠিন্য নেই ; এ যেন অস্ত-আকাশে ভেসে-ওঠা একটি গোধূলি-মেঘের জগৎ—কোথাও জমাট বেঁধেছে, কোথাও এলিয়ে পড়েছে, কোথাও ছড়িয়ে গিয়েছে, আবার কোথাও বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে ; রূপের বৈচিত্র্য, রঙের খেলার অন্ত নেই, অথচ সব-কিছু থেকেই ঝরছে ম্লান আলোর করুণ বিষণ্ণতা, যেন এরা ফুটে উঠেছে মিলিয়ে যাবার জন্যেই, এরা কেবলি রূপান্তরিত হচ্ছে : একটি আকারের সঙ্গে আরেকটি আকার মিশে যাচ্ছে, একটি রঙের সঙ্গে আরেকটি রঙ মিশে গিয়ে দেখতে-দেখতে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, অথচ অনুভব করছি, এদের সঙ্গে আমাদের চেতনার কোথায় যেন একটা মিল আছে, এদের সত্তার সঙ্গে কোথায় যেন আমরা একাত্ম তাই আমাদের সত্তাকেও এরা আস্বাদময় ক'রে তুলেছে।

কী ক'রে এ হয়, সে এক আশ্চর্য। শীতের সন্ধ্যায় নির্জন হ্রদের বুক থেকে কুয়াশার সূক্ষ্ম বাষ্পরেখা উঠে যেমন চারদিকের পাহাড় ও বনকে চুপে চুপে ঘিরতে থাকে এবং শেষে হ্রদ, পাহাড়, আকাশ সব ঢেকে একাকার ক'রে দেয়—জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে আমাদের চেতনাও তেমনি প্রথমে একটু-

একটু ক'রে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হতে থাকে এবং পরে এক প্রগাঢ় অনুভূতির ঘন বাষ্পে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। তাঁর ভাবকল্পনার বিচিত্র ইঙ্গিতগুলিকে অনুসরণ ক'রে আমাদের মন ধীরে ধীরে চেতনার এমন এক ধূসর প্রান্তে মিশে যায় যেখানে জড় জগৎ ও চৈতন্যলোকের ভেদরেখাটি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেখানকার মূর্ছিত আলোকে আমরা আমাদের সত্তার মধ্যেও এ-দুটি জগতের আদিম আত্মীয়তা অনুভব করি। এ যেন চেতনে-অচেতনে-মেশানো এক স্তিমিত-উজ্জ্বল বাষ্পলোক,—এক আদিসৃষ্টির নীহারিকা যা বর্তমান কালের পূর্ণপ্রকাশিত জগতের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছে; কবির নিগূঢ় ধ্যানে সে ধরা দিয়েছে এবং সেখান থেকে তার মৃদু আলো বিকিরণ করছে :

পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো এক আলো আছে; দেহে তার বিকেলবেলার ধূসরতা।
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।

'পৃথিবীর কঙ্কাবতী' সত্যিই সেখানে 'ম্লান ধূপের শরীর' পায়, এবং তার দেহেও মিশে থাকে সেই 'বিকেলবেলার ধূসরতা'। এখানে কবি তাঁর রহস্যময় উপলব্ধিটিকে অতি আশ্চর্যভাবেই প্রকাশ করেছেন: রূপ যেখানে ধূপবাষ্প সে-জগৎ আমাদের অবচেতন মনেরই কাছাকাছি, তাই এই বিশেষ প্রতীক ও ব্যঞ্জনার সাহায্য কবি তাঁর অনুভূতিটিকে আমাদের মনে প্রায় সত্তার আস্বাদের মতো ক'রেই এনে দিয়েছেন।

বস্তুত চেতন-অচেতন-মেশানো এই চির-গোধূলির জগৎটি আর কোনো কবির রচনায় ঠিক এ-ভাবে ধরা পড়েনি। অবশ্যি কবি মাত্রেই কোনো-না-কোনো মুহূর্তে এই রহস্যময় জগতের ইশারা পেয়েছেন, এবং স্বকীয় ভঙ্গিতে সে-অনুভূতিকে প্রকাশও করেছেন,—কিন্তু জীবনানন্দ যেন সব সময়ই এই প্রচ্ছন্ন-লোকের অধিবাসী, বিশেষ ক'রে এখানেই তাঁর হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয়। কবি নিজেই এক স্থানে বলেছেন :

আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-

অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতো যেন জ্ব'লে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে-সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে-সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না…

('কবিতার কথা'—'কবিতা', বৈশাখ, ১৩৪৫)

কবির এই উক্তিটিকে ভালো ক'রে বুঝে নেয়া প্রয়োজন : আমাদের ইন্দ্রিয়-চেতনার কাছে হাজারখানা হয়ে ছড়ানো যে-জগৎ—আমাদের বুদ্ধি দিয়ে যাকে আমরা বিশ্লেষণ করি, ব্যাখ্যা করি, যুক্তি দিয়ে তৌল ক'রে বিচার করি—এই জগতের, 'এই খণ্ডবিখণ্ডিত পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের,' সজ্ঞান চেতনা যতক্ষণ পর্যন্ত কবির মনকে অধিকার ক'রে থাকে, ততক্ষণ তাঁর কাব্যরচনার অনুকূল লগ্ন আসন্ন হয় না। এই ব্যবহারিক জীবনের 'মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও' কবির কাছে যখন 'থেমে যায়,' সমস্ত ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসে,—তখনি কবি তাঁর সত্তার গভীরে এক বৃহৎ অখণ্ডতাকে অনুভব করেন, মহাসমগ্রতার সঙ্গে তাঁর সত্তার সাযুজ্য ঘটে, এবং সেই 'একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায়' তাঁর হৃদয় একটি মোমের মতো যেন জ্ব'লে ওঠে'। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে কবিতার জন্ম হয়। এই নরম অনুজ্জ্বল মোমের আলোটি আসলে কবির স্তিমিত বোধচৈতন্যের আলো; মহাসমগ্রের অখণ্ড অনুভূতি থেকে তাঁর হৃদয়ে বোধ-চৈতন্যের এই অস্ফুট' আলোকবিন্দুটি জ্ব'লে ওঠে এবং তাঁর মৃদু কোমল আভায় আলোকিত জীবন ও জগৎ এক নূতন অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনায় রহস্যময় হয়ে ওঠে।

কবিতা রচনার কালে জীবনানন্দ সব সময় এই আলোতেই জগতের সব কিছুকে দেখেন,—সকল আলো, এমন কি অন্ধকারকেও হৃদয়ের এই আলোতেই প্রত্যক্ষ করেন। এখন থেকে এই আলো ছাড়া—

অন্য সব আলো আর অন্ধকার এখানে ফুরালো।

কবি কখনো চেয়ে দেখেন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে 'কমলা-রঙের রোদ' কখনো কোনো এক আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পান 'হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে,' আবার কখনো তাঁর চোখে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে

'আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো'। এর পর যখন ধীরে ধীরে রাত নেমে আসে—

তখন হলুদ নদী
নরম নরম হয় শর কাশ হোগ্‌লায়—মাঠের ভিতরে,

দূরদিগন্তে দেখা যায়—

শিরীষবনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ,

এদিকে পায়ের অতি কাছে মাটিতে—

বালির উপরে জ্যোৎস্না,—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো—

কবি জগৎকে যখন থেকেই তাঁর হৃদয়ের রহস্যময় আলোকে দেখতে শুরু করেছেন তখন থেকে প্রতি মুহূর্তেই জগতের সঙ্গে তাঁর এক নূতন বিস্মিত পরিচয় ঘটছে। এ বিস্ময় অন্তহীন। কবির প্রতিটি কবিতায়, প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে এ-বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বস্তুত এইখানেই জীবনানন্দের কবিতার মূল সৃষ্টিরহস্য। একে কবিচিত্তের স্বপ্নাবেশ ব'লে মনে করলে ভুল হবে। স্বপ্নের মতো মনে হলেও এ স্বপ্ন নয়। কবি যে অর্ধস্ফুট চৈতন্যের আলোকে জীবন ও জগৎকে দেখছেন, বাইরে থেকে একে চৈতন্যের মূর্ছিত অবস্থা ব'লে মনে হলেও আসলে এইটিই হচ্ছে কবিচিত্তের ধ্যানতন্ময়তা। এই ধ্যানলীন স্তব্ধতাতেই তাঁর হৃদয়ে কবিতার জন্ম হয়, এ সময়ে তিনি চরাচরের মধ্যে যা-কিছু দেখেন সবই সেই ধ্যানদৃষ্টির সহযোগেই পাওয়া, এগুলি তাঁর বোধচৈতন্যের কাছে সম্যক প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর সত্তার এই গভীর 'বোধ' সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন :

আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে ;
স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়,

হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ;
তারে আমি পারি না এড়াতে,…

এই বোধ একবার হৃদয়ে জন্ম নিলে—

সহজ লোকের মতো কে চলিতে পারে।
.... তাদের মতন ভাষা কথা
কে বলিতে পারে আর ;…

এখন আর সহজ লোকের মতো কথা বলা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর ভাষাও যে এখন তাঁর ধ্যানাবিষ্ট অস্ফুট চৈতন্যেরই ভাষা, বিচিত্র মিশ্র-অনুভূতির সংকেতময় ভাষা।

এই 'বোধে'র কাছে জীবন ও জগৎ এক নূতন অর্থদ্যোতনা লাভ করে। জীবনানন্দের কবিতায় এই 'বোধে'র ক্রিয়াটি বড়োই বিস্ময়কর : বিচিত্র অনুভূতি ও চেতনার মিশ্রণে অতি সাধারণ পরিবেশও তাঁর চারদিকে এক নূতন কুহক রচনা করে এবং তাঁর হৃদয়ে এক গভীর সংবাদ বহন ক'রে আনে :

বহুদিন মাস ঋতু শেষ হলে পর
পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা
ক'য়ে গেছে ;

কিংবা

গোরুর গাড়িটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খল্‌খল্ অন্ধকার—
শান্তি তার রয়েছে সম্মুখে ;

কিংবা

মায়াবীর আরশীতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার,—ম্লান চুল,—চোখে তার হিজলবনের মতো কালো।

এ-ধরনের অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়। এই 'বোধে'র কাছে শুধুই যে বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে একটি গভীর ব্যঞ্জনা আসে তাই নয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়চেতনাতেও নিত্যনূতন ইঙ্গিত ধরা দিতে থাকে :

হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

কিংবা

যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে শরের ভিতর,

কিংবা

অতিদূর তরঙ্গের জানালায় নামি'
নাচিতেছে টারান্‌টেলা—রহস্যের ;

আবার অনেক সময় একটি রূপের পিছনে আরেকটি রূপের ইঙ্গিত ফুটে ওঠে :

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে
সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

কিংবা

দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার,

কিংবা

নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ;

জীবনানন্দের কবিতায় এমনি ক'রে বিচিত্র রূপকল্পনাকে আশ্রয় ক'রে কোমল আলোছায়ার নানারকম ভাঙাগড়া ও মেলামেশা চলতে থাকে। আবার অনেক সময় একই সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়চেতনার অপ্রত্যাশিত অথচ ব্যঞ্জনাময় মিশ্রণ ঘটে :

শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল,

কিংবা

চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু' বেলা
নির্জন মাছের চোখে,

কিংবা

এই কথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে

যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে কবি 'অতি অদ্ভুতভাবে' চেতনার মিশ্র-অনুভূতিগুলিকে রূপ দিয়েছেন। তাছাড়া—

একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো,

কিংবা

তার রঙ কুস্কুমের মতো নেই আর
হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো

কিংবা

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা,

উপমার এরকম আশ্চর্য দ্যোতনা জীবনানন্দের কবিতায় সর্বত্র অজস্র ছড়িয়ে আছে। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' কিংবা 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়'—এ-সব পঙ্‌ক্তির তুলনা কোথায় ? কবি তাঁর ভাবকল্পনায় কত বিচিত্র রূপভঙ্গিমা ও রূপসম্ভাবনাকেই না প্রত্যক্ষ করেছেন !

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবির রূপকল্পনাগুলির বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও কয়েকটি বিশেষ ভাবলক্ষণই প্রধানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে : এদের সৌন্দর্যে একটি ম্লান বিষণ্ণতা লেগে আছে, একটি ক্লান্তির ছায়া পড়েছে ও একটি বেদনার সুর বাজছে ; তাছাড়া এদের মধ্যে একটি ধূসর রহস্যময়তা ও একটি বাষ্পবিলীয়মানতার ভাব আছে। এর মূল কারণটি অবশ্য জীবনানন্দের প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পাই : বোধচৈতন্যের যে-আলোকবিন্দুটিকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মধ্যে কবিতার জন্ম হয়, তার ম্লান করুণ আভা কবির সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বভাবতই ছড়িয়ে পড়ে।

বস্তুত এইটিই জীবনানন্দের কবিতার প্রধান স্বরূপলক্ষণ। কবির উক্তি থেকে আমরা জানি, কবিতা রচনার কালে অখণ্ড-দেশ-কালের চেতনায় লগ্ন

থেকেই কবি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেন; তখন তাঁর কাছে চরাচরের বিভিন্ন বস্তুর ভেদরেখাগুলি স্বভাবতই অস্পষ্ট হয়ে আসে, তাছাড়া মহাসমগ্রের মধ্যে এদের সব রূপই আপেক্ষিক,—ক্ষণকালের আলোকে নিরূপিত আকারে প্রতিভাত হলেও নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতে এরা অনুক্ষণ রূপান্তরিত হচ্ছে; তাই কবির কাছে এদের বিচ্ছিন্ন সত্তা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়;—এই-জন্যেই তাঁর কবিতায় এত অজস্র মিশ্র-অনুভূতি ও মিশ্র-রূপের ব্যঞ্জনা এসেছে, আর এইজন্যেই তাঁর রূপকল্পনাগুলি আমাদের চেতনায় বাষ্পের মতো ভেসে বেড়ায়। এই অবস্থায় কবির নিজের মনোজগতেও একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে: কোনো বস্তুরই রূপ-প্রকৃতি স্থির থাকছে না ব'লে কবির কাছে তখন সব কিছুই অনিশ্চিত বোধ হয়। কবি নিজেও তা স্বীকার করেছেন, তিনি নিজেই লিখছেন, তাঁর হৃদয়ে সেই রহস্যময় 'বোধ' জন্ম নেবার পর—

> কে থামিতে পারে এই আলোয় আঁধারে
> সহজ লোকের মতো ;…কোনো নিশ্চয়তা
> কে জানিতে পারে আর?

কবির ইতিহাস-চেতনার মধ্যেও তাঁর এই 'বোধ'কে সক্রিয় দেখতে পাই: নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি খণ্ডকালকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতীত ও অনাগতের মাঝখানে বর্তমান কালকেও তিনি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন: বর্তমান কাল একদিকে যেমন বিগত অতীতের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত অন্যদিকে তেমনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত:

> অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জান না কি? অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে,—হারায়েছি আনন্দের গতি
> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?

যুগে যুগে ঈপ্সিতকে পাবার জন্য মানুষের 'ইচ্ছা চেষ্টা'র অন্ত নেই, কিন্তু মানুষ তাকে কোনো যুগেই পূর্ণভাবে পায় না:

> গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
> হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

তবু কাল এগিয়ে চলে,—'কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়'—মানুষও অতীতের বিচ্ছেদ বেদনা বুকে নিয়ে কালের সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে, এবং পূর্ণতাকে কোনো কালেই না পাওয়া গেলেও একটা আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে চেতনার দিক থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে:

> মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
> থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
> আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
> পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
> কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

জীবনানন্দকে তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে আমরা এমনি ক'রেই দেখতে পাই: বিরাট অখণ্ডের ধ্যানলীন স্তব্ধতার মধ্যে তিনি তাঁর বোধচৈতন্যের স্তিমিত আলোকে আপন উপলব্ধিতে তন্ময় হয়ে আছেন, তাঁর ভাবকল্পনার অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুগুলিতে কত বিচিত্র মিশ্র-অনুভূতির কম্পন সঞ্চারিত হচ্ছে, তাদের মৃদু সঞ্চালনে তাঁর কাব্যলোক থেকে রহস্যের স্বরমর্মর উঠেছে, এবং সব মিলিয়ে আমাদের কানে একটি বিষণ্ণ সুর ভেসে আসছে। বস্তুত কবির সমস্ত কবিতাতেই এই করুণ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে আছে; মহাসমগ্রের চেতনায় লগ্ন থেকে খণ্ডিত জীবন ও জগৎকে ভালোবাসার ফলেই এই বেদনা, কেননা এ অবস্থায় একটি বিশেষ মুহূর্তের অনুভূতিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, একান্ত ক'রে, আনন্দোজ্জ্বল ক'রে পাবার উপায় নেই, অথচ প্রতিমুহূর্তেই একটি প্রিয় মুহূর্তের মৃত্যু হচ্ছে, বর্তমানের আকাশ বহু মৃত মুহূর্তের কান্নায় ভ'রে উঠেছে, আবার প্রতিটি নূতন মুহূর্তের জন্মলগ্নেই তার মৃত্যুঘণ্টা বাজছে, প্রতিটি ফুল, প্রতিটি জীবন ফুটে উঠছে ঝ'রে পড়বার জন্যেই।

কবি জীবনকে ভালোবেসে কী নিবিড়ভাবেই না তাকে অনুভব করেছিলেন:

> শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
> আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস;

কিংবা

> আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
> সন্ধ্যায় কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে;

কিংবা

> বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
> গভীর আহ্লাদে ভরা, অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক
> আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

এ-সব পঙ্‌ক্তিতে জীবনের প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে সত্যই তার তুলনা নেই, অথচ এই জীবনকে কবি আনন্দোজ্জ্বল ক'রে, উৎসবময় ক'রে আস্বাদ করতে পারছেন না : প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করছেন জীবনের দেহে মৃত্যুর হিমস্পর্শ—

> দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।
> ....জানি না কি আহা,
> সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
> ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা
> নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

নিত্যকালের পরিপ্রেক্ষিতে খণ্ডকালের দুর্লভ অনুভূতিগুলিকেও এমনি ক'রে ক্ষণিক মায়া ব'লে মনে হয়, এরা 'যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে', অথচ কবির ধ্যান তো যোগীর শুষ্ক জ্ঞানতপস্যা নয়, তিনি কিছুতেই তাদের বিচ্ছেদ-বেদনা ভুলতে পারেন না। সমগ্রদৃষ্টিতে জীবনকে সব সময় মৃত্যুর পটভূমিতে দেখতে পেলেও এই মৃত্যুপীড়িত জীবনের জন্য কবির সহানুভূতির করুণ মীড়গুলি আর্ত হয়ে ওঠে। প্রবহমাণ কালচেতনা তাঁর এই বেদনাকে আরো ব্যাপক, আরো দুঃসহ ক'রে তোলে : অতীতের কত বিলুপ্ত যুগের নরনারীও এমনি ক'রে একদিন সূর্যের আলোকে চোখ মেলেছিল, জীবন-পিপাসা নিয়ে পরস্পরকে এমনি ক'রেই ভালোবেসেছিল ; আজ তারা মৃত, আজ তারা ধূসর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে ; কবির চিত্ত আজ বহু যুগ পরেও তাদের বেদনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে :

> মনে হয় কোনো বিলুপ্ত নগরীর কথা
> সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে

আজ কবির কাছে—

> ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
> অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,

কবি অনুভব করেন, একদিন সেই নির্জন প্রাসাদে ছিল—

> আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা
> আর তুমি নারী
> ....
> তোমার মুখের রূপ আমি কত শত শতাব্দী দেখি না
> খুঁজি না।

কবি জাতিস্মরের মতো তাঁর বহু বিগত জীবনের প্রিয়জনদের মুখ স্মরণ করেন :

> সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না ;
> পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি ;

কিংবা

> যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
> কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানায় কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
> কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন,—

বর্তমান কালের মধ্যেও অতীতের সত্তাসার মিশে আছে, অথচ তাকে পূর্বের প্রিয় পরিচয়ে জানবার উপায় নেই :

> তোমাকে দেখার মতো চোখ নেই—তবু,
> গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই—তুমি
> আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।
> কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ ;
> বহুদিন থেকে শান্তি নেই।

বর্তমান কালের প্রতি মুহূর্তে অতীতকেও বহন ক'রে চললে সান্ত্বনার আশা বৃথা : কবি-যে অখণ্ড দেশ-কালকেই তাঁর চিরজীবনের সঙ্গী ক'রে নিয়েছেন, —তিনি নিজেই বলছেন :

> হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে
> সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে

কবিতা
পৌষ ১৩৬১

> অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
> সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;

তাই আজকের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এই প্রাণচঞ্চল জগতের মাঝখানে—

> আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,

এবং আজকের দিনেও যার নিভৃত প্রিয়সঙ্গটি কবিকে 'দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল' সেও যে অতীতের সুখস্মৃতিকে, অতীতের বিচ্ছেদবেদনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় —সেও যে অর্ধেক অতীত :

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;

তাই তার মধ্যে কবি ক্ষণকালের জন্য একটি সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু দেখতে দেখতে চারদিকে সময়ের 'সফেন সমুদ্র' উদ্বেল হয়ে ওঠে, বর্তমান থেকে অতীত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কবির হৃদয় আবার আশ্রয় হারায়।

অখণ্ড-কালচেতনায় নিরন্তর ভাসমান কবিচিত্তের এই দীর্ঘশ্বাস জীবনানন্দের কাব্যকে এমন বিষাদ-করুণ ক'রে তুলেছে। কবির মনে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অবসাদ, নিরবচ্ছিন্ন কালধারার অনুক্রমে ক্রমপ্রকাশমান ও ক্রমবিলীয়মান জগতের সমগ্র অনুভূতিকে মনের মধ্যে অনুক্ষণ বহন করার এই ক্লান্তি ; এই ক্লান্তির ছায়া তাঁর সৃষ্টিলোককে ম্লান-ধূসর ক'রে রেখেছে ; এখানে অনন্ত গোধূলি। তাঁর কবিতায় জীবনের যে প্রতিমাকে প্রত্যক্ষ করি তার দেহেও এই ধূসরতা, —সে মৃত্যুদুহিতা—তার বুকে বিচ্ছেদের বেদনা, তার মুখে মৃত্যুর হাসি। জীবনানন্দের কাব্যলোকের গোধূলি-আকাশে এই হাসিটি চিরকালের জন্য লেগে রইল।

পত্রাংশ

অমিয় চক্রবর্তী

[বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত]

Boston University
Boston 15, Massachusetts
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৪

প্রিয়বরেষু,

কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত হয়েছি—এরকম নিদারুণ দুর্ঘটনার কোনো মানে পাওয়া যায় না। ওঁর কবিতায় একটি ভারি আশ্চর্য রহস্যময় সুর ছিল, মনে হ'তো জীবনের বিচ্ছিন্ন বহু ঘটনার মূলে পৌঁছিয়ে তিনি সমস্তটাকে বলবার ভাষা তৈরি করছেন। পড়তে পড়তে সেই একটি আকাশী, সর্ববিধসঞ্চারী, গাঢ় রঙে ভরা ভাষা আমরা তাঁর কবিতায় শুনতে পেয়েছি। আপাতবিরোধী উপমায়, সংলগ্নতায়, ধ্বনির লাবণ্যে এবং নিগূঢ় অনির্দিষ্টতায় কত ভাবে তিনি তাঁর বলবার ধ্বনি রেখে গেলেন। বাঙালির মনে বহুকাল ধ'রে সেই ধ্বনির মূর্তি জাগবে। ঘন জলের উপর দিয়ে ওড়া হাঁসের রেখা, কাঁচা ভিজে ধান, লোকজনের কথাবার্তা, এবং কল্পনার জটিল কারুজালে রচিত এই মূর্তি। অনেকখানি চোখে ঠাহর হয় না, এক আলোয় একরকম, অন্য বেলায় একেবারে ভিন্ন হয়ে একই কবিতার ব্যঞ্জনা ধরা দিতে থাকে। প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল বড়োই নতুন এবং নিজস্ব তাঁর লেখা : বাংলা কাব্যে কোথাও তার তুলনা পাই না। জর্মান কবি রিল্‌কের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও মনঃপ্রকৃতি এবং ধারণা ওঁদের স্বতন্ত্র। একবার ওঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, জীবনের কোনো সময়ে রিল্‌কের কাব্য ওঁকে স্পর্শ করেছিল কিনা,—বললেন, না, রিলকে ওঁর বিশেষ জানা নেই। জীবনানন্দের কাব্যে একটা নির্লিপ্ত গোছের খোলামেলা ভাব ছিল, জর্মান কবি চিন্তায় এবং চৈতন্যের ভারে অনেক সময় অত্যন্ত ডুবে যেতেন। যখনই জীবনানন্দের কোনো কবিতা পড়েছি মনে হয়েছে স্নিগ্ধ রোদ্দুরে আপ্লুত, স্মরণ-প্রান্তের কোন চেনা দিন ফিরে এসেছে, কোনোদিনই সেইদিনের মাধুর্য অবসান হবে না।

দুটি কবিতা

প্রতীক্ষা

আনন্দ বাগচী

"একদিন এমন সময়
আবার আসিয়ো তুমি,—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়!"—

আসেনি সে। ভাবলাম, এই যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকা
বিপ্রলব্ধ বেদনায়, অলি-গলি গল্পের শহর—
অশ্রুলভ্য ছবিঘর, মৃত্যুর মতন এরা ফাঁকা
মৃত্যুর মতন এরা ম্লানকান্তি, কান্নার প্রহর।

দোর ঠেলে দমকা হাওয়া, আসেনি সে, শহরের মন
কেউ ভেবে চমকালো, কেউ না, কিছু না, তবু যদি
আসতো সে, তারি জন্যে এই ঝরা পাতার শ্রাবণ
বেদনায় দেউলে হয়, ল্যান্সডাউন রোড হয় নদী।

মাঝরাতে মোম জেলে জাগা-পায়ে যে মানুষ পায়চারি করে
তার ছবি,
যার চোখে সারারাত্রি শিশিরের জল জমে মাঠের কান্নায়
তার ছবি,
পৃথিবীর অতি তুচ্ছ সামগ্রীতে লোভ যার গোপন বিস্ময়
তার ছবি।···
আজ বুঝি এত ছবি শেষ হলো, হাজার বছর ধ'রে কেউ
রাত্রির পৃথিবী দিয়ে হাঁটবে না, লবণাক্ত ঢেউ
আর কারো রক্তের সমুদ্রে জাগবে না,
আর কেউ জেগে-জেগে দূর-অধ্যায়ী গান করবে না।

আমার তো জানা নেই, কালের ভ্রূকুটি ভঙ্গ ক'রে
আর কোনো দুঃসাহসী আছে কিনা দুই চক্ষু ভ'রে
প্রাকৃতিক স্পর্ধা যার অফুরন্ত, অন্ধকার জলের মতন
স্নিগ্ধ যার মন।
যে পারে হেলায়
নেমে এসে যোগ দিতে আদিগন্ত মৃত্যুর খেলায়।

আসেনি সে। ভাবলাম পাতার মর্মরধ্বনি শুনে,
সে আসে না তবু কাঁপে ল্যান্সডাউন রোডের আকাশ,
সবুজ গেলাস ধরে ঘাস,
পৃথিবীরা ঘরে ফেরে, নীল খেত তারার আগুনে।

আরো শুভ্র রোদ

রণেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

[অন্তত দুটি মৃত্যু এই কবিতায় মিশেছে। আমার আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা সচেতন মনের অজ্ঞাতসারেই কখন কবি জীবনানন্দের বিয়োগ-বেদনার হাত ধ'রে এক হ'য়ে গেছে। ট্র্যামের আঘাতে বিদায় নিতে হ'লো কবিকে, আমার একটি ভাইও কোনো এক অঘ্রানের ভোরে লুপ্ত হ'য়ে গেলো ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে।]

বেদনা-নদীর পারে গিয়েছে এবার।
সেখানে তো সুপ্তি ছাড়া আর কিছু নেই,
শান্তির উৎসাহে সব মুছে গেছে ভার—
অথবা শুধুই জাগা—দীপ্ত সকলেই।

বিশুদ্ধ মাধুর্য হাতে, নেই অন্ধকার।
তবে কেন দুঃখ পাই তুমি নেই ভেবে:

কবিতা
পৌষ ১৩৬১

পোহাবে না অঘ্রানের রোদ কোনোদিন,
লরির গম্ভীর শব্দে উঠবে না কেঁপে।

প্ল্যাটফর্মে বন্ধু হাত ধরবে কি তোমার ?
ঘুম ভেঙে খুঁজবে কি বারুদের আলো ?
হয়তো সেখানে আরো শুভ্র রোদ আছে—
মৃত্যুর মাধুরী তুমি জানবে না আর।

কবিতাগুচ্ছ

জীবনানন্দ দাশ

১

কার্তিকের ভোরবেলা
চোখে মুখে চুলের ওপরে
যে শিশির ঝরল তা'
শালিক ঝরাল ব'লে ঝরে

আমলকী গাছ ছুঁয়ে তিনটি[১] শালিক
কার্তিকের রোদে আর জলে
নীলোখেরি নীল খেত   না নীল আকাশ ?[২]
সূর্য ?   না কি সূর্যের চপ্পলে[৩]

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে[৪]
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়[৫]
এ জীবনে আমি ঢের শালিক দেখেছি[৬]
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

২৯-৯-৫২

('শতভিষা'র সৌজন্যে)

---

১. তিনটে
২. আমার হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন
৩. ঢের ঢের দিন পরে কিচিরমিচির কোলাহলে
৪. চেনা মানুষীর ভাষা কানে ঢেলে ওরা
৫. আবার বিরলে উড়ে যায়
৬. এ জীবনে তারপর অহরহ শালিক দেখেছি

২

আমাকে সে নিয়েছিল ডেকে ;
বলেছিল : 'এ নদীর জল
তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল ;
সব ক্লান্তি বিহ্বলতা[1] থেকে
স্নিগ্ধ রাখছে পটভূমি
এই নদী তুমি।'

'এর নাম ধানসিড়ি বুঝি ?'
মাছরাঙাদের বল্লাম ;
গভীর মেয়েটি এসে দিয়েছিল নাম।
আজো আমি মেয়েটিকে খুঁজি ;
জলের অপার সিঁড়ি বেয়ে
কোথায় যে চ'লে গেছে মেয়ে।

সময়ের অবিরল শাদা আর কালো
বুনোনির ফাঁক[2] থেকে এসে
মাছ[3] আর মন আর মাছরাঙাদের ভালোবেসে
ঢের আগে নারী এক—তবু চোখ-ঝলসানো আলো
ভালোবেসে ষোলো আনা নাগরিক যদি
না হ'য়ে বরং হ'ত ধানসিড়ি নদী।

('দেশ'-এর সৌজন্যে)

১. রক্তের ২. বুক ৩. জল

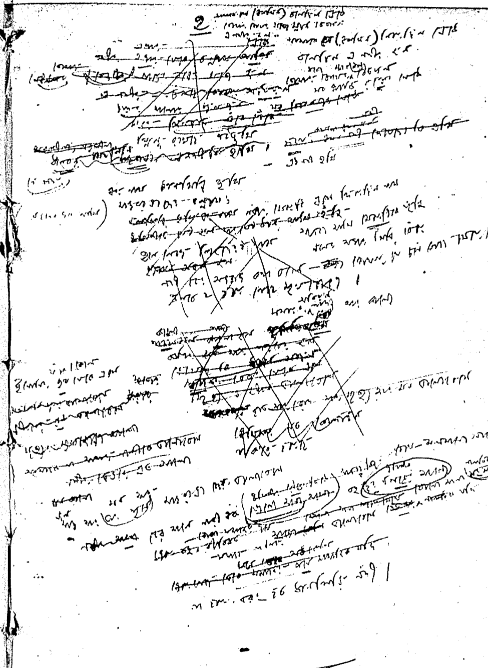

১৩২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতার প্রথম খসড়া

৩

এক অন্ধকার থেকে এসে
অন্য এক আঁধারের দিকে
মুখ ফেরাবার আগে—
কয়েক মুহূর্ত কথা কাজ চিন্তা রয়েছে এ জীবনের
দেখেছি সূর্যের আলো, নীয়ন বাতির বিচ্ছুরণ,
অন্ধকার অজন্মা প্রান্তর, মৃত অর্ধমৃত নগর বন্দর,
শোকাবহ আলো শব্দ শেল,
ক্লান্তিহীন ক্রেন এরিয়েল,
[নীলিমায় এরোপ্লেন হেলিকোপটারের[১]
এঞ্জিনের[২]
অনুরণনের
আর এক রকম সুর ;]

হেমন্তের মধ্যরাতে
দক্ষিণসাগরগামী হরিয়াল বুনো হাঁসদের
রাশি রাশি কালো বিদ্যুতের বিন্দু,
ডানার ঝাপসা গুঞ্জরণ
—দেখেছি জেনেছি অনেক দিন—
মানুষের সাথে
মিলন বা অমিলের কঠিন[৩] রহস্যসুতো নিয়ে
সময়ের অজ্ঞেয় সাগরতীরে গিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ের ক্ষয়
দেখেছি মানবদের[৪] ইতিহাসে[৫] বারবার হয়।

১. নীলিমায় এয়ার ইণ্ডিয়ার ২. প্রপেলার ৩. অন্তিম ৪. মানুষদের
৫. বিচরণে

মনে হয় যেন মানুষের মন তবু কোথাকার
তুই কালো বালুতীর ভেদ ক'রে ফেলে
চলেছে নদীর মত—
চারিদিকে জনতার সকাতর কোলাহল—
ঘর বাড়ি সাঁকো।
পাখির[১] ও মানুষের করুণ পায়ের[২] চিহ্ন
পায়ের[৩] কৃচ্ছ্রের চিহ্ন সব—
মুছে ফেলে বুঝি অনাদির শাদা কালো[৪]
নির্দোষ আলো আর অন্ধকার আবার সঞ্চয় ক'রে মন[৫]
জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে হ'তে চায় স্নিগ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের মতন।

৪

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
শাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে—দিনের বেলার শেষে।

এখন তোমায় দেখি না তবু আর
সাতটি সাগর তেরো নদীর পার
যেখানে আছে পাঁচটি মরুভূমি
তার ওপারে গেছ কি চ'লে তুমি
ঘাসের শান্তি শিশির ভালোবেসে।

---

১. গ্রন্থের। জন্তুর ২. প্রশ্নের ৩. চিত্তের
৪. মুছে ফেলে দিয়ে বুঝি আদি শাদাকালো
৫. নির্দোষ প্রথম সৃষ্টি আবার সঞ্চয় ক'রে মন

বটের পাতায় সে কার নাম লিখে
[গভীর ভাবে] ভালোবেসেছিলে সে নামটিকে
হরির নাম নয় সে আমি জানি
জল ভাসে আর সময় ভাসে—বটের পাতাখানি
আর সে নারী[১] কোথায় গেছে ভেসে।

৫

ঘড়ির দুইটি ছোটো কালো হাত ধীরে
আমাদের দুজনকে নিতে চায় যেই শব্দহীন মাটি ঘাসে
সাহস সংকল্প প্রেম আমাদের কোনোদিন সেদিকে যাবে না
তবুও পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চলে যায় কি গভীর সহজ অভ্যাসে।

৬

রক্ত নদীর তীরে[২] কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের একমুঠো আলো
সনাতন[৩] শূন্যের অন্বেষণে দিন অনুদিন
মানুষের যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো।
অনুভব করে সব মানুষ······
মৃত্তিকায় মূল রেখে—লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
সহজ[৪] গাছের স্থির প্রতিচ্ছবি হবে—
শ্যামল গাছের[৫] থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে
অথবা নশ্বর ধর্ম[৬] ভালোবেসে বসবে ছায়ায়?

---

১. মেয়ে ২. রক্তাক্ত নদীর রূঢ় কোলাহলে ৩. অতলান্ত
৪. শ্যামল ৫. বৃক্ষের ৬. প্রেম

চারিদিকে অন্ধ দ্রুত সাগরের[১] উজ্জ্বল[২] হাসি
অনন্ত প্রবহমাণ রক্ত[৩] আর জল
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারীহিমাচল
সে সব অসত্য নয় সত্য নয়—ফল নয় নৈষ্ফল্য নয়—
যতদিন রয়ে গেছে মানব ও মানবের[৪] মন
নিমিত্তের ভাগী হয়ে[৫] মানুষের[৬] রক্তাক্ত হৃদয়
হরিতের কাছে এসে শিখবে[৭] অক্ষয় গুঞ্জরণ।

৭

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন[৮] নেই
পৃথিবী[৯] অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের[১০] প্রতি
এখনো যাদের কাছে[১১] স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প[১২] অথবা সাধনা[১৩]
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

---

১. চারিদিকে দ্রুত (অন্ধ। ধ্বংস। মৃত্যু। হিংসা। কালো) সাগরের
২. ভয়াবহ। ঝকঝকে। ঝলসানো
৩. ধ্বংস ৪. মানুষ ও মানুষের মন ৫. হবে ৬. মানবের
৭. শুনবে ৮. অবলেশ ৯. সমাজ ১০. পৃথিবীর। জীবনের
১১. চোখে ১২. শান্তি ১৩. সংকল্প

৮

দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ
মাঝখানে আজ এই সময়ের ক্ষণিকের আলো
যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো।
ভুলে গেছি পটভূমি—ভুলে গেছি কে যে সেই নারী
আজকে হারিয়ে গেছে সব;
চারিদিকে গুঞ্জরিত হয়েছিল কি সব গভীর পল্লব
যখনই আমার আত্মা বৃক্ষ আর আগুনের মতো নভোচারী
হয়ে ওঠে—মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সংগীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাষা
হৃদয়ের আরো দূর জন্ম জন্মান্তরে মুখোমুখি ফিরে এসে অনাদি আলোর
ভালোবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নীচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
জাগিয়েছ তুমি অনাদির সূর্য নীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

[জীবনানন্দর এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রথমটি 'শতভিষা'য় ও দ্বিতীয়টি 'দেশ'-এ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিলো, সম্পাদকদের অনুমতিক্রমে আমরা এখানে পুনর্মুদ্রণ করলাম। অন্যগুলি, আমরা খোঁজ নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি,

এ-যাবৎ কবির হস্তাক্ষরেই আবদ্ধ ছিলো, আমরা তাঁর পাণ্ডুলিপি-খাতা থেকে উদ্ধার করেছি।

জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন ছাত্রব্যবহার্য পাৎলা এক্সেরসাইজ খাতায়, শক্ত পেনসিলে। তাঁর অভ্যেস ছিলো দুপুরবেলায় লেখা, এবং রচনাটি মনঃপূতভাবে শেষ হ'লে পরে, রাত্রে অন্য খাতায় কালিতে তার প্রতিলিপি তোলা। প্রতি কবিতার রচনার তারিখ সাধারণত উল্লেখ করতেন না, কিন্তু খাতার মলাটে মাস, বছরের উল্লেখ থাকতো। কবির অনুজ শ্রী অশোকানন্দ দাশের সৌজন্যে এই রকম দুটি মূল রচনার খাতা আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছি : একটির তারিখ নবেম্বর ১৯৫১-জানুয়ারি ১৯৫২, অন্যটি মে-জুন, ১৯৫৪। এই দ্বিতীয় খাতার পর আর-কোনো খাতা পাওয়া যায়নি, অতএব ধ'রে নিতে হচ্ছে যে এতেই জীবনানন্দ তাঁর সর্বশেষ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন বা আরম্ভ করেছিলেন। ৬, ৭ ও ৮ নং কবিতা এই খাতা থেকেই উদ্ধৃত; এই তিনটি, আমাদের বিবেচনায়, অন্তত আকৃতিগতভাবে শেষ হয়েছিলো। খাতার তারিখ, এবং খাতার পাতায় অবস্থানের পারম্পর্য থেকে অনুমান করা যদি নির্ভুল হয়, তাহ'লে ৮নং কবিতাটিই তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা।

জীবনানন্দ আক্ষরিক অর্থেও ধূসর পাণ্ডুলিপির রচয়িতা ছিলেন; তাঁর খাতায় পেনসিলের দাগ এত ম্লান এবং হস্তাক্ষর এত ছোটো ও অস্পষ্ট যে কবিতাগুলির পাঠোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়নি। তবু, কবিতা-রচনার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয়, এই কবির বাক্-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয়, তার উপর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধার ফলে যতটা সম্ভব, আমাদের প্রতিলিপি ততটাই সঠিক হয়েছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। শব্দ, শব্দযোজনা ও পংক্তির বিভিন্ন পাঠান্তর পাদটীকায় সর্বত্র উল্লেখ করা হ'লো, ব্যতিক্রম শুধু ৮নং কবিতাটি। এই কবিতাটির পাণ্ডুলিপি এত অস্পষ্ট ও সংশোধনবহুল যে আমাদের পক্ষে দুটিমাত্র উপায় ছিলো : হয় এটিকে সংকলন থেকে বাদ দেয়া, নয় পাণ্ডুলিপির নীহারিকা-মণ্ডল থেকে কবিতাটিকে গঠন ক'রে নেয়া। কবিতাটির আন্তরিক মূল্যের প্রতি সম্মানবশত দ্বিতীয় পন্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। নিজেদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে প্রত্যেকটি পংক্তিকে পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার ক'রে নিতে

হ'লো—অর্থাৎ, অনেক অস্পষ্ট ও দুষ্পাঠ্য পাঠান্তরের মধ্য থেকে বেছে নিতে হ'লো সেই শব্দগুলিকে, যার সমাবেশে পংক্তিটি ধ্বনির ও অর্থের দিক থেকে সবচেয়ে সংগত এবং কবির চরিত্রলক্ষণে সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। বলা বাহুল্য এতে এমন একটিও শব্দ নেই যা জীবনানন্দ ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি পাঠান্তর হিশেবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এমন অনেক শব্দ বর্জিত হয়েছে।

জীবনানন্দ ইদানীং 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' সমসাময়িক অনেক অপ্রকাশিত কবিতা নূতন ক'রে লিখছিলেন, গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তার কোনো-কোনোটি বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সর্বত্র হয়তো পুরোনো লেখা ব'লে উল্লেখ করেননি; তাঁর কাব্যশরীরে এদের সঠিক সংস্থান, তাই, গবেষণার বিষয় হ'য়ে থাকলো। এই গুচ্ছের মধ্যে ৪নং কবিতাটি এই রকম পুরোনো একটি রচনা, জীবনানন্দের হাতে বিরল স্বরবৃত্তের অন্যতম উদাহরণ। এই কবিতাটির একটি পাঠান্তর 'কল্পনা সাহিত্য' নামক শারদীয় সংকলনে (আশ্বিন ১৩৬১) প্রকাশিত হয়েছিলো; পাণ্ডুলিপি-খাতায় এই একই চিন্তা বা রূপকল্প অবলম্বন ক'রে পর-পর কয়েকটি কবিতার খশড়ার অস্তিত্ব আছে। কিন্তু খুবই সাম্প্রতিক বা সর্বাধুনিক রচনা ব'লে আমরা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারি মে-জুন ১৯৫৪-এর খাতা থেকে সংকলিত ৬, ৭ ও ৮নং কবিতা; এই তিনটি কবিতায় অপূর্বতার স্বাদ আছে, মনে হয় কবি যেন এখানে একটি নতুন পর্যায়ের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় এই ঘৃণা দারুণ বিদ্রূপ হ'য়ে উঠলো :

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—

আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে ; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না। অবশ্য, একই সঙ্গে, অনেক সময় আস্থার চূড়াও স্পর্শ ক'রে গেছেন তিনি—

শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারুগাছে
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে

তাঁর মৌল আস্তিকতা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ দেননি কখনোই। তবু মনে হয় কিছুকাল ধ'রে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি জড়িত ছিলেন : বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের সংগ্রাম, ঘৃণা, ক্লান্তি, যন্ত্রণার সঙ্গে প্রেমের। এই দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা কবির পক্ষে প্রয়োজনীয় ও উপকারী হ'য়ে ওঠে, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত তার উপর জয়ী হ'তে পারেন। এই শেষ তিনটি কবিতা তারই লক্ষণে সমৃদ্ধ। মনে হয় কবি সংগ্রামের পর শান্তি পেয়েছেন, আভাস পেয়েছেন আলোর, জীবনকে—মেনে নিয়ে নয়, বশীভূত ক'রে নতুন করে বাঁচার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাই মধ্য পর্যায়ের জটিলতা কেটে গিয়ে এখানে প্রাথমিক স্বচ্ছতা ফিরে এসেছে—আরো গভীর, সমৃদ্ধ এবং অর্থময় হ'য়ে ; ফিরে এসেছে নতুন, উজ্জ্বল রূপকল্পে নির্ভর ক'রে : ধানসিড়ি, জলসিড়ি, কুয়াশা, বুনো হাঁস প্রভৃতির বদলে এখানে দাঁড়িয়ে আছে 'মহাতরু', 'মৌন বৃক্ষ'—যে-বৃক্ষ সুস্থির, আস্থাবান, অবিচল, জীবনের ব্যাপ্তি, ঘনতা, অনশ্বরতার প্রতীক। এই বৃক্ষ আমাদের পূর্বপরিচিত—এ-ই সেই কিন্নরকণ্ঠী দেবদারু গাছ, কিন্তু এখানে তার অমৃতসূর্যের আলোক পংক্তিগুলির ফাঁকে-ফাঁকে অবিরল ক্ষরিত হচ্ছে। 'এক মুঠো আলো', 'ক্ষণিকের আলো', 'সাগরের উজ্জ্বল হাসি', 'হরিতের অক্ষয় গুঞ্জরণ', 'নীল—রৌদ্রনীল শ্যামল', 'হরিতের—নব হরিতের সংগীত', 'অনাদি আলোর ভালোবাসা'—এত অল্প পরিধির মধ্যে আলোর এত রকম উল্লেখ জীবনানন্দের কবিতায় ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বলা বাহুল্য, এটা 'সিন্ধু-সারস' বা 'নগ্ন নির্জন হাতে'র আলো নয়, লুপ্ত সৌন্দর্যের জন্য কোনো আক্ষেপ নেই এখানে, আছে নতুন সৃষ্টির প্রতি

আহ্বান। 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদে' যে-আলো ছিলো পটে আঁকা ছবিতে সংলগ্ন, এখানে তা মানুষের আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হ'য়ে হ'য়ে উঠছে

আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

আক্ষেপ একেবারে ভুলে যাননি এখনো, কিন্তু যাদের হৃদয় আধুনিক যুগে 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্যে' পরিণত হ'লো—

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা—

কবি যে তাদেরই একজন, এই নির্ভীক ও সুদৃঢ় উপলব্ধিতেই জীবনানন্দর শেষ উচ্চারণ ভাস্বর হ'য়ে থাকলো।—বু. ব.]

কবিতার কথা

(অংশ)

জীবনানন্দ দাশ

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধ'রে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

বলতে পারা যায় কি এই সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন, আসে পরমেশ্বরের নিকট থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহ'লে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেল্লাম। হয়তো সেই হীরের ছুরি পরীদেশের, কিম্বা হয়তো সৃষ্টির রক্ত চলাচলের মতই সত্য জিনিস। কিন্তু মানুষের জ্ঞানের এবং কাব্য সমালোচনা-নমুনার নতুন নতুন আবর্তনে বিশ্লেষকেরা এই আশ্চর্য্য গিঁটকে—আমি যতদূর ধারণা করতে পারছি—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খসাতে চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগতভাবে এ সম্বন্ধে আমি কি বিশ্বাস করি—কিম্বা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবার মত কোন সুস্থিরতা খুঁজে পেয়েছি কিনা এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না আমি আর। কিন্তু যাঁরা বলেন সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—পৃথিবীর কিম্বা স্বকীয় দেশের বিগত ও বর্ত্তমান কাব্যবেষ্টনীর ভিতর চমৎকাররূপে দীক্ষিত হ'য়ে নিয়ে কবিতা রচনা করতে হবে তাঁদের এ দাবীর সম্পূর্ণ মর্ম্ম আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারলাম না। কারণ আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ডবিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয় এবং ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা যে

সময় আমাদের হৃদয়কে ছেড়ে যায়, সে সব মুহূর্ত্তে কবিতার জন্ম হয় না, পদ্য রচিত হয়, যার ভিতরে সমাজশিক্ষা, লোকশিক্ষা, নানারকম চিন্তার ব্যায়াম ও মতবাদের প্রাচুর্য্যই পাঠকের চিত্তকে খোঁচা দেয় সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশী ক'রে, কিন্তু তবুও যাদের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী, পাঠকের মন কোনো আনন্দ পায় না, কিংবা নিম্নস্তরের তৃপ্তিবোধ করে শুধু, এবং বৃথাই কাব্যশরীরের আভা খুঁজে বেড়ায়।

আমি বলতে চাই না যে, কবিতা সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা খচিত অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য হবে না। তা হতে বাধা নেই। অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্যই তা হয়েছে। কিন্তু সে সমস্ত চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্-কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহ'লে কবিতা সৃষ্ট হয় না—পদ্য লিখিত হয় মাত্র—ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কিন্তু আমি আগেই বলেছি কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দ্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত ক'রে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতরে রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলাজলের মুষিকাঞ্জলির ভিতর শালিখের মত স্নান না ক'রে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মত;—সৌন্দর্য্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।

এ না হ'লে আমরা জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্য কেন পতঞ্জলির কাছে যাব না, ষড়দর্শনের কাছে যাব না, বেদান্তের কাছে যাব না, মাঘ ও ভারবির কাছে না গিয়ে? জীবনের ও সমাজের ও জাতির সমস্যার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট আলোক চাই—অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ, মহাত্মা গান্ধি, পণ্ডিত জওয়াহরলালের নিকট যাব না কেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকট না গিয়ে? দার্শনিক বার্গসঁ'র কাছে যাওয়া উচিত,

ইংলণ্ডের বা রুশিয়ার অর্থনীতি ও সমাজনীতিবিদ সুধী ও কর্ম্মীদের নিকট যাওয়া উচিত—ইয়েটসের কাব্যের নিকট এমন কি এলিয়ট ইত্যাদির কাব্য-প্রচেষ্টার নিকটেও নয়।

এখন আমি আর একটা কথা বলতে চাই খানিকটা অত্যুক্তি ক'রেই যেন, অথচ যা অত্যুক্তি নয়—আমার কাছে অন্তত সত্য ব'লে মনে হয়: কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্দ্ধনারীশ্বরের মত একাত্ম হ'য়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্য্যের মত নয়; তাদের সৌন্দর্য্যকে সার্থক ক'রে কিন্তু তবুও সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর গোপনভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মত যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মত রসগ্রাহীকে প্রথম ও প্রধানভাবে মুগ্ধ করে না—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা এ কথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সৌন্দর্য্যের মতই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোকশিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্ঘাটন, তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা ধর্ম্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়—যাকে বলা হ'লো কাব্য (বা শিল্প)—যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্ম্মের আস্বাদেও যা পাই না—এবং ধর্ম্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না; পৃথিবীর শতাব্দীস্রোতের ভিতর মানুষ যদি এমন একটা বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল (কিংবা হয়তো অমানব কেউ মানুষের জন্য সৃষ্টি করলো) —কি করে সেই বিচিত্রতার নিকট তার অনধিগত, অতিরিক্ত দাবী আমরা করতে পারি? কিংবা সেই সব দাবী কবিতা যদি মেটাচ্ছে বা মেটাতে পারে, ব'লে মনে করি তাহ'লে তার ন্যায্য ধর্ম্ম অভঙ্গুর নয় আর; তার বিশেষ স্থিতির কোনো প্রয়োজন নেই। সে যা দিতে পারে, ধর্ম্মও তা দিতে পারে; সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন কি কর্ম্মীরাও তা দিতে পারে। তাহ'লে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমি জানি

কাব্যের নিজের ইনটিগ্রিটির প্রয়োজন রয়েছে। * * * দর্শন বা সমাজসংস্কার বা মানুষের কর্ম্ম ও মননের জগতে অন্য কোনো বিকাশের ভিতর এই কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ঠিক এই ধরনের সারবত্তা নেই।

হতে পারে কবিতা জীবনের নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন; কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মত নয়; যা উদ্‌ঘাটিত হ'লো তা যে কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্য্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে। যদি তা না দেয় তাহ'লে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরোনো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা কবিতা হ'ল না; হ'ল কেবলমাত্র মনোবীজরাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন—পুরোনোর ভিতরে সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্য্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে তাহ'লে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেলো; আরো নানারকম মূল্য—যে সবের কথা আগে আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞান বীজের মত ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টিস্থূলতাকে উঁচু মঠের মত যেন একটা মৌন সূক্ষ্মশীর্ষ আমোদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হ'য়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ—ততই নক্ষত্রের নূতনতম কক্ষপরিবর্ত্তনের স্বীকৃতি-ও-আবেগের মত জ্বলতে থাকবে। * * *

আমি বলতে চাই না যে কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই। কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি ক'রে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়। কিন্তু সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুনর্গঠন

তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না : আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায় কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তাহ'লে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত নক্ষত্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে যা কাব্য ;—অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ : সম্বন্ধের ধূসরতা ও নূতনতা। সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথাও যেন ছিল ;—এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে আরো অনেকদিন পর্য্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্য্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে ; —এই সবের অপরূপ উদ্‌গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়,—নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ;—এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ ক'রে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ;—এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে।

কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় ;—কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত ক'রে পরিবেষণ—না, তাও নয় ; কবির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। 'কিঙ্‌ লিয়র' কিংবা 'বলাকা'র কবিতায়—এবং পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যেই কবির কল্পনা-প্রতিভার বিচ্ছুরণে, কিংবা তার সৃষ্ট কবিতার ভিতর সেরকম কোনো লক্ষ্যের প্রাধান্য নেই। কবিতাপাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ : যার পরিচয় দিয়েছি ইতিপূর্ব্বে। কিন্তু তবুও কবিতার সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ অন্তত দুই রকম। প্রথমত শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন ক'রে গড়তে চাচ্ছে ; এবং এই সৃজন

যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুষীম আনন্দের দিকে। এই ইঙ্গিত এত মেঘধবলিম, গভীর ও বিরাট, অথচ এত সূক্ষ্ম যে ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতা তাকে উপেক্ষা করলেও (সব সময় উপেক্ষা করে না যদিও) এই ইঙ্গিতের প্রভাবে তারা অতীতে উপকৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক-ভাবে উদ্ধার লাভ করতে পারে। এই জন্যই সমস্ত অতীত ও বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশী অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশী উপকার। কিন্তু খ্রীস্টান পাদরিরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠকাব্য সেরকমভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়। * * *

আসল প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার ; কিন্তু সেই পরি-বর্ত্তন আনবে কে ? সেই পরিবর্ত্তন হবে কি কোনোদিন ?—যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মত জনসাধারণ থাকবে না আর ? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে ? ভাবতে গেলেও হাসি পায়। কিন্তু তামাসার জিনিস নয় হয়তো। যখন দেখি শুধু তৃতীয় শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ও চিত্রশিল্পীই শুধু নয়, এদিককার উচ্চতর শিল্পীরাও দিকে দিকে স্বীকৃত হচ্ছে তখন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় প্রথম শ্রেণীর কবি নির্ব্বাসিত হয়ে রয়েছে কেন ? কিন্তু যখন দেখি তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তী-জননীর মত যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভরে ফেলছে তখন মনে হয় যে কোনো সূক্ষ্মতা, পুরোনো মেদ ও ইন্দ্র-লুপ্তির বিরুদ্ধে যা, পুরোনো প্রদীপকে যে অদৃশ্য হাত নতুন সংস্থানের ভিতর নিয়ে গিয়ে প্রদীপকেই যেন পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলে, তার এই সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয় —অনেকের জন্য নয়।

কিন্তু তবুও সকলের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হবে কি ? কবে ? কে আনবে ? কবিকে কি শিক্ষার অধিনায়ক সাজতে হবে ? সৌন্দর্য্যপ্রবাহে স্পন্দিত করে

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে হবে? প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করতে হবে? ডিক্টেটর সাজতে হবে জীবনের সঙ্গতি ও সুষমার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে? যদি কোনো শেষ বৈকালিক ইন্দ্রজালে আজকের এই সভ্যতার মোড় ঘুরে যায় তাহ'লে কবিকে কিছুই করতে হবে না আর; তার নিজের-প্রতিভার নিকট তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে শুধু কতিপয়ের হাতে তার কবিতার দান অর্পণ করে; যে কতিপয় হয়তো ক্রমে ক্রমে বেড়েও যেতে পারে—মানুষের হৃদয় তার পুরোনো আপোষ অপলেপের ভিতর আর থাকতে পারছে না বলে। * * *

কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাতসলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্মীদের সহানুভূতি যার জন্য একটুও নেই তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতরে চলে যাবেন—শহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতরে ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনা-মনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন ক'রে সৃষ্টি করবার জন্য সেই চেষ্টা করবেন;—আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে ক্'রে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর;—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকটে যেন, নির্জ্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির নিকট।

তার প্রতিভার নিকট কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে,—হয়তো কোনো এক-দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তার কবিতাবৃত্ত প্রয়োজন হবে সমস্ত চরাচরের সমস্ত জীবের হৃদয়ে মৃত্যুহীন স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেতে বুননের জন্য।

('কবিতা', বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৫)

জীবনী-পঞ্জী

জন্ম : ১৮৯৯ (৬ ফাল্গুন, ১৩০৫)

শিক্ষা : বরিশাল ব্রজমোহন স্কুল, ব্রজমোহন কলেজ। বি. এ., ইংরেজি অনার্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা, ১৯১৯; এম. এ., ইংরেজি সাহিত্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২১

কর্ম : অধ্যাপনা, কলকাতা সিটি কলেজ (১৯২২-২৮), রামযশ কলেজ, দিল্লি (১৯৩০-৩১), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-১৯৪৮); কলকাতায় 'স্বরাজ' দৈনিকপত্রের সাহিত্যবিভাগের সম্পাদনা (ব্রজমোহন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে) ১৯৪৭; অধ্যাপনা, খড়গপুর কলেজ, ১৯৫১-৫২, বরিষা কলেজ, ১৯৫৩, হাওড়া গার্লস কলেজ, ১৯৫৩-৫৪

বিবাহ : ১৯৩০ : শ্রীমতী লাবণ্য গুপ্ত (কন্যা : শ্রী মঞ্জুশ্রী দাশ; পুত্র : শ্রী সমরানন্দ দাশ)

গ্রন্থ : ঝরা পালক, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, ১৯২৮; ধূসর পাণ্ডুলিপি, ডি. এম. লাইব্রেরি, ১৯৩৬; বনলতা সেন, কবিতাভবন, ১৯৪২; মহাপৃথিবী, পূর্বাশা লিমিটেড, ১৯৪৪; সাতটি তারার তিমির, গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত, ১৯৪৮; বনলতা সেন, সিগনেট প্রেস, ১৯৫২; শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ১৯৫৪; নিখিল-বঙ্গ-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক 'বনলতা সেন' (সিগনেট প্রেস সংস্করণ)-কে পুরস্কার-প্রদান : ১৯৫৩; কলকাতা সেনেট হল কবি-সম্মেলনে স্বরচিত কবিতা-পাঠ : ১৯৫৪

কলকাতায় ট্র্যাম দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্তি : ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪; মৃত্যু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, কলকাতা : ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪

[কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রির গভীরতায়, তাছাড়া বিকেলের দিকে, নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিল। শহরের পাকচক্রের মানুষী ভিড়, হৈ-হট্টগোলে বিলি কেটে, হাঁটুর নিচে ধুতিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধ'রে,

আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে চ'লে যেতেন। খুব কম লোকে চিনতে পারতো ইনিই জীবনানন্দ দাশ। দেখা হ'লে একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন, বা অন্যমনস্ক কথা বলতেন দুচার মিনিট, রাসবিহারী এভিনিউ-ল্যান্সডাউনের মোড়ে দাঁড়িয়ে।

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। আমরা কেউ সেদিন মোড়ের কাছাকাছি ছিলুম না। পরদিন একটি কি দুটি বাংলা খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হোলো, অনেকেরই চোখে পড়েনি। কোনো কোনো সংবাদপত্রে আরো পরে। কোথাও বা একেবারেই না।

মোড়ের কাছাকাছি রাস্তা পেরিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছিলেন, বুঝতে পারেননি পশ্চিম থেকে ট্র্যামটা অমন দ্রুত বেগে ছুটে এসে ধাক্কা দেবে। রাস্তার লোকজনেরাই ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পৌঁছে দেন। এবং বাড়ির দরজা থেকে একশো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটলেও তাঁর বাড়িতে এ-খবর পৌঁছয় তার অনেক পরে, হাসপাতাল থেকে। বুকের অনেকগুলো পাঁজর, কণ্ঠার হাড়, এবং কোমরের নিচে একখানা পা চূর্ণ হয়েছিল।

সবই করা হয়েছিল, চিকিৎসাবিদ্যার আয়ত্তে যা করা যেতো। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর আহত ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, যেটা আরোগ্য না-করা পর্যন্ত চূর্ণ অস্থি পুনরায় সংস্থাপন করা সম্ভব ছিল না। এই নিউমোনিয়া শেষ পর্যন্ত আরোগ্য করা যায়নি।

তাঁর যাঁরা সমসাময়িক কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতার যাঁরা তরুণ লেখক, এবং তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ডাক্তারি-পড়া তরুণ ছাত্ররা সারারাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন। সারাদিনই দেখা যেতো ব্যাকুল চোখমুখ ছোটোখাটো একটি দল হাসপাতালের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

২২ অক্টোবর রাত সাড়ে এগারোটায় মৃত্যু হোলো। পরদিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে

গেলাম আমরা। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীর দল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জানতে চাইলেন একজন—'কে গেলেন?' পেরিয়ে যেতে-যেতে শুনলাম—'জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ।' 'কী করতেন?' 'কবি ছিলেন।' বলতে-বলতে তাঁরা লাফিয়ে আপিসের বাসে উঠে পড়লেন।

নরেশ গুহ]

গ্রন্থপঞ্জী

(* চিহ্নিত গ্রন্থ বর্তমানে ছাপা নেই)

* **ঝরা পালক**। ১৩৩৪। প্রকাশক 'শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।' এক টাকা। ক্রাউন ৮ পেজি, ১০+৯৩। কাগজে বাঁধাই। কবিতার সংখ্যা ৩৫। উৎসর্গ: '—কল্যাণীয়াসু—'। লেখকের ভূমিকা: 'ঝরা পালকের কতকগুলি কবিতা প্রবাসী, বঙ্গবাণী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, বিজলী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকীগুলি নূতন। শ্রীজীবনানন্দ দাশ। কলিকাতা, ১০ই আশ্বিন, ১৩৩৪।'

* **ধূসর পাণ্ডুলিপি**। অগ্রহায়ণ ১৩৪৩; ডিসেম্বর ১৯৩৬। 'প্রকাশক: জীবনানন্দ দাশ'। নামপত্রে ডি. এম. লাইব্রেরির নাম, ঠিকানা মুদ্রিত আছে। দুই টাকা। রয়্যাল ৮ পেজি, ১০+১০১। কবিতার সংখ্যা ১৭। উৎসর্গ: 'বুদ্ধদেব বসুকে'। কাপড়ে বাঁধাই, জ্যাকেট সংবলিত। প্রচ্ছদশিল্পী: অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। লেখকের ভূমিকার অংশ: 'আজ ন'বছর পরে আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হ'ল। এর নাম "ধূসর পাণ্ডুলিপি" এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। * * * আজ যেসব মাসিকপত্রিকা আর নেই—প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল—এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন। সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে —যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়—তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হ'য়ে বেঁচে রইল। আশ্বিন ১৩৪৩। জীবনানন্দ দাশ'।

* **বনলতা সেন**। পৌষ ১৩৪৯, ডিসেম্বর ১৯৪২। কবিতাভবনের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশক: জীবনানন্দ দাশ। চার আনা। ডিমাই ৮ পেজি, ১৬। কবিতার সংখ্যা ১২। কাগজের মলাট। প্রচ্ছদশিল্পী: শম্ভু সাহা।

* **মহাপৃথিবী**। ১৩৫১। 'পূর্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু,

কলিকাতা হইতে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত'। দেড় টাকা। রয়্যাল ৮ পেজি, ৮+৪০। কবিতার সংখ্যা ৩৫। ('বনলতা সেনে'র ১২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত।) উৎসর্গ: 'প্রেমেন্দ্র মিত্র সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রিয়বরেষু'। বোর্ড, জ্যাকেট সংবলিত। লেখকের ভূমিকা: '"মহাপৃথিবী"র কবিতাগুলো ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮এর ভিতর রচিত হয়েছিল; বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছে ১৩৪২ থেকে ১৩৫০এ। বনলতা সেন ও অন্য কয়েকটি কবিতা বার হয়েছিল 'বনলতা সেন' বইটিতে। বাকী সব কবিতা আজ প্রথম বইয়ের ভিতর স্থান পেল। ১৩৫১ শ্রাবণ, জীবনানন্দ দাশ'।

সাতটি তারার তিমির। অগ্রহায়ণ ১৩৫৫। রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৫০। 'প্রকাশক: আতাওয়ার রহমান'। নামপত্র: 'গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত কলিকাতা'। আড়াই টাকা। ডিমাই ৮ পেজি, ৬+৮০। বোর্ড; প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়। কবিতার সংখ্যা ৪০। উৎসর্গ: 'হুমায়ুন কবির বন্ধুবরেষু'।

বনলতা সেন। শ্রাবণ ১৩৫৯। রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬। দুই টাকা। 'প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত সিগনেট প্রেস ১০।২ এলগিন রোড কলকাতা ২০'। ডিমাই ৮ পেজি, ৪৯। বোর্ড; প্রচ্ছদপট: সত্যজিৎ রায়। কবিতার সংখ্যা ৩০। (কবিতাভবন 'বনলতা সেনে'র ১২টি এবং 'মহাপৃথিবী'তে প্রথম গ্রন্থিত ২টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত।)

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। বৈশাখ ১৩৬১, মে ১৯৫৪। পাঁচ টাকা। 'প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩'। রয়্যাল ৮ পেজি, ১৩৬। বোর্ড; 'প্রচ্ছদচিত্র শ্রীইন্দ্র দুগার কর্তৃক অঙ্কিত'। কবিতার সংখ্যা ৭২ (ঝরা পালক, ৩; ধূসর পাণ্ডুলিপি, ১০; বনলতা সেন, ৯; মহাপৃথিবী, ১৩; সাতটি তারার তিমির, ১৯; ইতিপূর্বে গ্রন্থে অপ্রকাশিত, '১৪; ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত, ৪)। লেখকের ভূমিকার অংশ: 'এই সংকলনের কবিতাগুলো শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় আমার পাঁচখানা কবিতার বই ও অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনা থেকে সঞ্চয় করেছেন, তাঁর নির্বাচনে বিশেষ শুদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। বিন্যাস-সাধনে মোটামুটিভাবে রচনার কালক্রম অনুসরণ করা হয়েছে। কলকাতা, ২০. ৪. ১৯৫৪, জীবনানন্দ দাশ'।

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

'কবিতা'য় প্রকাশিত জীবনানন্দর কবিতার তালিকা

(* চিহ্নিত কবিতা কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূত হয়নি)

বর্ষ ১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪২	মৃত্যুর আগে (আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে)	প্রথম গ্রন্থন : ধূসর পাণ্ডুলিপি
সংখ্যা ২, পৌষ ,,	বনলতা সেন (হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি)	বনলতা সেন : কবিতাভবন
,,	কুড়ি বছর পরে (আবার বছর কুড়ি পরে একদিন তার সাথে)	ব. সে : (ক. ভ.)
,,	* মৃত মাংস (ডানা ভেঙে ঘুরে ঘুরে পড়ে' গেল ঘাসের উপরে)	
,,	ঘাস (কচি নেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়)	ব. সে : (ক. ভ.)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	হাওয়ার রাত (গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল)	,,
,,	আমি যদি হতাম (আমি যদি হতাম বনহংস)	,,
,,	হায়, চিল (হায় চিল, সোনালি ডানার চিল)	,,
সংখ্যা ৪, আষাঢ়	শঙ্খমালা (কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে)	,,
,,	বুনো হাঁস (পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায়)	,,

বর্ষ ২

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৩	নগ্ন নির্জন হাত (আবার আকাশে অন্ধকার)	ব. সে : (ক. ভ.)
,,	শিকার (ভোর—আকাশের রং)	,,
,,	'বলিল অশ্বত্থ সেই' (বলিল অশ্বত্থ ধীরে : কোনদিকে যাবে)	মহাপৃথিবী
,,	* নদী (বঁইচির ঝোপ শুধু—শাইবাবলার ঝাড়)	
,,	হাজার বছর শুধু খেলা করে (হাজার বছর শুধু)	ব. সে : সিগনেট প্রেস
সংখ্যা ২, পৌষ ,,	সিন্ধুসারস (দুই এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে)	মহাপৃথিবী
,,	রাত্রিমাখা ঘাসে (একবার নক্ষত্রের দিকে চাই)	মহাপৃথিবী : পরিবর্তিত নাম 'নিরালোক'
,,	স্বপ্ন (পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি)	,,
,,	হরিণেরা (স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে)	ব. সে : (ক. ভ.)

কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	শ্রাবণরাত (শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে)	মহাপৃথিবী
,,	বিড়াল (সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে) ব. সে :	(ক. ভ.)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৪৪	আদিম দেবতারা (আগুন বাতাস জল :)	মহাপৃথিবী
,,	মুহূর্ত (আকাশে জ্যোৎস্না,—বনের পথে)	,,

বর্ষ ৩

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৪	ও হৈমন্তিকা ! (হৈমন্তিকী, অইখানে যেওনাক তুমি) সাতটি তারার তিমির : পরিবর্তিত নাম 'আকাশলীনা' (সুরঞ্জনা, অইখানে যেওনাক' তুমি)	
,,	ফিরে এসো (ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে)	ম. পৃ.
,,	ইহাদেরি কানে (একবার নক্ষত্রের পানে চেয়ে)	,,
,,	সমারূঢ় (বরং নিজেই তুমি লেখনাক')	সা. তা. তি.
সংখ্যা ২, পৌষ ,,	শীত রাত (এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে)	ম. পৃ.
,,	* হঠাৎ-মৃত (অজস্র বুনো হাঁস পাখা মেলে)	
,,	স্বপ্নের ধ্বনিরা (স্বপ্নেরা ধ্বনিরা এসে বলে যায়) ব. সে :	(সি. প্রে.)
,,	স্থবির যৌবন (তারপর একদিন উজ্জ্বল মৃত্যুর দূত এসে)	ম. পৃ.
,,	কমলালেবু (একবার যখন দেহের থেকে বের হ'য়ে যাব)	ব. সে : (সি. প্রে.)
সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	আট বছর আগের একদিন (শোনা গেল লাশকাটা ঘরে)	ম. পৃ.

বর্ষ ৪

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৫	আজকের এক মুহূর্ত (হে মৃত্যু, তুমি আমাকে)	ম. পৃ.
সংখ্যা ২, পৌষ ,,	রিস্টওয়াচ (কামানের ক্রোড়ে চূর্ণ হয়ে)	সা. তা. তি.
,,	* তার স্থির প্রেমিকের নিকট—কোনো উদ্দীপিতা (বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,—আমি বলিনি তা)	
,,	প্রার্থনা (আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও)	ম. পৃ.
সংখ্যা ৩, চৈত্র ,,	* অগ্নি (আত্মপ্রত্যয়ের অগ্নি, হে সন্তান প্রথম জ্বলুক তব ঘরে)	
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৪৬	* উদয়াস্ত (সূর্যের উদয় সহসা সমস্ত নদী)	
,,	শহর (হৃদয়, অনেক বড় বড় শহর দেখেছ তুমি)	ম. পৃ.
,,	শব (যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে)	ম. পৃ.

বর্ষ ৫

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৬	* সুমেরীয় (ক্রমে ধুলো উড়ে যায়)	

কবিতা

পৌষ ১৩৬১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৩ * মৃত্যু (হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে)
,, * আমিষাশী তরবার (স্মৃতিই মৃত্যুর মতো ;—ডাকিতেছে প্রতিধ্বনি)
সংখ্যা ২, কার্তিক * হেমন্ত (আজ রাতে মনে হয়)
* নিঃসরণ (দুর্গের গৌরবে ব'সে প্রাংশু আত্মা ভাবিতেছে)
সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৪৬ * বিস্ময় (কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে)
সংখ্যা ৪, চৈত্র ,, * সন্ধিহীন, স্বাক্ষরবিহীন (কোথায় সূর্যের যেন নব নব জন্ম ঘিরে)
,, * শান্তি (জীবন কি নীরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর)
,, * হে হৃদয় (হে হৃদয়, একদিন ছিলে তুমি নদী)
সংখ্যা ৫, আষাঢ় ১৩৪৭ মনোবীজ (জামিরের ঘন বন অইখানে রচেছিল কারা ?) ম. পৃ.

বর্ষ ৬

সংখ্যা ১, আশ্বিন ,, * ১৩৩৩-৩৮ স্মরণে (অনেক চিন্তার সূত্র সমবায়ে)
পৌষ ,, রাত্রি (হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী) সা. তা. তি.

বর্ষ ৭

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৪৮ * ঘাস (মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল)
,, ,, * সমিতিতে (ঐখানে বিকেলের সমিতিতে অগণন লোক)
সংখ্যা ৩, পৌষ ,, * কোরাস (গম্ভীর নিপট মূর্তি সমুদ্রের পারে)
সংখ্যা ৫, আষাঢ় ১৩৪৯ স্বভাব (যদিও আমার চোখে ঢের নদী) সা. তা. তি.

বর্ষ ৮

সংখ্যা ২, কার্তিক ,, বিভিন্ন কোরাস (পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে) সা. তা. তি.
সংখ্যা ৩, পৌষ ,, * দোয়েল (একটি নীরব লোক মাঠের উপর দিয়ে)

বর্ষ ৯

সংখ্যা ৩, পৌষ ১৩৫০ তিমিরহননের গান (কোনো হ্রদে কোথাও নদীর ঢেউয়ে) সা. তা. তি.

বর্ষ ১১

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫২ মকরসংক্রান্তির রাতে (কে পাখি সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে)
সা. তা. তি.

বর্ষ ১৪

সংখ্যা ৩, চৈত্র ১৩৫৫ * সারাৎসার (এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর)

কবিতা

বর্ষ ১৯, সংখ্যা ২

বর্ষ ১৫

সংখ্যা ২, চৈত্র ১৩৫৬ অন্ধকার (গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল)
ব. সে : (সি. প্রে.)
সংখ্যা ৩, বৈশাখ ১৩৫৭ দু'জন (আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন) ব. সে : (সি. প্রে.)

বর্ষ ১৬

সংখ্যা ৩, আষাঢ় ১৩৫৮ সুদর্শনা (একদিন ম্লান হেসে আমি) ব. সে : (সি. প্রে.)
" শিরীষের ডালপালা (শিরীষের ডালপালা লেগে আছে) "
" তুমি (নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে) "
সংখ্যা ৪, আশ্বিন " * আমাকে একটি কথা দাও (আমাকে একটি কথা দাও)
" ধান কাটা হ'য়ে গেছে (ধান কাটা হ'য়ে গেছে কবে যেন)
ব. সে : (সি. প্রে.)
" অঘ্রাণপ্রান্তরে (জানি আমি তোমার দুচোখ আজ) "

বর্ষ ১৭

সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৩৫৯ আছে (এখন চৈত্রের দিন নিভে আসে) শ্রেষ্ঠ কবিতা
সংখ্যা ৩, চৈত্র " * যাত্রী (মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ)
" * হৃদয়, তুমি (হৃদয়, তুমি সেই নারীকে ভালোবাসো)
সংখ্যা ৪, আষাঢ় ১৩৬০ Disposition (অনুবাদ : শ্রীমতী লীলা রায়) (মুল কবিতা : স্বভাব।
সা. তা. তি.)
Darkness (মুল কবিতা : অন্ধকার। অনুবাদ : জীবনানন্দ দাশ)
ব. সে. (সি. প্রে.)

বর্ষ ১৮

সংখ্যা ২, পৌষ ১৩৬০ * একটি নক্ষত্র আসে (একটি নক্ষত্র আসে ;)

'বৈশাখী'তে প্রকাশিত কবিতার তালিকা

বর্ষ ১, ১৩৪৮ অবশেষে (এখানে প্রশান্ত [illegible]নে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ) ব. সে. : (সি. প্রে.)
বর্ষ ২, ১৩৫০ জুহু (সাণ্টা ক্রুজ থেকে নেমে অপরাহ্নে) সা. তা. তি.
বর্ষ ৩, ১৩৫১ নাবিকী (হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে) সা. তা. তি.
* সমুদ্র পায়রা (কেমন ছড়ানো লম্বা ডানাগুলো সারাদিন)
বর্ষ ৪ ১৩৫২ দীপ্তি (তোমার নিকট থেকে যতদূর দেশে) সা. তা. তি.

গদ্য প্রবন্ধের তালিকা

বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা	কবিতা	বর্ষ ৩	সংখ্যা ২	পৌষ ১৩৪৪
কবিতার কথা	"	"	বিশেষ সংখ্যা	বৈশাখ ১৩৪৫
নজরুলের কবিতা	"	নজরুল-সংখ্যা, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২,		কার্তিক-পৌষ ১৩৫১
কবিতা, তার আলোচনা	পূর্বাশা	বর্ষ ১২	সংখ্যা ১	বৈশাখ ১৩৫৬
কবিতা পাঠ	"	"	" ৩	আষাঢ় "
দেশকাল ও কবিতা	"	"	" ৬	আশ্বিন "
সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা	"	"	" ১০	মাঘ "
রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা	"	"	" ১২	চৈত্র "
যুক্তিজিজ্ঞাসা ও বাঙালী	"	বর্ষ ১৫	সংখ্যা ১	বৈশাখ ১৩৫৯
আমার মা ও বাবা	উত্তরসূরী	জীবনানন্দ-সংখ্যা		(পৌষ ১৩৬১ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

[অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত জীবনানন্দর কবিতার তালিকা (নাম ও প্রথম পংক্তি) সম্পাদক বা কোনো অনুরাগী পাঠক সংকলন ক'রে পাঠালে আমরা পরবর্তী সংখ্যায় সানন্দে তা প্রকাশ করবো। জীবনানন্দর অন্য কোনো প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের আমরা সন্ধান পাইনি, যদি অন্য কারো জানা থাকে তাহ'লে প্রবন্ধের ও পত্রিকার নাম এবং প্রকাশের তারিখ উল্লেখ ক'রে আমাদের জানালে আমরা বাধিত হই।

এই সুযোগে জীবনানন্দর এ-যাবৎ গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে অপ্রকাশিত কবিতার, ও কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর গ্রন্থনের বিষয়ে প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। —সম্পাদক]

জীবনানন্দ দাশের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

প্রকৃতির কবি : বুদ্ধদেব বসু কবিতা বর্ষ ২ সংখ্যা ৩ ('ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনা)
বনলতা সেন : " " " ৮ " ৪ ('এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার 'বনলতা সেন'-এর সমালোচনা) এই দুটি প্রবন্ধ পরিমার্জিত আকারে 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য — 'তিনজন আধুনিক কবি' (১৩৫১, পূর্বাশা লিঃ)
বাংলা কবিতার নূতন দিক : " — পূর্বাশা বর্ষ ১১ সংখ্যা ৬ আশ্বিন ১৩৫৫
কবি জীবনানন্দ : অজিত দত্ত — আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১ অক্টোবর ১৯৫৪
জীবনানন্দ দাশ : অশোকানন্দ দাশ — উত্তরসূরী জীবনানন্দ-সংখ্যা, পৌষ ১৩৬১

৬১ থেকে ১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ পূর্বাশা লিমিটেড-এ ও ১১৬ থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্তৃক ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিমিটেড-এ মুদ্রিত

৺কবিতা
চৈত্র ১৩৬১
উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮১

বোহিনিয়া

বিষ্ণু দে

কোথায় গিয়েছে সেই দিন! তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে।
অন্য যে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী ;
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে ?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজন আজও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, জানলার পাশে বোহিনিয়া,
সে গাছে দুজন লোক এক অবকাশ
জোড়ে জোড়ে গেঁথেছিল।
আজ একজন
সে গাছে খোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া
সিঁড়ির দুধারে টবে রাখে তার মালী।

অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজন,
বেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া ॥

প্রাচীন পৃথিবী আজো

শান্তিকুমার ঘোষ

তারপর উঠলো সে সবুজ ফেনিল সেই সমুদ্রের থেকে :
অজস্র লতানে চুল কেঁপে-কেঁপে শঙ্খ-মাজা কটিদেশ ঢেকে
যেন প্রান্তলীন : হাতির দাঁতের থেকে কুঁদে তোলা মুখ
ঈষৎ নামানো : নিটোল মুক্তোর মতো এঁকেছে চিবুক
স্বেদবিন্দু জ'মে : বুকের বর্তুল ওঠে সুমেরু সমান :
নখর-মুকুরে আঁকা কত মৃত্যু ধ্বংস ঝড় যুদ্ধ অভিযান···
দুহাতে আগুন ঢেলে সিংহল চিতোর ট্রয় দূর ধূম্রলেখা
কয়েক মুহূর্ত ধ'রে দিগন্ত ধাঁধালো শেষ গামারশ্মিরেখা।

প্রাচীন পৃথিবী আজো : জ্বলন্ত বাসনা তবু মানুষের প্রেমে
প্রাণকল্যাণের ব্রতে—রোগীর শিয়রে এলো শুশ্রূষায় নেমে।
সবুজ শহর আজ ঝলকিত গ্রাম তার কোটি জনতায়
চলন্ত সংসার এক সূর্যালোক-ধ'রে-রাখা দীপ্ত আয়নায়।

কিছুই হয় না বলা

যুগান্তর চক্রবর্তী

কিছুই হয় না বলা এই দিনরাত্রির আলাপে,
একটি কথায় তবু ঘনিষ্ঠ আকাশ
সহজ ঘুমের শেষে সহজ জাগার মতো কাঁপে,
একটি কান্নায় তবু জন্মের আশ্বাস

ঘরে ও বাহিরে প্রেম নিত্য তাই দুঃখনিশা যাপে ॥

অগ্রহায়ণ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে :
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হয়ে গেছে সারা ;
খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশে পাশে ;
শুব্ধ ঘাট, রিক্ত বাট ; একমাত্র তারা
অনুমিত পাণ্ডুর আকাশে ॥

রহস্যের অনচ্ছ অভিধা
মুকুরিত সরোবরে ; হতবাক্ ক্রমে
প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গে বিশীর্ণ মলিদা ;
অবলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রনীল ধূমে,
ঘরে ঘরে প্রদোষের দ্বিধা ॥

শোধবোধ শূন্যে অবসিত :
নির্গত স্বেদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত ক্ষমতা ;
পারিশ্রমিকের ক্রান্তি সর্বস্বান্ত শরীরে কষিত ;
নষ্ট নীড়ে বিবিক্ত সে, স্বগত মমতা,
অবকাশে নির্বেদ শ্বসিত ॥

ঘুম নেই তবু রুদ্ধ চোখে :
শিথিল সন্ধিতে জাড্য, ধমনীতে হিম ;
কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না স্বভাবদোষে রাত্রির কুট্টিম
বররুচি অক্ষয় অশোকে ॥

কয়েকটি কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ধ্রুপদাভাস

আলাপ

বিকেল-সূর্যের মুখে ঠিক যেন ভোরে-পাওয়া মন।
আমি এক মহিলাকে দেখছি এখন।
খানিক ময়লা আলো ঘাসে গাছে পাতায় লতায়
হু'জনের চুপ-ক'রে-থাকা জিভে, হঠাৎ কথায়
শুধু ঠোঁটে খেলছে বিদ্যুৎ,
তবু সাবধান পাছে ভবিষ্যৎ আসে রাত্রি-কালি-মাখা ভূত।

আস্থায়ী

রাত্রি না হ'লেও যে থেকে যায় শীত।
যেন রজতাভ কোনো তুষার-সংগীত
বিদ্যুতের কশা নিয়ে দিতে চায় খানিক আমোদ,
রোদ ওঠে ওষ্ঠপুটে, হাসি হয় রোদ,
টানছে মরশুমি ফুল মন।
শিমুল-বালিকা তবু মনে একজন
রোমাঞ্চিত হাতে মুখ মুছে দেয়, পুতুল বানায়,
বলে, চুপ, চেয়ে থাকা শুধু আজ তোমায় মানায়।

আভোগ

এক মণ আমনের ঘ্রাণ
তোমার অ-মনে নিয়ে আসা!
কতো দূর হতে সুরু আমার প্রয়াণ!
তবু যে সবুজে এসে তরমুজ-লাল
খানিক গোলাপ-জল মেশে চিরকাল,
জানো ব'লে আমার পিপাসা।

তুমি-আমি

[এক]

খানিকটা জল তুমি তবু কী যে সমুদ্রের শ্রুতি
পাহাড়ের কোলে ছিলে ব'লে
তোমার দ্বীপে কি আছে পাহাড়ের উত্তাল আকুতি
তুমিও হারাও সব রঙ ধূ-ধূ সবুজেই দোলে ॥

[দুই]

একটি নবোঢ় হাত আমার হাতেই তার মন
প্রৌঢ় হ'তে-হ'তে আজ লোল
আসছে বসন্ত আর বর্ষার কল্লোল
গাছের পাতায় আর শাখায় তেমনি সব দোল
শুধু হাত থেকে চ'লে গেছে সমীরণ ॥

[তিন]

কী নেব তোমার চোখ থেকে
কোন দিকে চাওয়া?
আমার মুখেই ছায়া রেখে
দু'পাশে কুড়োতে পারো, জানি,
আলো আর হাওয়া;
মনে তাই কালোকে বাখানি।

[চার]

তোমার তন্থ যে পিছে টানে
যতোই এগোয় মন ততো বেশি জানে
ততো বেশি জাগে রাত, জানো কি লাইলি,
মজন্থ লিখছে লাইন তবু নিরিবিলি!
হয়ত হলুদ হবে চিঠি
দিলের ছোঁওয়া না পেলে, ক্ষতি নেই তাতে।
তুমি-আমি আসব যে সব দিনে-রাতে
কাগজ না থাকলেও থাকবে তা কাজে পিঠাপিঠি।

চারটি কবিতা

শামস্থর রাহমান

আত্মজীবনীর খসড়া

গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।
হঠাৎ-আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব,
আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ।
তাদের সুদূরে ফিরিয়ে দেবার মন্ত্র যদি
জানতে, তবে কি প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থতার
কাদাবালি মেখে সত্তা-তারায় আত্মজ্যোতি
কখনো হারায়, লোকনিন্দার তীক্ষ্ণ হুলে
অচিরে বিদ্ধ অকালবৃদ্ধ সহজে ব'নে
কেটে যেত কাল আকাশকুসুম জল্পনায়?
তারা যাকে বলে সফলতা তার চিহ্ন তুমি:
সারা পথ হেঁটে এখনো কিছুই পাওনি খুঁজে:
সহজ তো নয় স্বর্গসিঁড়ির আশায় বাঁচা।

যার দেখা পেয়ে চলতি পথের সূর্যোদয়ে
মুগ্ধ তরুণ অমরত্বের মন্ত্র পেলো,
অচেনা মাঠের বিহ্বল থামে দাঁড়িয়ে একা,
পেতে চাও ঐ নদীর নিবিড় শ্রাবণে যাকে,
ইচ্ছে-জোয়ারে ভেসে-ভেসে তুমি ট্রেনের পথে
নেমে যাও সুখে হঠাৎ বেঠিক ইস্টিশনে
খেয়ালি আশায় সন্ধানে যার দিনের শেষে
গ্রামান্তে কোনো, তাকেই তো বলো সুন্দর, না?
গোলকধাঁধায় তাকে খোঁজা ভার সত্য জেনো,

তার জন্যেই জপেছো গানের কত না কলি,
পথ চেয়ে আছো সকল সময় প্রতীক্ষায়
কে জানে কখন আসবে সে তার শান্ত পায়ে—
আসবে যেদিন কী দিয়ে বরণ করবে তাকে ?

তোমাকে দীর্ণ ক'রে যারা আসে, প্রস্ফুটিত
পদ্মের মতো স্বজনী আভায় কামস্বরভি
ছড়ায় হৃদয়ে, কোটি জ্যোতিকণা বিলায় মনে,
সমস্ত রাত একা-একা ঘুরে চার-দেয়ালে
মাথা খুঁড়ে, হায়, মরছো যাদের প্রতীক্ষায়
চিনেছো তাদের বহুবার তবু কেন যে এই
লগ্নে রক্তে কুমারীর ভীরু চঞ্চলতা,
আসবেই ওরা—পারবে না তুমি ফেরাতে আর।

ভেবেছো কখনো সুরের সভায় আসন পাওয়া
সম্ভব হবে ? এই যে ছড়ানো কথার কালো
দুরাশায় আজো জোনাকি-জীবন, কখনো তারা
দূরের শরতে স্মৃতিগন্ধার পাবে কি আলো ?
এ-কথা কখনো জানবে না তবু মৃত্যু হবে।

শহর জেগেছে, দূরে ঘণ্টায় প্রাণের ধ্বনি,
রোগীর শরীরে নামলো নিদ্রা হাসপাতালে,
যারা কোনোদিন ভুলেও পেলো না আপন জন,
ছেঁড়াখোঁড়া সেই ক'জন রাতের জুয়োশেষের
ক্লান্তিতে ফের ভিড়লো ধোঁয়াটে রেস্তোরাঁয়।
আস্তাবলের সহিস ঘোড়ার পিঠ বুলোয়,
শীতের শুকনো ডালের মতোই ভিস্তি বুড়ো
কেঁপে-কেঁপে তার জলমন্থণ মশক বয়,

পথের কুকুর হাই তুলে চায় ধুলোয়, কেউ
জানল না ভোর ফুটলো তরুণ ফুলের মতো,
খণ্ডিতা নারী এখন আলোর আলিঙ্গনে।
আজো আছে চিরকস্তুরীটুকু লুকোনো মনে :
সেই সৌরভে উন্মন তুমি, তখন জানি
দেয়ালে তোমার কাঠকয়লার আঁচড় পড়ে॥

পূর্বরাগ

জেনেছি কাকে চাই, কে এলে চোখে ফোটে
নিমেষে শরতের খুশির জ্যোতিকণা
কাঁপি না ভয়ে আর দ্বিধার নেই দোলা—
এবার তবে রাতে হাজার দীপ জেলে
সাজাবো তার পথ যদি সে হেঁটে আসে।
যদি সে হেঁটে আসে, প্রাণের ছায়াপথ
ফুলের মতো ফুটে তারার মতো ফুটে
জ্বলবে সারারাত, ঝরবে সারারাত।
জেনেছি কাকে চাই, বলি না তার নাম
ভিড়ের ত্রিসীমায় ; স্বপ্ন-ধ্বনি শুধু
হৃদয়ে বলে নাম, একটি মৃদু নাম॥

তোমাকেই বলি

ছায়া-ক'রে-আসা দূরের পথের
সাঁকো পেরোবার ধীর-মুহূর্তে
পাশাপাশি শুধু হেঁটেছি দু'জন ;

স্তব্ধ ছিলাম সারাবেলা তবু
দ্বিরুক্তি তুমি করোনি কিছুই।
মনের কথাটি বলতে যাবার
লগ্নে আমার হৃদয়ে আজো তো
শত-পাখি-স্বর ফোটে নির্জনে,
সেই কাকলির তাড়ায় মধুর
আপন কথাটি কোথায় হারায়।
হয়তো ভেবেছো কোনোদিন কেউ
সেই ঢেউ মেখে হয়নি উতল
যার উতরোল ফেনার শীর্ষে
জ্বলছে আমার ভাষার মুক্তো।
দিন-রাত্তির ভাবনার জাল
ফেলে শেষে তুমি কতটুকু পাবে
হৃদয়ের খেই অতল অমায়?
নতুন কথার অপরূপ মণি
তোমাকে যে দেবো কৌটোয় তুলে
এমন আশায় কখনো জ্বলিনি।
প্রাকৃতিক মহাদানের মতোই
তোমার গানের শান্ত-মধুর
পুরোনো কলিটি নতুন যেমন
—প্রতি বার বলি হৃদয়ের কাছে—
মনের কথাটি তেমনি আমার :
তোমাকেই চাই তোমাকেই চাই॥

শিখা

জানলাম
পোড়ায় সে নগর ও গ্রাম,

শত্রুর শিবির আর মিত্রের পাড়ায়
সমান প্রতাপ তার। অলক্ষ্যে কখন কী হারায়
পৃথিবী, কে জানে—
হাওয়ায় ঘোরানো ক'টি শুকনো পাতা, অথবা সভ্যতা, তার মানে
নিয়েছি নিজেরই মনে খুঁজে ;
দেখি চোখ বুজে
সে যায় অনেক দূরে বনের হাওয়ায়
এবং মোমের মৃদু শিখা হ'য়ে কাঁপে তার খোলা জানালায়॥

ঘর

জ্যোতির্ময় দত্ত

তোমাকে সম্পূর্ণ ভালোবাসবার আগে আমাকে
দু'এক মিনিট সময় দাও। এ খোলা দেশে একটা
ভাঙা ঘর অন্তত তুলি। না হ'লে অসম্ভব ভালোবাসা।

জ্ঞান হবার প্রথম ভোরেই শিখেছি যে শান্তি
বাসা বাঁধে শুধু গর্ভেই আর কবরে, একটা কিছু
আবরণ চাই, একটা ঘর, অন্তত, যার দুয়োরে খিল,
যেখানে বেহিসেবি পৃথিবী ছিন্ন মনের পান্থশালা
রচে না।
তুমিও জানো যে দইয়ালের বৈতালিকে
সেখানে দিন শুরু সেখানেও দিগ্দাহে রাত্রি রক্তিম,
এ-কথা অন্তত জানো যে সময়ের দুজন অনুচর
পাড়ায় পাড়ায় চৌকি দেয়।

গত বসন্তে মনে হয়েছিল
এই বুঝি পৌছলাম সুখ-প্রশান্তির নিস্তরঙ্গ বন্দরে,
তখন কৃষ্ণচূড়ার অঙ্গে-অঙ্গে দিগন্তের রক্ত, রঞ্জন, যৌবনের
সদম্ভ বিজ্ঞাপন গাছে-গাছে। শীতে অস্থিসার যে-পৃথিবী
বসন্তে সেও চটুল, কিছুমাত্র লাজ নেই, নিজেকে শুধু
সাজায় গোছায়।
বসন্ত গর্ভের মাস, বসন্ত
মিলনসংকুল। দুটো চড়ুই নকল অভিমানের
বাদানুবাদ শেষ ক'রে পথ নিলো গোপন ডালের।

শেষে তুমিও এলে যখন দিনের কলরবের পর পৃথিবীতে
সলজ্জ সন্ধ্যার অভিসার। তুমি এলে আর মনে হ'লো
হঠাৎ আদিগন্ত আকাশ তার বিপুল পাখা মেলে
উড়ে এলো হৃদয়ের সীমিত পরিসরে।

সে মাহাত্ম্য
ক্ষণকালের। আমার বেদনা তাই। যৌবনের সেই
উদ্দাম মাসেও দেখি এক মৃতপ্রায় বৃদ্ধ কুকুর,
মুখে কালো দাগ, পুরাতন ক্ষতে লাল দেহ, আমাদের
পাশে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে।

আর একটি
যৌবন-ভার, দেহ-উচ্ছল, সুমধ্যমা জানোয়ার তাকে
দু'একবার আমন্ত্রণ জানায়; প্রত্যাখানে ক্ষুব্ধ
ঘরে ফেরে। তোমাকে পেয়েও আমার বেদনা
সেই হতযৌবন, প্রাচীন কুকুরের।
তাই গোপন আবাস খুঁজি, প্রাচীরের ব্যবধান
টানি বৃত্তের চারদিকে। সংগোপন আশ্রয় ছাড়া
শান্তি কোথাও জোটে না তো। গর্ভের আশ্রয় চাই।
গর্ভের আশ্রয় চাই, অথবা, কবরের।

ঘর আমার
শেষ হ'লে তুমি এলে। কুৎসিত চিন্তার মতো রাত্রিও
মনের অন্দর মহলে প্রবেশেচ্ছু; সে টোকা দিক যত খুশি,
তোমার আমার মধ্যে সে স্থান পাবে না কখনো।
বাইরে কুয়াশার চাদরে মাথা মুড়ে বুড়ো বট

ব'সে থাকে। দূরে দিগন্তে উল্কার ক্ষণিক দৌরাত্ম্য।
আরো দূরে আকাশের প্রতি তল্লাটে অনেক নক্ষত্র
নৈঃশব্দ্যের কম্পিত বুকে আলোকের শিহরণ জাগায়।
কে যেন কোথায় কেঁদে ওঠে; সভয়ে দুয়ারে তাকাই,
কে যেন ব'লে ওঠে, তোমার শান্তির জন্য, এ কী, কোথায়
তুলেছো ঘর? আমার বুকের উপর তোমার ঘরের ভিৎ।

প্রবাস থেকে

অমিয় চক্রবর্তী

বে-ষ্টেট রোডে

ঠিক তাই; ধীরে আসা। একটি কথার প্রতি ধাপে
শব্দ যেই শুব্ধ হয়ে ভাবনা আভার নীলে ঠেকে
সেখানে সিঁড়িতে বসা, পাশে দেখা পশ্চিমী পাতার
লাল তামা আসন্নতা নবেম্বরে, রঙা অশ্রুভার
অন্যতার প্রান্ত-নিশ্বসিত; ট্রাফিকের ভিড় থেকে
কেম্বিজের ব্রিজে শোনা সমস্ত নগর দূরে কাঁপে
একটি গুঞ্জন জনতার; বারে বারে শীর্ষে থামা,
ঊর্ধ্বে জ্বলে বৌদ্ধ তারা, বহুরাত্রিপারে দৃষ্টিনামা॥

ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী রেকর্ডের শুভ্রতা ভজন
মুহূর্তের কণ্ঠে আসে দ্বাদশ দেউল জাগা তীর,
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অকল্প চাওয়ার বুকে স্থির;
কতদিন হয়ে গেল খুঁজেছি সে পথের লগন।
নীল আঁকা চীনে হাঁস ফুল-পাত্রে উড়েছে মিং যুগে
ডেস্কে তারি কাছে আসা; শূন্য শান্ত; বেঁচেছি দৈবাৎ
—ককটেল আতিথ্যে কারো ধূম্রতাবিলাসী কক্ষে ভুগে—
কার্পেটে তুরানী নক্সা, নিয়ে তারি ঐন্দ্রিক দৃক্‌পাত॥

চিত্র-আসি, তীর্থ-আসি: শিরার মনের দুঃখে ঝড়ে
জমা-মেঘ-সন্তর্পিত ব্যবধান চূর্ণ-করা দিনে
পতঞ্জলি-সূত্র পড়ি, কৌচে শুয়ে ভাবি, বই খোলা
প্রাঞ্জল আয়ুকে কেন প্রত্যহ ধুলোর ধর্মে ভ'রে

অব্যবহিত-হারা অবিস্মিত ইট গেঁথে তোলা।
আখরোটের কাঠে-খোদা কাশ্মীর ভূস্বর্গ স্বপ্ন চিনে
চুমকি-বসানো হ্রদ—মনে আছে ?—ধরি বুকে তাই ;
স্বামীজি অখিলানন্দ তাঁর কাছে মধ্যে মধ্যে যাই ॥

এস্পান্যোল

বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়
দুয় সমুদ্রের পথ চিনে
কেন এ ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে ;
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল স্বরে মাতা
রোদ্দুরে বিদ্যুতে গাঁথা
বাজাও স্পন্দিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে।
হাল্কা খুসির গান
অশ্রুতে করে আনচান
মেদ্রিদের অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
ভিড়ে ছুঁল সে লাবণী অনির্দেশ মেঘের ভাসান।

এই গানে অলিভের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভ'রে তোলে,
আঙুলে মুদ্রার ভাষা পায়ের নাচের তাল খোলে।
এ-গানের যা-ই নাম দাও
এই গান
এই প্রেম, এই প্রাণ
কভু বাস্ক, ক্যাটালনিয়ান
পাহাড়ের নীল-কাটা আভা দৃষ্টি তাও
চেনা চেয়ে বেশি,
শুধু নয় মন্ত্র অন্য দেশী—

এর টুংটাং ঘণ্টা শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চঞ্চল চলন্ত কত জীবনীর ছায়া ছেয়ে
দাঁড়ায় মিনার-তলে, পান্থশালা রঙিন বাজারে
প্রাচীন ইস্পানী খচা ভারি দরজা তারি ধারে ;
আজ আনে দুর্দিনের রক্তে কোন কারাভানে আঁকাবাঁকা
যুগান্ত-পৌছন প্রাণ, বিস্মরণী ছাঁকনিতে ছাঁকা।
হয়তো পেরিয়ে পিরেনিসে
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে
কাসাল্‌স্ চেলোয় তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
নতুন প্রাণনী লাগা
প্রাডেস্ গ্রামের বুকে এ গান নিলেন ॥

দিঘি

যেখানে সে ডুবে আছে
সেখানে জল নেই,
সোনালি দোলে ঝিনুক তল
মুক্তো ঝলক,
আরো গহন আলোর নীল ॥

সেখানে ঢেউ নেই,
অবগাহনের প্রতি পলক
চেতনা ঢালে অচঞ্চল,
শৈল পাখি আকাশে মিল,
তীরের আনন ॥

নীরন্ধ্র এই বন্যাঘাত,
হাল্কা তবু হাওয়ার পাত।
কানে কানেই ঝরে বাঁশি
মধুকোরকে মুকুলরাশি
তরলক্ষণ
কমলদল নেই ॥

শীতের সন্ধ্যা

শাদা-কালো-ছায়া সিল্কের পটে
আঙুল-তোলানো শিল্প
সারি-সারি এই পাতাহারা ডাল আঁকে
বরফ-নদীর বাঁকে—
কোন সবুজের বুনুনি ওদের, ভাবি,
বসন্ত চ'লে-যাওয়া
বসন্ত ফিরে-আসা,
ফ্রস্টের শীত কণিকা-ঝরানো
লুপ্ত বেলার তটে
ঢাকা সে স্বল্পকাল ;
অদৃশ্যে গাঁথে, দোলে অঙ্গুলি ডাল ॥

বসন্তে ঘন যৌবনী বন
ঢাকে সেও আসলতা,
রিক্ত হাড়ের কথা।
যে-রেখা স্থিতির : দুয়ের অতীত,
নয় যৌবন, জরা,
তার এককতা যেখানে গ্রথিত

সে-রূপ ধরে কি
গাছের প্রতীকে শীতের শিহর বেলা।
সারি-সারি ডালে শিল্প পটের রেখা
—ওদের আঙুল নির্দেশ চেয়ে দেখি ॥

পদাবলী

পায়ের ছাপ কি দেখেছ ধুলোতে
ঠাকুর ঘরের পথে যেতে, মাপ
কখনো মেয়ের, কখনো সে আঁকা
শিশুর চরণ গেছে আঁকাবাঁকা
কত অসংখ্য তারি আনাগোনা,
সাক্ষাৎ ভগবান।
প্রাচীন দ্রাবিড়, অরণ্য-কোণা
জুড়ে বুনো ধান বুনেছে নিবিড়
গেয়েছে কী গান, প্রাণমন্দিরে
ভারতী মাটিতে পদপাত রেখে গেছে।
ঠাকুর ঘরের পথে, প্রতি ধাপ,
ধর্মের আগে আরো সে-ধর্মে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ ;
যিনি এসেছেন যুগে যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা, দূরে দ্বার থেকে
এসো ফেলে রেখে ঠাকুর ঘরের ভান,
পথের ধুলোতে কোরো সন্ধান ॥

দুটি কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কবিতা

আমি জানি শেষ নেই : যতক্ষণ আছে দেহে প্রাণ
তোমাকেই খুঁজে-খুঁজে পথে ঘাটে মাঠে পর্যটন
অব্যাহত, অনির্নীত, যদিও পাখির মতো মন
রৌদ্রতাপে দিশেহারা, স্বর্ণযুগ অতীতের ঘ্রাণ
আড়ালে পশ্চাতে টানে, বর্তমান বিপদ বাধায়
কণ্টকিত প্রশ্নবাণে, কাটে দিন বিমর্ষ নগরে
নিত্য নব পরিহাসে, ছলনার গোলকধাঁধায়
বিষাক্ত রক্তের দাগ আর্তনাদে আনে রুদ্ধ ঘরে—

তবু অব্যাহত গতি ; শ্রান্ত দেহে যেখানেই থাকি
কেবলি তোমাকে খুঁজি ; শতাব্দীর গঙ্গাযমুনায়
দুর্বার উত্তাল ঢেউ, বিড়ম্বিত, তবু বাঁধি রাখি
জঙ্গম দিনের হাতে, শেষ লগ্নে মুক্ত মোহানায়
ক্ষয়িষ্ণু যুগের প্রান্তে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জাগে,
বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে তোমাকেই রাখি পুরোভাগে ॥

অফুরন্ত

আমার ক্লান্তির ভার তুমিই নিয়েছো আমি জানি,
তোমার শরীরময় ছড়ানো আমার গুরুভার ;
প্রস্ফুটিত তুমি ফুল, রেখাঙ্কিত আমি ফুলদানি,
আজো তুমি শুভ্র মেঘ, নিচে আমি বিহ্বল পাহাড়।

কখনো একান্তে কাছে দুইজন পাশাপাশি চলি,
রৌদ্রে যাত্রা অব্যাহত, ঝড়েও উত্তীর্ণ দীর্ঘপথ,
তোমাকেই মনে রেখে উচ্চারিত পথের শপথ,
তোমার নিঃশ্বাসে আজো খুঁজে পাই নিজেকে কেবলি।

বাহিরে কবন্ধ ছায়া, বনস্পতি স্তব্ধ বজ্রাহত,
সর্বত্রই কালো হাওয়া রাত্রিদিন পশ্চিমে ও পুবে ;
প্রান্তর ফসলহীন, কৃষ্ণচূড়া আতঙ্কে আনত,
বলিদান অব্যাহত বর্বরের আকাঙ্ক্ষার যূপে।
রঙের তরঙ্গ তুলে কী আশ্চর্য তবু ফুলদানি
ধরে যে বিচিত্র ফুল, তোমাকেই নিতে হবে জানি ॥

চরম দৃশ্য

সুনীল সরকার

শেষ মুহূর্তে তৈরি হয়েছি, তবু
ছাড়াতে ইতর ঘটনার হাত-ঘেরি
এবারও হল যে দেরি!
ব্যাপৃত দিনের কামনাকলাপ গুটিয়ে
দৃঢ় মননের শেষগ্রামে স্বর ফুটিয়ে
ঘাটে পা দিতেই দেখেছি ছেড়েছে ফেরি!

আরো কতবার অন্য জীবনে
হয়তো হয়েছে এমনি,
যুগছন্দের চেয়ে বিলম্বে
বেজেছে আমার ধমনী।
পুতুল-নাচের পাট তুলে দিয়ে পালাতে
আটক থেকেছি প্রসূতি-যজ্ঞশালাতে,
কীর্তনদল গেছে নীলাচল
পাড়া দিয়ে আমাদেরি।

এতদিনকার অক্ষমতার
ভাঙা ভূখণ্ড পেরিয়ে
আজো যদি শাঁখ বাজে সৈকতে
যাবো সে দণ্ডে বেরিয়ে···
অসংখ্য দিন ঝিমিয়ে আঁধার কারাতে
নীহারও তো শেষে তাকায় তারাতে-তারাতে:
চরম দৃশ্যে কিছু বিস্ময়
থাকে প্রতি নাটকেরি।

দুটি কবিতা

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী

ছায়া

ওই ঘুরে ঘুরে
সুপারির হাহাকার যায় কেঁপে-কেঁপে,
অন্তহীন এ-বিশ্বের আলো-ছায়া-তাঁতে
অস্থির কুটিল কোনো নক্সা বুনে-বুনে,
ঝোড়ো-হাওয়া-উদ্দীপিত অশান্ত জ্যোৎস্নাতে।
বহুদূর হলুদ রক্তিম তীব্র চাঁদ
অনিচ্ছুক মেঘের কাঁচুলি ছিঁড়ে জ্বলে
ভ্রূ-উদ্ধত, যৌবন-গর্বিতা,
অপ্রাপণীয়ার
সোনালি স্তনের মতো।

ঝড়ের আবেগ রিক্ত।
ছোট্ট পুকুর,
দীর্ঘ কালো সুপারির ছায়া
শান্ত, চুপ।
পায় নাই বহু সাধনাতে,
থরোথরো পাতার প্রার্থনা ভাসিয়ে দিয়েও
উদ্দাম হাওয়াতে,
ভ্রূ-উদ্ধত, যৌবন-গর্বিতা,
অপ্রাপণীয়ার
সোনালি স্তনের মতো—

শুদ্ধ
ব্যগ্র দুই হাতের মুঠিতে
জলের আয়নাতে—স্থির ছায়ার জগতে।

গানের হাউই

গানের হাউই কত ছুঁড়ে দিই রোজ
দীপ্ত কালপুরুষের দিকে,
নারী আর পৃথিবীর স্পর্শ দিয়ে ভ'রে
বারুদের ঘুমন্ত অগ্নিকে।

তারপর আলোকের দীর্ঘ শাখা হ'তে
ঝরিয়ে সৌগন্ধ্য স্বপ্নের,
ফিরে আসে দগ্ধ সব পতঙ্গের মতো
ভস্মের অঞ্জলি হ'য়ে ফের।

ফিরে আসে; তবু আশা একটিও ফুল
আকাশকন্যার চুলে যদি
শাশ্বতীর স্বত্ব পায় তারাদের মতো
আলো ক'রে অন্তহীন নদী।

বাসন্তিক

শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সরু করুণ আঙুলে বোনা পশম তুলে রাখো!
যদি আবার বইছে আজ
রক্ত, মরা দিনের স্বাদ
হ্রস্ব সেই বসন্তের বর্ণ দিয়ে আঁকো
বর্ণমালা বাসন্তিক, কম্প্র ক্ষণতন।

আজকে যদি সারা দুপুর
সূর্য-ছেঁড়া রূপোর সুর
তরল নীল
অপরিসীম ;—
এ-ফাল্গুন ঢাকো
স্পর্শ-রাঙা অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়া মন॥

একটি মুখ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

কার মুখ মনে পড়ে, কে আমার যন্ত্রণার রানী,
কাছে সে ডাকে না, তবু দেবে না যে দূরের পারানী!
স্বাদুতাসম্ভারে শুধু থরোথরো স্মরণের ভাষা
পুরোনো পটের দৃশ্যে অবিরোধী মগ্ন ভালোবাসা।

ধানের দুধের মতো, প্রাণের গভীর ক্ষীরে জমে
একটি মুখের ধ্যান স্মৃতিলগ্ন নিভৃত নিয়মে॥

নির্বাসিতের স্বপ্ন

গোপাল ভৌমিক

মাছরাঙা-নীল দিনের স্বপ্ন
আজও তো যায় নি মুছে
ইস্পাতে-মোড়া নাগরিক মন থেকে :
তাই এঁকে বেঁকে
চলতে চলতে
কৃষ্ণচূড়ার গাছে
চোখ দুটি এসে যে-ই বাধা যায়
মন-খঞ্জনা নাচে।

বাধা-নিষেধের দেয়াল মানে না,
গণনায় ভুল ঘটে ;
মধ্যদিনের রাজপথে তার
জটিল ভাবনা জুটে
কোন মায়াবীর হাতের স্পর্শ লাগে।
সূর্যও যেন সুগভীর অনুরাগে
লুকোচুরি খেলে মেঘের আড়ালে গিয়ে—
ট্রাম চলে যায় অফিস যাত্রী-নিয়ে।

তবু বিভ্রম ঘটে :
আড়িয়ল বিল
মাছরাঙা-নীল
গড়িয়াহাটের মোড়ে
এসেছে দ্বিপ্রহরে।
কৃষ্ণচূড়ায় রাঙা মন নিয়ে
ক্লাইভ স্ট্রীটের যাত্রী
মরা স্মৃতিকেই ভাবে বুঝি জীব-ধাত্রী।

একদিন সেই খড়

লোকনাথ ভট্টাচার্য

প'ড়ে আছে কোণে ধুলো-জমা আঁধারের তলায়, প'ড়ে আছে অন্ধকার ঘরে
হয়তো খড়,
হয়তো কোনো কুটো—তাকাইনি তার দিকে অবহেলা ভরে।

জানিনা কার কাছে চেয়েছি নিরন্তর ঘুম দাও, রাত দাও, নিশ্চিন্ত বিস্মৃতি দাও
মরণের মতো।
ঘুম নয়, নামে রাত তারা-ছাওয়া তিমির আকাশে, যার কোনো দ্যুতিতে ভাস্বর
হয় না
স্বপ্ন, যার কোনো বার্তা আসে না আমার ঘরে।
শুধু প'ড়ে আছে কোণে হয়তো খড়, হয়তো কোনো কুটো অবহেলা ভরে।

একদিন ব'সে-ব'সে কোমরে ব্যথা ধরে—চোখের বাইরে যে-অন্ধকার,
প্রাণহীন প্রেম,
তার শিরায় মজ্জায় ধমনীতে ভিড় করে। তাই উঠেছিলাম এবং কখন নিজেরি

অজান্তে···ছুঁয়েছি তাকে—ঐ খড়, কিম্বা কুটো, প'ড়ে ছিল অন্ধকার ঘরে।
হঠাৎ জ্ব'লে উঠল আগুন, ভেঙে চুরমার হ'ল ঘর, সমস্ত আকাশ চৌচির
হ'য়ে ফেটে গেল বিদ্যুতে।

চেঁচিয়ে উঠলাম, যতটুকু শক্তি ছিল কণ্ঠে : কোথা থেকে এল এই আগুন,
কোথা থেকে এল ঝড়, কেন এই বিদ্যুৎ ?
হেসে উঠল খড় : ঝড়, বিদ্যুৎ, আগুন ? কেউ আসেনি কোথা থেকেও।

তুমি যে ছুঁয়েছ আমায়, সে-ছোঁয়ার ঢেউ আকাশে খেলা করে। দেখেও ছাখোনি
যাকে, সে-ধুলোতেও লুকোনো আছে বিস্ফোরণের মায়া, তারি চুম্বনে জেগে
উঠেছে বিদ্যুৎ। ঘুমে নয়, নয় বিস্মৃতিতে, আলোর বেদনায় চিরসূর্যের দেশে
জাগছি আমরা সকলে—বাস করি যে-তীরে, সে-তীরে নিয়তই নৌকো চলে।

আটটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

বহুমুখী প্রতিভা

অনেকেরে ভালোবেসে অবশেষে সুন্দর বিকেলে
ছাখে, যারা সাবলীল প্রার্থিণীর মতো হেসে-খেলে
মিনিটের কাঁটা থেকে বুক পেতে বাঁচিয়েছে তারে,
সেই সব প্রেয়সীরা পরিশ্রমসাপেক্ষ পাহাড়ে
একে-একে প'ড়ে যায়, বিদায় না-ব'লে, অকস্মাৎ।
উলুপী দেয় না সাড়া, সুভদ্রা উৎসুক নয় আর,
কোথাও মেলে না খোঁজ, এমনকি, চিত্রাঙ্গদার
লেলিহান যৌবনের। মাঝে-মাঝে, সময়ের দূর
প্রান্ত থেকে, ঝাপসা ঘুমে যেন, হাজার-পাপড়ি-জ্বলা মণিপুর,
দ্বারকার অশ্ববেগ, সপ্রতিভ গতির প্রখর
হাওয়া, স্বতঃপ্রভ মাছের আগুনে স্নিগ্ধ গভীর বাসর
ভেসে উঠে ডুবে যায়, কিছুই না-দিয়ে, অকস্মাৎ।
এর চেয়ে ভালো কি হ'তো না, যদি শান্ত অপ্রয়াসে—
যে তারে বঞ্চনা করে, অথচ গোপনে ভালোবাসে—
অসতী, অনিশ্চিত সেই পাঞ্চালীর অনুধ্যানে
খুঁজে নিতো একান্তেই অবিকল বিচিত্রের মানে।
তাহ'লে অন্তত এই সুন্দর বিকেলে, ইতস্তত
ধাবমান, বান্ধববহুল, ত্রস্ত শশকের মতো
ছিন্নভিন্ন হ'তো না সে, আশ্রয় না-পেয়ে, অকস্মাৎ।

শিল্পীর উত্তর

আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যভেদ ক'রে,
না-বুঝে, প্রথম বার, তারপর থেকে সহজেরে

অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীরে।
দেয় না সে আশ্রয়, প্রমিতি, প্রজ্ঞা; তাই তো আমার
পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আরব্ধ যাত্রার
আবর্তন; তাই আমি বনবাসে, নির্বাসনে, ছদ্মবেশে
ঘুরেছি দ্বাদশ দ্বীপ ইন্দ্র, হর, বরুণের দেশে;
করেছি অবগাহন সব তীর্থে; কামনার সান্দ্র আবেদনে
জ্বলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়, মনে-মনে
দ্রৌপদীরে দুর্বল জেনেও। যুদ্ধে হয়েছি অজেয়
নির্বিবেকে পক্ষপাত মেনে নিয়ে, যার যূপে প্রথম কৌন্তেয়
বধ্য হ'লো, একলব্য বিকলাঙ্গ; আর, যদিও সত্তায়
ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে, অমল ব্যথায়—
সময়সংকটে যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান—
শুনেছি অমৃতকণ্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান।
সব সত্য!—কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

কবি: তরুণ ও প্রৌঢ়

তার পরে কী হ'লো তা বলেননি হান্স আণ্ডেরসেন।
এপ্রিলে, বরফ-গলা, আলো-জ্বলা পুণ্য সরোবরে
জন্ম নিলো, নির্মোক মোচন ক'রে যে-তরুণতম,
সে কি প্রীত চন্দনের প্রথম ফোঁটার পরে, হৃষ্টমন,
মেদমান, আত্মপ্রসাদের বশে পাখনা ঝরিয়ে,

ফের হ'লো আরো বেশি পুকুর-পাড়ের পাতিহাঁস ?
না কি হ'লো আরো সে সুন্দর, যত মরত্বের বেলা
প'ড়ে এলো, আরো ঊর্ধ্বে, স্বচ্ছতর নীলিমার
আলোয় সাঁতার কেটে, সূর্যাস্তের সোনার প্লাবনে
ডুবিয়ে অমর গলা গেয়ে গেলো মরাল-সংগীত ?
···জানি না, জানে না কেউ। শুধু জানি, লাবণ্যের হ্রদ
যদিও থাকে না শূন্য কোনো শীতে, তবু ছেলেমেয়েদের দল
রুটির টুকরো হাতে নূতনতরের প্রত্যাশায়
প্রত্যহ দাঁড়িয়ে থাকে, ঘুম ভেঙে, আবার এপ্রিলে।

কবি : লোকের চোখে, আর—হয়তো—তার নিজের

যেহেতু সে ভালোবেসে শুধু
বিনিময়ে পেলো অবিরল
বিচ্ছেদের পারিশ্রমিক,
তাই অন্য যে-কোনো প্রবল
ব্যবসার অধ্যবসায়ে
লিখে গেলো সহস্রাধিক
চম্পূ, গাথা, উদ্ভটকবিতা,
উপরন্তু বিংশতি নাটক—
ভ'রে দিলো গোপন শূন্যতা,
বিপ্রলব্ধ, অপ্রাসঙ্গিক
জীবনের দিন, দণ্ড, পল :
তারপর, দু-চারি শতক
গত হ'লে, যে-কালের ভার
ছিলো তার ছুঁড়ে-ফেলে-দেয়া
রজকসাপেক্ষ পরিধান,

তারই কোনো ভাঁজ খুলে, ধীরে
দেখা দিলো, নক্ষত্রের মতো,
ইতিহাসবিচ্যুত অনলে
আপনাতে আপাতসার্থক—
মরত্বের শেষ পরিণাম—
তার নাম, শুধু তার নাম !

কবিতার জন্য

...till all my priceless things
Are but a post the passing dogs defile.
W. B. YEATS

'ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা ভ্রমণকাহিনী,
কিছুই না থাকে যদি এই ক্ষণে, তাহ'লে নিদেন
একটি কবিতা দিন, তারও আছে পারিশ্রমিক—'
এই ব'লে নম্র হেসে সম্পাদক বিদায় নিলেন।
উত্তরে যে-কথা যোগ্য, উপস্থিত জানাতে পারিনি ;
লিখে রাখি এইখানে : আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল বণিক
কোনোখানে আছে, এই কল্পনার প্রগল্‌ভতায়
অনেক বন্দরে ঘুরে, অপরাহ্নে অনুকূল ক্ষণে
বিবেকের পরামর্শে পেয়েছি সুন্দর সমাধান।
হৃদয়ের রত্নগুলি—সহনীয় সলজ্জতায়—
ফেলে যাবো রাজপথে দূরত্বের ধূসর নিশান ;
পথে-চলা কুকুরের প্রস্রাবের নগদ সম্মান
গায়ে মেখে, অবান্তর রৌদ্রে, জলে, শৈবালে, কর্দমে
ধার ক্ষ'য়ে, ভেঙে-ভেঙে, ব্যবহার্য হবে ক্রমে-ক্রমে।

দায়িত্বের ভার

কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নয় আর।
লেখা, পড়া, প্রুফ পড়া, চিঠি লেখা, কথোপকথন,
যা-কিছু ভুলিয়ে রাখে, আপাতত, প্রত্যহের ভার—
সব যেন, বৃহদরণ্যের মতো তর্কপরায়ণ
হ'য়ে আছে বিকল্পকুটিল এক চতুর পাহাড়।
সেই যুদ্ধে বার-বার হেরে গিয়ে, ম'রে গিয়ে, মন
যখন বলেছে, শুধু দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা তার
সবচেয়ে নির্বাচিত, প্রার্থণীয়, কেননা তা ছাড়া আর
কিছু নেই শান্ত, স্নিগ্ধ, অবিচল প্রীতিপরায়ণ—
আমি তারে তখন বিশ্বস্ত ভেবে কোনো-এক দীপ্ত প্রেমিকার
আলিঙ্গনে সত্তার সারাৎসার ক'রে সমর্পণ—
দেখেছি দাঁড়িয়ে দূরে, যদিও সে উদার উদ্ধার
লুপ্ত ক'রে দিলো ভাবা, লেখা, পড়া, কথোপকথন,
তবু প্রেম, প্রেমিকেরে ঈর্ষা ক'রে, নিয়ে এলো ক্রূর বরপণ—
দুরূহ, নূতনতর, ক্ষমাহীন দায়িত্বের ভার।
কিছুই সহজ নয়, কিছুই সহজ নেই আর।

অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা

অন্যেরা, যেহেতু তুমি বীর পার্থ, তোমার কীর্তির
উপার্জনে গণ্য হ'য়ে সার্থক মেনেছে আপনারে।
সন্তান চেয়েছে ওরা, বিশ্রুতির মাতার সম্মান ;
তার মুখে দেখা হ'লে প্রাকৃতিক সপ্রতিভতায়
নিশ্চিন্তে মিলিয়ে গেছে আবহমানের অন্তরালে।
মাঝে-মাঝে অপভ্রংশ প্রণয়ের অবসরে তুমি
পঞ্চমাংশে সমাপন্ন সামাজিক পতি হ'য়ে ছিলে,

আর ছিলে সেই কূট পুরুষের আশ্রয়ে অজয়
লোকেরা বিকল্পে যাকে দ্রৌপদীর সখা ব'লে থাকে।
এই ব্যর্থ, জ্যোতিষ্মান ইতিহাসে শুধু একজন
সধূম শোণিত নিয়ে জ'লে গেছে তোমার তৃষ্ণায়,
জেনেছে তোমারে তার অনলের পর্যাপ্ত খাণ্ডব—
অন্য কোনো পরিণামসূত্রে নয়, তুমি—তুমি—তাই, শুধু তাই।
নামহীনা, পুত্রহীনা, চিহ্নহীন, প্রমাণবিহীন
তার কথা বেদব্যাস যদিও হেলায় ভুলেছেন,
আমি জানি, প্রস্থানের অন্ধকারে প'ড়ে যেতে-যেতে
তুমি, বিশ্বজয়ী বীর, চেয়েছিলে আরো একবার
অনাবিল, অসমাপ্ত, ব্যক্তিগত সেই আলিঙ্গন।

কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যুর স্মরণে

তিলে-তিলে নির্বাপণের
হ'লো না সে নিস্তেল আধার,
ঠাণ্ডা ভোরে পাণ্ডুর পেয়ালা।
বিনিময়ে, অনেক যুদ্ধের
উপহৃত আশ্চর্য খেয়ালে
স্বেচ্ছাচারী সম্রাট যেমন
উন্মুখর, লক্ষদীপজ্বালা
উৎসবেরে অলক্ষ্য সংকেতে
ক'রে দেয় অন্ধ, অন্ধকার—
ছিন্ন তার, শুদ্ধ সব গান—
সেই মতো, নির্ভীক, সক্ষম,
অলজ্জিত, দৃপ্ত, অবিকল,
অমাত্যের প্রশ্নের অতীত,
অকস্মাৎ তার অন্তর্ধান।

এজরা পাউণ্ড-এর কবিতা

অনুবাদ : বিষ্ণু দে

ফ্রান্‌চেস্‌কা

তুমি এলে রাত্রি থেকে বেরিয়ে
আর তোমার দুহাতে ছিল ফুল
এখন তুমি বেরিয়ে আসবে লোকের ঠেলাঠেলি থেকে
তোমাকে ঘিরে কোলাহলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তো তোমাকে দেখেছি সব প্রাথমিক বস্তুর বিশ্বে
আমার রাগ হয় যখন ওরা তোমার নাম বলে
যতো মামুলি জায়গায়
আমি চাই যে শীতল ঢেউ বয়ে যাক্ আমার মনের উপর দিয়ে
আর পৃথিবী শুকিয়ে যাক্ মরা পাতার মতো
বা দোপাটির বীজকোষের মতো আর উড়ে চলে যাক্
যাতে আমি আবার পাই তোমাকে
একা।

সুখ-প্রহরের লেখ ফলক

কী করে না জানি এই সৌন্দর্য, যখন আমি বহুদূরে থাকব
আমার উপরে বান নামবে, ছেয়ে দেবে আমার মন!

কী করে না জানি এই প্রহর, যখন আমরা দুজনে হবো পক্ককেশ,
তার ইন্দ্রনীল জোয়ারে ফিরে আমাদের উপরে আসবে
উজান তুলে।

বেদী

এখানে আমরা গড়ি এসো অপরূপ এক বন্ধুত্ব
এই শিখা, এই শরৎ এবং প্রেমের এই সবুজ গোলাপ
এইখানেই তাদের সংঘাত শেষ করেছে, এ আশ্চর্যের স্থান,
যেখানে এরা ছিল, এ তো যুক্তিযুক্ত; সেখানের মাটি পুণ্য।

মেট্রোর এক স্টেশনে

ভিড়ের মধ্যে মুখগুলির প্রতিভাস;
ভিজে কালো ডালের উপরে কটি পাপড়ি।

ঝর্না ও পাথর

পাপড়িগুলি ঝর্নাধারায় পড়ছে
কমলারঙের গোলাপপাতা,
তাদের হলদি লেগে থাকছে পাথরে।

ধ্রুপদ

থাকো আমার মধ্যে যেন হিমের হাওয়ায়
চিরন্তনভাবে এবং থেকো না
যেমন সব নশ্বর বস্তু থাকে—
ফুলের হাসিখুশি।
আমাকে নাও দৃঢ় নিঃসঙ্গতায়
সূর্যহীন শিখরের
আর ধূসর জলরাশির
দেবতারা আমাদের কথা যেন বলেন নরম গলায়

আগামী কালের দিনে,
বৈতরণীর ছায়াচ্ছন্ন ফুলগুলি
তোরে রাখুক মনে।

ছবি

এই মৃত সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে,
কারণ এখানে ছিল প্রেম, যা বানে ভেসে যায় না,
এবং এখানে ছিল কামনা, চুমায় যা নয় নিঃশেষ।
এই সুন্দরীর চোখ দুটি আমায় কথা বলে।

তেনৎজোনে

লোকেরা কি এদের নেবে
(অর্থাৎ এই গানগুলিকে)।
ত্রস্ত তন্বীর মতো যেন কোনো কিন্নরের
(বা কোনো মনসবদারের) কাছ থেকে
এরা তো এখনই পালায়, ভয়ার্ত চিৎকারে।

এরা কি কিছু বুঝবে যাথার্থ্যের সত্যাসত্য ?
এদের কুমারী নির্বুদ্ধিতা যে অপ্রলোভ্য।
আমার দোহাই শোনো, হে অনুকূল সমালোচকেরা,
আমার জন্যে আসর জমাবার প্রয়াস তোমরা কোরো না,
আমার মেলামেশা আমার স্বাধীন স্বগোত্রে চূড়ায় চূড়ায়
গোপন গুহায় কন্দরে
আমার পায়ের প্রতিধ্বনি পৌঁছয়
শীতল আলোকে,
অন্ধকারে।

চিলেকুঠুরি

এসো আমরা করুণা করি যাদের অবস্থা আমাদের চেয়ে সচ্ছল
এসো হে বন্ধু স্মরণ করি বিত্তবানদের, যাদের খানসামা আছে, বন্ধু নেই,
আর আমাদের বন্ধু আছে, নেই খানসামা।
এসো করুণা করি বিবাহিতদের আর অবিবাহিতদের।

উষা আসে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে
সোনালি এক পাভলোভার মতো,
আর আমি রয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষার কাছে।
জীবনে আর কিছুই নেই
এই স্বচ্ছ শীতলতার প্রহরের চেয়ে ভালো
এই একসঙ্গে জাগার প্রহর।

গচ্ছ

যাও, হে আমার গান, প্রশংসা খুঁজো তরুণদের আর
অসহিষ্ণুদের কাছে,
ঘুরো শুধু উৎকর্ষের প্রেমিকদের মধ্যে।
সর্বদা দাঁড়াতে চেয়ো কঠিন সোফোক্লীয় আলোয়
আর তার হাতে আঘাত নিও সহর্ষে।

তোকালন বা সুন্দর

আমার স্বপ্নেও তুমি আমাকে বঞ্চিত করেছ,
পাঠিয়েছ শুধু তোমার করঙ্কবাহিনীদের।

ভোরাই

শীতল যেন ভুঁইচাঁপার পাণ্ডু ভিজে পাতা
আমার পাশে সে শুয়ে ভোরবেলায়।

লিউ চে

রেশমের খসখসানি থেমে গেছে,
ধুলো উড়ছে উঠোনে
পায়ের শব্দ নেই, পাতাগুলি উড়ে উড়ে
জড়ো হয় আর স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকে,
আর সে, হৃদয়ের যে নন্দিনী, সে তারই তলায়:
ভিজে একটি পাতা চৌকাঠ আঁকড়ে।

এক অমরতা

আমরা গান করি প্রেম ও আলস্যের,
আর কিছুই চাওয়া পাওয়ার যোগ্য নয়।

যদিও ঘুরেছি আমি অনেক দেশ,
আর কিছুই জীবনের লভ্য নয়।

বরং আমার মধুরাকেই চাই
যদিও গোলাপ ঝরে যন্ত্রণায়।

কী হবে হাঙ্গেরিতে মহাকাণ্ড করে,
যা লোকে ভাববে মোটে সম্ভাব্য নয়।

আলো অন্ধকারের গান

(শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র, বন্ধুবরেষু)

নরেশ গুহ

বিগত লগ্ন, মালিন্য জ্যোৎস্নায়।
মনে হয় যেন একদা-সাধ্য সেতু
মাতঙ্গ ঢেউ ধুয়ে নিয়ে চ'লে যায়,
ধ্রুবতারকায় জয় করে ধূমকেতু।

গ্রীষ্মের শেষে খরতর গ্রীষ্মের
লাভা নেমে আসে উপত্যকার ঘাসে
উড়ে যেতে-যেতে পথিক পাখির ঝাঁক
অসহায় ডানা ঝাপটিয়ে নেমে আসে;

দগ্ধ সুদূর পল্লী, স্বামীর শব
ছুঁয়ে ব'সে থাকে করুণ বালিকা যবে,
নগরে মাতাল মূষিকের উদ্ভব
হেন অসময়ে তারে ডেকে কী বা হবে।

এ-যন্ত্রণার অবসান হয় যেন।
আমাদের রাত ভেবে-ভেবে কেটে যাক:
সেই আলোটির ভুরু জোড়া বাঁকা কেন।
(শেষ তারাটি কি শুনেছে ভোরের ডাক?)

আলো চোখে নিয়ে ম্লান এশিয়ার কোণে
জরায়ুতে সে যে শিশুর বার্তা শোনে।
শিশুকে কোথায় কে শোয়াবে, বলো, কার
অক্ষত হাত পরাবে সোনার হার?
বুকে নিয়ে তারে কে আজকে দোলা দেবে?

আকাশে বিশাল বিদ্যুৎ চমকায়।
বৃষ্টি এখনো নামেনি মুষলধারে :
ধুলো কালি কাদা দিল্লি কলকাতায়;
আমরা আহত বারুদে অন্ধকারে।

আর সে-যে আলো, জন্মে জীবনে জয়;
তার বাঁকা ভুরু, তার কালো চোখ, তার
চিকণ গলায় অলখ সোনার হার,
অমোঘ কণ্ঠে প্রভাতের নির্ভয়।

হোল্ডারলিন-এর কবিতা

অনুবাদ : **বুদ্ধদেব বসু**

যৌবন

কোনো-এক দেবতা আমারে
প্রথম যৌবনদিনে, মানুষের
ন্যায়দণ্ড, সংসারের উত্তাল চীৎকার থেকে
অনুক্ষণ রক্ষা করেছেন।
তখন অপাপস্পৃষ্ট, চিন্তাহীন,
অরণ্যে ফুলের সঙ্গে খেলা ক'রে,
ঈশ্বরের বাতাসের বন্ধু হ'য়ে আমি
কাটিয়েছি দিন।

যেমন নন্দিত করো
উন্মীলিত ফুলেদের হৃদয়েরে
যখন তোমার দিকে
উৎসুক, বাড়িয়ে দেয় ক্ষীণ বাহু তারা,
সেইমতো, হে পিতা পুষণ, তুমি আমারও হৃদয়ে
এনেছো আনন্দস্রোত; আর এণ্ডিমিয়নের মতো
আমিও পেয়েছিলাম তোমারে প্রেয়সী,
হে পূত চন্দ্রমা!

দেবগণ, দয়াবান,
একনিষ্ঠ আত্মীয় তোমরা—
জানো না তো, তখন আমার প্রেম
কী ব্যগ্র ব্যাকুলতায় ছুটেছিলো তোমাদের দিকে।

যদিও তখনো তোমাদেরে
নাম ধ'রে ডাকিনি কখনো আমি,

৬

তোমরাও, পরস্পর-পরিচিত মানুষের মতো,
আমারে করোনি সম্ভাষণ,

তবু, মানুষের চেয়ে
অনেক গভীরতর সত্য হ'য়ে, তোমরাই
ব্যাপ্ত হ'য়ে আমার হৃদয়ে ছিলে
নীলিমার মৌন বীণা শুনেছি অনবরত, কিন্তু মানুষের
ভাষা আমি বুঝিনি কখনো।

মর্মরিত পল্লবের স্বর
লালন করেছে মোরে, অরণ্যকুসুম
শিখিয়েছে ভালোবাসা; দেবগণ ছিলেন আমার
ধাত্রী, পিতা, মাতৃক্রোড়।

মধ্যজীবন

বন্য গোলাপে পূর্ণ, নাসপাতির
হলুদে আক্রান্ত এই দেশ, ধীরে
নুয়ে পড়ে অচ্ছোদ হ্রদের প্রান্তে;
সেখানে, লাবণ্যপুঞ্জ
মরালেরা, চুম্বনে মাতাল হ'য়ে, বার-বার
অধর ডুবায়ে দেয়
পুণ্যময় প্রশান্ত সলিলে।

অবশেষে যখন কঠিন শীত
দেখা দেবে, আমি তখন কোথায়
খুঁজে পাবো ফুলদল, আর কোনখানে
রৌদ্রের উচ্ছ্বাস, আর
পৃথিবীর ছায়ার সম্পাত?

ঠাণ্ডা দেয়াল শুধু
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, স্বনিত হাওয়ায়
আবহকুক্কুট ঘূর্ণ্যমান।

হাইপেরিয়নের অদৃষ্টের গান

তোমাদের বিচরণ ঐ ঊর্ধ্বে, হে পুণ্য কিন্নর,
আলোর প্লাবনময় কোমল কুট্টিমে,
দেবতার ভাস্বর বাতাস
ধীরে স্পর্শ ক'রে যায় তোমাদের,
যেমন বীণার
মন্ত্রপূত মূর্ছনায় গুণীর অঙ্গুলি।

দেবযোনি, স্বর্গের সন্তান,
ঘুমন্ত শিশুর মতো অদৃষ্টরহিত
তোমরা নিশ্বাস নাও, শুদ্ধচারিতায়
সুরক্ষিত, বিনম্র কোরকে
চিরকাল-বিকশিত আত্মা নিয়ে
মেলে রাখো নন্দিত নয়ন
চিরন্তন, স্থির, স্বচ্ছতায়।

কিন্তু আমাদের
নিয়তি দেয় না শান্তি; তাপিত মানুষ,
ক্ষীয়মাণ, অন্ধ বেগে
প্রহরে-প্রহরে প'ড়ে যায়,
যেমন ঝর্নার জল
পাথরে-পাথরে প্রতিহত,
অবিরল অধঃপাতে, বৎসরের অনিশ্চয়তায়:

দিওতিমা

তোমারে চেনে না এরা ; নিঃশব্দ দুঃখের ভারে নত,
অমৃতরূপিণী, তুমি ম্রিয়মাণ বিনা প্রতিবাদে ;
তবু আজো সূর্যের আলোয়
বর্বরের চক্রব্যূহে বৃথা খোঁজো আপন দোসর।

কোনোখানে নেই আর মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষ।
কিন্তু কাল নিরবধি। এ-মর সংগীত মোর তবু দেখে যাবে
সেই দিন, যে-দিন তোমার নাম, দিওতিমা, দেবতার পরে
বীরের সম্মান পাবে, যোগ্য হবে তব।

দিওতিমার প্রতি

সরস্বতী, স্বর্গের করুণা, তুমি একদিন উতরোল পঞ্চভূতে
সৌষম্যে মিলিয়েছিলে, এসো আজ শান্ত করো উচ্ছৃঙ্খল কালের প্রলয়!
মুগ্ধ করো উত্তাল যুদ্ধেরে তব মন্ত্রপূত বীণার ঝংকারে
যতক্ষণ মর্ত্যের হৃদয়ে পুন বিচ্ছিন্ন বৃত্তির
না ঘটে মিলন, জাগে সময়ের ফেনিল আবর্ত থেকে, সৌম্য, বলীয়ান,
অবিচল, তপঃকৃশ, মানুষের প্রতন প্রকৃতি!
পা রাখো মন্দিরে পুন, ফিরে এসো প্রীতিময় নবান্নপ্রাশনে
এসো জনতার দীর্ঘ-ক্ষুধিত আত্মায়, সৌন্দর্যের প্রাণলক্ষ্মী তুমি!
কেননা এখনো আছে দিওতিমা, বেঁচে আছে শীতে ম্লান মঞ্জরীর মতো,
সহজ ঐশ্বর্য নিয়ে, অথচ সূর্যের অপেক্ষায়।
কিন্তু সে-উজ্জ্বলতর বসুন্ধরা নেই আর, অস্ত গেছে আত্মার পরম সূর্য ;
আজ শুধু কলহকর্কশ বাত্যা হিমাক্ত নিশীথে ধাবমান।

ভ্রম-সংশোধন

১৯০ পৃষ্ঠায় 'দায়িত্বের ভার' কবিতার অষ্টম পংক্তিতে 'প্রার্থনীয়' শব্দটি ভ্রমক্রমে 'প্রার্থণীয়' ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

সমালোচনা

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : বিষ্ণু দে। সিগনেট প্রেস : আড়াই টাকা

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা '২২শে শ্রাবণ', শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'। এই সন্নিবেশ তাৎপর্যসূচক। কবিতাগুলি মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, স্থবিরতা থেকে জঙ্গমে, নিরাশা থেকে উদ্দীপনায়, অসুন্দর থেকে সুন্দরের জ্যোতির্লোকে, বিশ্বাসে শান্তিতে ধাবমান হবার আহ্বান। বিষ্ণু দে বরাবরই দেশকাল সম্বন্ধে সামাজিক অর্থে চিন্তিত। গত দশ বছরের বাংলা-দেশ—দাঙ্গা, দুস্থের মিছিল, অনাচার, নীতিচ্যুতি, 'মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ'—এই বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার বেদনাভূমি। কিন্তু অন্যান্য বামপন্থী পদ্যকারদের মতো শুধুমাত্র রাজনৈতিক আবহাওয়ার রোজনামচা লিপিবদ্ধ ক'রে এবং প্রতিকার চাই আওয়াজে বিষ্ণু দে নিরস্ত হননি। ফলত, তাঁর রচনায় ফৌজী মনোভাব কম; লেনিন-স্টালিনের জন্য উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও, দেখানোপনা অল্প ; তাঁর রচনা সাম্যবাদের ভাষান্তরিত ফতোয়ামাত্র নয়। ঘৃণা আর হিংসা, হতাশা আর শ্লেষ, যখন অপরাপর বামপন্থী লেখকদের মূলধন, বিষ্ণু দে-র অবলম্বন তখন প্রীতি আর প্রেম। প্রেম, এবং তা থেকে উত্থিত আনন্দ, এই দুটি একাত্ম অনুভূতিকে, পরিপার্শ্বের হাজার বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও, তিনি নিজের মধ্যে অবিকৃত রেখে তার ভিতরেই সান্ত্বনা এবং সাহস খুঁজে পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, স্বকীয় অনুভূতিকে সার্থকতার সঙ্গেই সঞ্চারিত করতে পেরেছেন আমাদের চিন্তায়, চেতনায়। মন্তব্যের সপক্ষে দুটি আবেগঘন ছোটো কবিতা উদ্ধৃত করছি।

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দুচোখে দিয়ে দাও দুঃখ সুখ
দুবাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয়।

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমায় হাতে ঢাকো তোমার মুখ ॥

(অন্ধকারে আর)

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, রাত্রি কোজাগর বিনিদ্রের,
স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
কোয়ার্টেট যেন কোন অতন্দ্রিত অপরাজেয় গ্রোস্ ফুগের গান।
রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও, মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত।
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্র হীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান—
পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত ॥

(পাঁচ প্রহর)

তিন-চার-তিন-দুই মাত্রায় লেখা এই দুটি কবিতার প্রথমটি কার না চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে? আর দ্বিতীয়টির মধ্যে যে প্রাণরঙ্গের জৈব শৈশব আনন্দ উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহেই সংক্রামক। এই আলো উজ্জ্বলতার জগৎ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র আরো অনেক কবিতায় মূর্ত হয়েছে, যেমন, 'আশ্বিন বুঝি? আশ্বিনে কাঁপে ঘর', 'উপোসী পাহাড়ের চড়াইপার' ইত্যাদিতে।

বামপন্থী কবিদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র কবিতাই যে আমার কাছে পাঠ্য মনে হয় তার কারণ তিনি নিজেকে মজুর নয়, মজুরপ্রেমিক মধ্যবিত্ত ব'লেই স্বীকার করেন, অন্তত তাঁর রচনা এই ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়; এবং ব্যক্তিক আবেগ-অনুভূতি তথা মানুষের নিত্যকালের হৃদয়বৃত্তিগুলিকেও তিনি কবিজনোচিত সম্মান দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। অর্থাৎ, সমাজভাবনা তাঁকে প্রেম এবং প্রকৃতি বিষয়ে মুখচোরা ক'রে তোলেনি, যেমন করেছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেককে। বস্তুত, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র অনেক উপমাই নৈসর্গিক, বাদবাকির উৎস কোনো-না-কোনো প্রেমোপাখ্যান। ব্যক্তি এবং সমষ্টির সম্বন্ধনির্ণয়ের সময় ব্যষ্টিকে ঢেউ আর সমাজকে সমুদ্ররূপে কল্পনা ক'রে উভয়কে কবি চিরবাহুবদ্ধ রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিতে অথবা পার্বতীপরমেশ্বরেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া, 'ভিলানেলে'র মতো বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা লিখতেও তাঁর 'সমাজচেতনা'য় বাধেনি।

বিষ্ণু দে-র কবিতা আমার ভালো লাগে তাঁর মনের এই সজীব স্বাভাবিকতার জন্যই। মুক্ত দৃষ্টির স্বচ্ছতায় ঐতিহ্যকে তিনি সত্য-সত্যই আত্মসাৎ করতে পেরেছেন। শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য নয়, পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্য থেকেও, কমলে কামিনী, কালীয় দমন ইত্যাদি, এই বইয়ের উপমার উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে; তদুপরি বিশ্বসাহিত্য তো আছেই। সাহিত্য প্রধানত সাহিত্যের দ্বারাই পুষ্ট এবং প্রভাবিত হ'য়ে থাকে, সাহিত্য কেবলমাত্র বহির্জাগতিক ঘটনাপুঞ্জের প্রতিচ্ছবি নয়। এই সত্যে, তথা মানুষের ভাবধারার স্বকীয়সত্ত্ব অস্তিত্বে, সন্দিহান হ'য়ে, এদেশের অধিকাংশ বামপন্থী স্বভাবকবিরা ব্যর্থ চিত্রকল্পে সাহিত্যের নামে অন্য দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন। এ-কথা স্বীকার্য যে সাহিত্যের উপকরণ হ'তে পারে না এমন বস্তু ভূভারতে নেই, কিন্তু আবেগগ্রাহ্য না হলে কোনো কথাই তো কবিতা হ'য়ে ওঠে না। আধুনিক কবির প্রধান লক্ষ্য হল ভাবালু উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে স্বকীয় চিন্তাবস্তুকেই উপযুক্ত প্রতীক, রূপক, উপমার মধ্যবর্তিতায় আবেগরূপ দেওয়া। বলা বাহুল্য, অনাত্মীয় চিত্রকল্প চিন্তা এবং আবেগের এই কাব্যিক সমীকরণে বাধা দেয়। তাই কাব্যের অলিখিত নিয়মকানুনের অঙ্গীকারেই কবির মুক্তি। সম্প্রতিকালের বামপন্থী কবিরা বৃহত্তর কাব্যস্রোতের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে কেন যে দুর্মর ছুঁৎমার্গে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন তার কারণ এইখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বিষ্ণু দে-র কাছে তাঁদের শিক্ষালাভ করা উচিত।

চিন্তাবস্তুর দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থটি এক এবং বহুর অদ্বৈতসাধন; 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার', এক কথায়, মানব-সাগর-সঙ্গমে কবির তীর্থযাত্রা। 'চোরাবালি'র 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার আবেগ স্বাভাবিক পরিণতির দিকেই

চলেছে। যাত্রাপথের বন্ধুর চড়াই উৎরাই এই বইয়ের একাধিক বিশ্লেষণাত্মক রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু পরিণামে বিষ্ণু দে-র কবিতার মুখশ্রী বিকৃত হয়নি, বরং তাঁর চিন্তার সংগঠনী ক্ষমতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই পুস্তকের অন্তর্গত 'একজন দুঃস্বপ্ন' নামক কবিতাটি গজদন্ত-মিনারের অধিবাসী একটি বিবিক্ত মানুষের আলেখ্য হিসেবেই উল্লেখযোগ্য নয়, সম্প্রতিকালের বাংলা কবিতায় একটি স্মরণীয় সংযোজনা। 'টাইরেসিয়স' কবিতায় 'পরিমিত সংস্কৃতিসম্ভোগে' দিনযাপনকারী এতদ্দেশীয় সচ্চরিত্র ভদ্রলোকদের ছবি দেখেও মজা পাওয়া যায়।

বিষ্ণু দে অসামান্য ছন্দকুশলী। তাই যথাবিহিত দ্বিধা নিয়েই বলছি ইদানীং তাঁর অনেক কবিতা শিথিল হ'য়ে পড়ছে, কেমন যেন এলোমেলো, অযত্নবিন্যস্ত। এই অনুমানটাই হয়তো সত্য যে সম্প্রতি ছন্দ নিয়ে তিনি এমন সব পরীক্ষা করছেন যার সঙ্গে আমাদের কান ঠিক তাল রাখতে পারছে না। যা-ই হোক না কেন, দ্বিত্ব শব্দের বিরক্তিকর বাহুল্য—দুলে দুলে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, জলে জলে, পাড়ে পাড়ে, দিনে দিনে, খুলে খুলে, হাওয়ায় হাওয়ায় ইত্যাদি ছাড়াও, আলোচ্য গ্রন্থটি পড়বার সময় অনেক জায়গাতেই আমাকে মুশকিলে পড়তে হল। ধরা যাক প্রথমেই যে দুটি কবিতা উদ্ধৃত করেছি তার দ্বিতীয়টির শেষ পঙ্‌ক্তি, অর্থাৎ, 'পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত' বাক্যটিকে। এখানে চার-চারটি 'এ'-কারান্ত শব্দ এবং তদুপরি 'এ' বর্ণটির বোঝা পাহাড়প্রমাণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'দিই' শব্দটিও স্বাভাবিক উচ্চারণে পুরো দুমাত্রার ওজন দাবি করতে পারে কি? শব্দের এবম্প্রকার অসতর্ক ব্যবহার এ-গ্রন্থে অজস্র, যেমন, '২২শে শ্রাবণ' নামক কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে 'হয়েয়'। এখানে 'য়'-বর্ণটি এলিয়ে পড়ে। প্রাকরণিক গোলযোগের আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

আকাল বছরে কৃষ্ণচূড়াও ম্লান
গলিতে গলিতে আয়তচক্ষু হাড়
ফেরারী কতো না প্রাণ

তোমার দুচোখে তোমার মানসে সাড়
জাগায় নীল পাহাড় মেলে ধরে ফাল্গুন
জীবনেরই আহ্বানে

(বারোমাস্যা)

মোছাও ঘোচাও কৃষ্ণচূড়ার শোক
গলির মোড়েই ছড়াও ইন্দ্রধনু
প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক
আকাশ যেমন পাহাড় যেমন স্বাধীন সমাজে জীবন যেমন।

(ঐ)

মাত্রায় বাঁধা ছন্দের সঙ্গে 'জাগায় নীল পাহাড় মেলে ধরে ফাল্গুন' আর 'প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক' অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় এনেছে কি? না কি অন্যায় এবং আকস্মিক আক্রমণে পাঠকের কানকে বিপর্যস্ত করেছে? ভয় হয়, এই ধরনের পরীক্ষাকার্যের গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে, কেন না, স্পষ্টতই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের প্রেরণায় এদের জন্ম হয়নি। আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

বুঝি না যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে
এ কি বা আকাঙ্ক্ষা কি আশা।
বাছারে বক্ষ কাঁপে ডরে।

তাকাস পাহাড়ের ভিড়ে
ডাকিস অরণ্যকে দুবাহুর নীড়ে,
চলের বান কি চাস ঘরে?
বক্ষ কাঁপে তোর তরে।

(পাঁচ প্রহর)

এখানে অক্ষর বা মাত্রা বা স্বর কোনো নিয়মকেই আপাতত গ্রাহ্য করা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' থেকে কয়েকটি শব্দ এবং বাক্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় সেই নৃত্যনাট্যের ছাঁচেই পঙ্‌ক্তিগুলি রচিত, তা হলেও যেন সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। নাচগানের সঙ্গে যা

উপযুক্ত তাকে কবিতা আখ্যা দেব কেন? গদ্যে হোক, পদ্যে হোক, কবিতাকে টেনে টেনে পড়া স্বরের উপর নির্ভর করলে চলবে না এবং তাকে আবৃত্তির যোগ্য হতেই হবে। আর এ-কথা যদি স্বীকার করি, তা হলে যেখানে সেখানে যতিপাত, যে কোনো কারণেই হোক, ন্যায্য ব'লে বিবেচিত হবে না এবং নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিকে দোষদুষ্ট না বলুন, অনেকেই বলবেন এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার বাহুতে হৃদয়ে তনু-অতনু
তোমার বাহুতে ধরেছি ইন্দ্রধনু
(বারোমাস্যা)

ম্যামথ ছুটেছে চারিদিক
ঝড় যেন এক, বেগ তার
প্রাকৃতিক, ও অমানুষিক।
(বহুবড়বা)

মধ্যখণ্ডনের মজাটা যেন মাঠে মারা গেছে, ছন্দ বজায় রেখে পড়তে গেলে 'তনু অ' এবং 'ও অ' উচ্চারণ করতে হবে। ছন্দ যদি আবেগের চলচ্ছক্তিকে উৎসাহিত না করে, তা হলে তার খাতিরে এই বিকৃতিকে মেনে নেব কেন? অবশ্য মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই উচ্চারণ-বিকৃতিটা আজকাল এত বেশি চালু হয়েছে যে এটাকেই অনেকে কৃতিত্ব ব'লে মনে করছেন। বিষ্ণু দে তা নিশ্চয়ই করেন না, তবে আশঙ্কা হয় পরিশ্রমকে এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা, তাৎক্ষণিক আবেগের প্রেরণায় গা ভাসিয়ে দেবার নেশা, তাঁর ইদানীংকার কোনো কোনো ফেনানো রচনায় প্রকট হ'য়ে উঠছে, এমন কি অক্ষরবৃত্তেও। একটা নমুনা দিচ্ছি।

কমলে কামিনী কিম্বা নটরাজ নাচে পায়ে দলে
শতদল চিত্ত শত সহস্র হৃদয়ে হাহাকার।
মেলে না পার্বতীপরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে
(বারোমাস্যা)

শেষ লাইনে 'রে' এবং 'এ', অর্থাৎ, দুটো পরনির্ভর 'এ', পাশাপাশি থাকায় শুধু যে উচ্চারণের বিকৃতি ঘটেছে তাই নয়, ছন্দেও বেতাল ভর করেছে। পূর্বে

উদ্ধৃত 'পাহাড়ে পাহাড়ে এ' পঙ্‌ক্তির 'এ', মাত্রাবৃত্তে লেখার দরুন যদিই বা ভার সইতে পেরে থাকে, এখানে তা পারেনি। সামান্য পরিশ্রম করলে এই ত্রুটিকে বোধ হয় এড়ানো যেত। তবে এমনতর অসতর্কতার নিদর্শন এই গ্রন্থে এত বেশি আছে যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হ'য়ে যাবার সম্ভাবনায় আমি আর দুটি মাত্র উদাহরণ উপস্থিত করছি।

তুমি ভাবো প্রৌঢ়ে দেবে পা হে শুষ্ক শ্রদ্ধেয় পুরুষ (টাইরেসিয়স)
আমার স্বপ্নও অপরিসীম (ক্লান্তি নেই)

'পা হে' নিশ্চয়ই বাক্যটিকে খোঁড়া ক'রে দিয়েছে। আর 'স্বপ্ন' শব্দটির সঙ্গে 'ও' যোগ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি? অ-কারান্ত বা ও-কারান্ত শব্দের সঙ্গে 'ও' যোগ দিলে সন্ধি ক'রে পড়বারই ঝোঁক হয়, ফলে শূন্যই যোগফল থাকে। কিন্তু বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক রচনায় 'ও' বর্ণটির এই উদ্দেশ্যঘাতী ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই, যেমন, 'যম-ও 'নেয় না', 'নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়' ইত্যাদি। 'সন্দেহ ও ভয়' দ্রুত পড়া শক্ত, নাকি আমারই জিহ্বার জড়তা বুঝতে পারছি না।

সম্প্রতি একই কবিতায় হঠাৎ বিভিন্ন ছন্দের আমদানি করা বিষ্ণু দে-র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার ভয় হয় কবির খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা অথবা আপাতবৈচিত্র্যের সন্ধান প্রয়াস ছাড়া এগুলির পিছনে আর কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' নামক দীর্ঘ কবিতাটিতে যেমন সামগ্রিকভাবে সমস্ত রচনাটির ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়োজনে একটির পর একটি ছন্দ আত্মপ্রকাশ করেছে, বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে তা হয়নি। ফলে পাঠক একটি মূল স্বর খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েন। এবং ভাবসংগতি হারিয়ে কবিতাও শিথিল হ'য়ে যায়। বিষ্ণু দে-র সাম্প্রতিক কবিতার এই শৈথিল্যপ্রবণতা তাঁর অনুগামীরা অনায়াসেই নকল করেছেন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের ফেনানো ফাঁপানো পদ্য এবং মণীন্দ্র রায়ের বক্তব্যবর্জিত আঙ্গিকসর্বস্বতার জন্য বিষ্ণু দে-ই সম্ভবত দায়ী। আক্ষেপের বিষয় অনুকারকদের কাছে কবির মনোবৈভব একেবারেই ব্যক্ত হয়নি।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধারে'র কয়েকটি কবিতা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। কিন্তু কোথাও-কোথাও কবি ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করেছেন ব'লে মনে হল। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

> শিবঠাকুরের আপনদেশে সদাগরের তক্তায়
> চাপালি না রে—দুপারে গঙ্গা, ডরাবি নাকি তাই বান,
> সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় ?
>
> (বালাদ্ : লুই আরাগঁ-র জন্য)

পড়তে হয়তো অসুবিধা হয় না, কিন্তু 'চাপালি না রে' এবং 'দুপারে গঙ্গা'—দুটোতেই এক মাত্রা ক'রে বেশি আছে ব'লে আশঙ্কা হয়। 'আগামীবারে সমাপ্য' নামক কবিতাটিও স্বরবৃত্তে শুরু হ'য়ে 'হঠাৎ এ গ্রামে ছুটি জীবন দিয়ে যুঝি'-তে মাত্রাবৃত্তের মোহে চরিত্র হারিয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে স্বরবৃত্ত ছন্দে এই ধরনের স্বাধীনতা বিষ্ণু দে ছাড়াও আরো অনেকে নিয়েছেন, জীবনানন্দ দাশ তো প্রচুর, বুদ্ধদেব বসুও। শেষোক্ত জন লিখেছেন :

> কাকের রূপে অবাক হ'য়ে তাকান যখন ;
> কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
> হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
> পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে
>
> (কবিমশাই : শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর)

এখানেও 'পুরোনো লাইন' পর্বে, কড়া নিয়ম অনুসারে, এক মাত্রা বেশি আছে দেখতে পাই। স্বরবৃত্ত-যে চারমাত্রার ছন্দ, ছন্দশাস্ত্রের এই অ-আ-ক-খ-কেও যদি অগ্রজ কবিরা অমান্য করেন তা হলে আমরা নাচার। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর স্বরবৃত্তে কবিতা লেখার রেওয়াজ প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু স্বরবৃত্ত যেহেতু গ্রাম্য ছড়ার ছন্দ, তাই এর চর্চায় বাংলা কবিতাশৈলীর একটি মূল্যবান ঐতিহ্যের ধারা রক্ষিত হবে। সুধীন্দ্রনাথ একদা এই ছন্দে অনেকগুলি নিখুঁত কবিতা লিখেছিলেন : 'অর্কেস্ট্রা'র 'হিরণ নদীর বিজন

উপকূলে, 'খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম তোমার প্রেমে' এবং 'সংবর্তে'র 'তোমার আমার বাড়ির মধ্যে যবে' স্মরণীয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনিও আজকাল স্বরবৃত্তে তেমন উৎসাহিত নন। বিষ্ণু দে-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই জন্য যে তিনি স্বরবৃত্তের চর্চা ছাড়েননি। তার চাইতেও বড়ো কথা, গ্রাম্য ছড়ার অন্তঃশীল প্রাণময়তা আর সকলের তুলনায় তাঁর রচনাতেই সব থেকে নৃত্যময় হ'য়ে ওঠে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই। অন্য ভাবে সাজানো হলে এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা পাঠ করা সহজতর হ'ত। যেমন নিচের পঙ্ক্তিগুলি :

> জিপিও-র ঘড়ি কলের ঘোড়ায় চড়ে—
> ও কি উপোসীর শাপ ও কি ক্ষমাহীন কান্না ? **
> নীড় তোলে, জাগো, জাগায় নিঃস্ব উপবাসী,
> ও কে গান করে এ কি অশ্রুশুকানো কান্না
>
> (তিনটি কান্না)
>
> পাহাড়ের পাঁচ মাথায় খুল্‌ল চুল, নাকি ভ্রমর ?
> উন্মনা ওড়ে তেপান্তরের তৃষা—
>
> (বিল্ আর্চর-কে)

'ও কি', 'ও কে' এবং 'নাকি ভ্রমর' বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে থাকলে অথবা ওদের একটু দূরে সরিয়ে রাখলে মাত্রার সঙ্গে একাকার হ'য়ে ওরা অনর্থ বাঁধাত না। ভালো কথা : 'রথযাত্রা ঈদমুবারকে' নামক আট-দশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে 'আজ মনে হয় আমাদের শ্মশান স্বদেশে' নিশ্চয়ই ছাপার ভুল ?

অরুণকুমার সরকার

নরকে এক ঋতু : র‍্যাঁবো। অনুবাদক : লোকনাথ ভট্টাচার্য

(নাভানা : ২৲)

লোকনাথ ভট্টাচার্য নিজে স্থকবি এবং অত্যন্ত দুরূহ কবিতার অনুবাদে হাত দিয়ে তিনি, শুধু সাহস নয়, ক্ষমতারও পরিচয় দিয়েছেন।

গত শতাব্দীর ফরাসী কবিতার বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের মধ্যেও র‍্যাঁবোর জীবন ও কবিপ্রতিভা চমকপ্রদ। ইওরোপে খেয়ালি কবি সাহিত্যিকের কথা বহুকাল ধরে' শোনা যায়, আর্চ্ পোএট থেকে একালের সিং, রিল্‌কে, বিয়ার্স প্রভৃতি অনেকের কীর্তিতে ও জীবনে দেখা যায় বিকৃত বা খণ্ডিত সমাজের প্রতিক্রিয়ায় শিল্পসাধনার অদ্ভুত চেহারা। ভেবে দেখলে শান্ত শিষ্ট উইলিঅম শেকস্‌পিঅরের মধ্যেও দেখা যাবে প্রতিভার অনন্যসাধারণ খেয়ালিপনা: ঘোড়াবরদার গ্রাম্য যুবকটি কেন যে প্রায় তিরিশের মুখে লেখক হ'য়ে গেলেন এবং "টেম্পেস্ট" লেখার পরে লেখা একেবারে ছেড়ে দিয়ে অলডরম্যানের ভব্য জীবনযাত্রায় শেষ ক'বছর কাটালেন, সে বিস্ময় র‍্যাঁবোর বিস্ময়করতার চেয়ে কিছু কম নয়, যদিচ শেক্‌সপিঅর ইংরেজমাত্র এবং র‍্যাঁবো ফরাসী।

প্রসঙ্গত মনে হচ্ছে এ দুজনের আরো যেন মিল আছে। তাঁর অনেক তীব্র মুহূর্তে শেক্সপিঅরও এমন কবিতা লিখেছেন যা মানবজীবনের রূপ উদঘাটিত করে দেয় আবেগের বজ্রে বিদ্যুতে বা প্রখর রৌদ্রে বা হয়তো নিকষ রাত্রির অন্ধকারে, এবং সে সব লাইন র‍্যাঁবোর মতোই অমোঘ, অনিবার্য, পুনর্লিখনের বাইরে : অবশ্য শেকসপিঅর শুধু ভয়াবহ অন্তর্বিপ্লবের নরকে পাঁচ-ছ ঋতু কাটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর গভীরতর ও ব্যাপকতর কবিসত্তা মিরাণ্ডা, পর্ডিটা, মারিনাকেও খুঁজে পেয়েছিল আপন স্বভাবের বিশ্বে।

লোকনাথবাবু যে শেকসপিঅরের আত্মীয় যদিচ বালক ও অকালস্তব্ধ ফরাসী কবির আশ্চর্য কবিতার একটি গোটা বই আমাদের উপহার দিয়েছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতাটাই বড়ো কথা। ফরাসী আমরা কমই জানি, তাছাড়া র‍্যাঁবো তাঁর সংযমে, তাঁর অপরিবর্তনীয় রীতিতে কঠিনও বটে। লোকনাথ-

বাবুর নিষ্ঠা তাঁকে কৃতী করে' তুলেছে এই কঠিন অনুবাদের কাজে। ফরাসী কবিতার অনুবাদ বাংলায় মাঝে মাঝে যা দেখা যায় তার মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদগুলি বিশিষ্ট। সুধীন্দ্রবাবুর অনুবাদে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আলঙ্কারিক মানসের ভারি বক্তব্য-প্রধান গৌড়ী রীতি। এমনই স্বপ্রতিষ্ঠ তাঁর কবিস্বভাব ও রীতি যে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁর, ধরা যাক্, মালার্মের অনুবাদে মালার্মের কবিস্বরূপ মিলিয়ে যায়, থাকে আমাদেরই এক অগ্রগণ্য কবির পর্বে পর্বে নির্বাহে নির্বাহে অবলম্বী রচনা, যার বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিক নৈপুণ্য শ্রদ্ধেয়।

লোকনাথবাবুর নমনীয় কবিস্বভাবে বা আত্মদানের ক্ষমতায় র‍্যাঁবোর কবিস্বভাব কিছুটা অব্যাহত বলে মনে হল এবং আশা জানাই তাঁর হাতের আরো অনুবাদ-গ্রন্থের। অবশ্য এ গ্রন্থেও তিনি হয়তো আরো অবহিত হতে পারতেন, অনুবাদের প্রচণ্ড দুরূহতা সত্ত্বেও। ধরা যাক নরক প্রত্যয়টি, খৃস্টান নরকের ঐতিহ্য র‍্যাঁবোর মনের পিছনে, কিন্তু ভারতে আমরা পাপ বলতে যা বুঝি, তা খৃস্টানের পাপবোধ নয়। অনেক সময়ে লোকনাথবাবু কেন যে কথা পাল্‌টেছেন, তা আমি ঠিক বুঝি নি, পণ্ডিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন। যেমন প্রথমেই তিনি লিখেছেন : আগেকার দিনগুলোর : অথচ কথাটা একটি কথায় বলা বোধহয় : "জাদিস্" বা একদা, আদ্যিকালের অর্থেই একদা।

"একদা, যদি ঠিক স্মরণ থাকে, আমার জীবন ছিল এক উৎসবভোজ, যেখানে খুলেছিল সব হৃদয়, যেখানে বয়েছিল সব রকম সুরা। এক সন্ধ্যায় আমি নিলুম সুন্দরীকে কোলে। দেখলুম সে তিক্ত এবং তাকে আমি আঘাত করলুম।

আমি অস্ত্র ধরলুম ন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আমি পালালুম। ওগো জাদুকরী, হে দুঃখ, হে ঘৃণা, তোমাদেরই কাছে আমার সম্পদ রইল গচ্ছিত।

আমি পারলুম আমার মধ্যের প্রতিটি মানবিক আশা নিভিয়ে দিতে।

প্রতিটি আনন্দের উপরে আমি পড়লুম হিংস্র পশুর সতর্ক লাফে, টুঁটি টিপে টিপে ধরতে।

তেমনি Qu'il vienne, Qu'il vienne.

Le temps dont on s'éprenne এর বাংলা তিনি করেছেন :

হোক্ সময়, সময় তার হৃদয় প্রেমে পড়বে যার।

অথবা Au bourdon farouche

De trés sales mouches-এর বাংলা করেছেন : নিস্বনিত নোংরামির নেশায় বুঁদ মাছির ভিড়।

শেষ লাইটি তিনি লিখেছেন : এখন যদি চাই দেহের মধ্যে, মনের মধ্যে সত্যকে ধারণ করতে, সেই-দাবি ব্যর্থ হবে না আমার।

—et il me sera loisible de posséder la verité dans une âme et un corps—এবারে আমি বা আমার পক্ষে সম্ভব হবে বা পারব **এক মনে ও একদেহে সত্যকে ধারণ করতে** বা করা। দুটির ঝোঁক এক নয়। র‍্যাঁবো চেয়েছিলেন সত্যকে ধারণ করতে একটি মনে ও দেহে।

বিষ্ণু দে

কবিতা
আষাঢ় ১৩৬২
উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
ক্রমিক সংখ্যা ৮২

পৃথিবীলোক

জীবনানন্দ দাশ

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

লুপ্ত 'স্বাতী' পত্রিকা থেকে সংকলিত

ঘুচবে, অস্তিত্ব কিসে অর্থময় হ'য়ে উঠবে সে জিজ্ঞাসা উপস্থিত। আর তখন কবি তার উত্তর খুঁজেছিলেন প্রেমের মধ্যে। অস্তিত্ব তখনই অর্থময় হ'য়ে ওঠে হৃদয় যখন বলতে পারে :

তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি।

'বন্দীর বন্দনা'র বিশ বছর পরে লেখা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'। একদা যে-প্রেমের আশ্রয় ছিল নারীদেহে তা এই বিশ বছরের কবিতায় ক্রমে দেহের আশ্রয় ত্যাগ করেছে, হ'য়ে উঠেছে বিশুদ্ধ একটি ভাবনামাত্র, ভাষার অলঙ্কারে সাজিয়ে যে ভাবনাকে রূপ দিতে পারাই শিল্পীর এখন একমাত্র কাজ, তাঁর আনন্দ, তাঁর জীবনের মূল্য। সংশয় এ যুগে অনিবার্য। এমন কি এই তরুণ বয়সের কবিতাতেও প্রেমের কাছে তাঁর কোনো ভাবালু রোমান্টিক প্রত্যাশা নেই :

ননীর শরীর তব যেমন রেখেছে ঢেকে কুৎসিত কঙ্কাল,
তেমনি তোমার প্রেম কোন প্রেতে করিছে গোপন—
তাহা কহিবো কি ?
আমার দুর্ভাগ্য এই সকলি জেনেছি। ('প্রেমিক')

স্বপ্নভঙ্গের তীব্র-যন্ত্রণা নিয়ে তিনি শুধু যদি ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবিতা লিখেই শেষ করতেন তাতেও যুগের লক্ষণই থাকতো। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর মনের স্বভাব আস্তিকের। বিনষ্ট অতীত, শূন্যময় ভবিষ্যৎ নিয়ে, বর্তমানের বিভীষিকায় ডুবে মরা তাঁর আস্তিক্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিরোধী। সংশয় অতিক্রম ক'রে এমন কোনো ধ্রুবআশ্রয়ের তিনি সন্ধানী যার অস্তিত্ব খুঁজতে হ'লে কোনো প্রাচীন ধর্ম কিংবা আধুনিক দর্শনের কল্পলোক হাতড়াতে হয় না।

মরণের তিক্ত কালকূট
আমার চরম ভাগ্য।·· ···············
তবু যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়ের হিম সরোবরে—
সে শুধু তোমারি লাগি। ('আর-কিছু নাহি সাধ')

'কঙ্কাবতী'র কবিতাতেও নারীপ্রেমের এই অগাধ কুহকেরই বন্দনা। অনাত্মীয়

বিশ্বপৃথিবীর প্রাণের দরজা খুলে দেয় এই প্রেম, শিল্পীর কাজ সেই প্রেমের গান গাওয়া :

আঁকাবাঁকা মেঘ, একা বাঁকা চাঁদ, বাঁকারেখা চাঁদ, জলের নিচে,
আঁকাবাঁকা জল, একা বাঁকা চাঁদ, আকাশ ফাঁকা।
আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ'রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা জলে,
মেঘের রেখায়
একা বাঁকা চাঁদ চুপচুপ ক'রে কথা ক'য়ে যায় :
ফাঁকা আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝ'রে পড়ে সুর—'কঙ্কা। কঙ্কা!
কঙ্কাবতী।' ('কঙ্কাবতী')

এমনকি 'নতুন পাতা'তেও প্রেমই ইহলোকের স্বর্গদ্বার। পরিবর্তন দেখা দিয়েছে 'দময়ন্তী'র যুগে। নিঃসঙ্গতাই যে শিল্পীর বিধিলিপি একথা কবি এতদিনে মেনে নিয়েছেন, কেননা যে-প্রেম পৃথিবীকে স্বর্গ বানায় তার বাসা, জীবনই তাঁকে শিখিয়েছে, কোনো মরদেহেই চিরস্থায়ী নয়। নিছক বাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ নয় কোনো আনন্দের বৃত্ত। নিছক বাঁচার সঙ্গে শিল্পীজীবনের তাই জন্মান্তরের ব্যবধান। অতএব প্রার্থনা :

······আমার ইচ্ছার
চক্র থেকে মুক্ত করো সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পাহাড়,
মুক্ত করো জন্ম, মৃত্যু ; আমার প্রেমেরে
প্রেমেরেও মুক্তি দাও ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে—
('দময়ন্তী')

এ-প্রার্থনা, বলা বাহুল্য, শিল্পীর নিজের কাছেই নিজের প্রার্থনা। বহিরাশ্রয়ী মনের স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠার মধ্যে যে বেদনা আছে সেই বেদনাও নিস্পৃহ শিল্পীর কাছে কাব্যের উৎস। এ বিষয়ে কবি নিঃসংশয় হ'তে পেরেছেন 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে এসে। জীবনের নয়, ভাষার পথই শিল্পীর পথ, সঙ্গময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে একাগ্রচিত্তে ভাষার প্রতিমা গড়াতেই শিল্পীর পরমার্থ—কবিতার পর কবিতায় এই প্রত্যয়ের কথা তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন। শিল্পীর সঙ্গে

ত্রয়ী

অমিয় চক্রবর্তী

বোধিসত্ত্ব

কালো পাথরের শীতে অচল মূর্তির সারি জমে
প্যাসিফিক তীরে ম্যুজিয়মে।
স্থিতির ভগ্নাংশ কাল, বাক্‌-হারা ভাঙা দেহে ছায়
বিকীর্ণ মস্থণ বারান্দায়।
পণ্যের সংগ্রহে সখ্য, সযত্নে বিস্মৃত কক্ষে তারি
পর্যটক করে পায়চারি :
এরি মধ্যে অবিকার বোধিসত্ত্ব তুমি আছ ব'সে
নির্বাসিত স্তূপের প্রদোষে—
কারা এনে ফেলে গেছে এশিয়া-রাশির বস্তু কেনা,
নম্বর টিকিটে যাবে চেনা,
আদি যাত্রী আলোকের প্রয়াণ তোমার পদ্মচোখে
আজো নিমীলিত ধ্যানলোকে,
জটিল যুগের দৃষ্টি হঠাৎ প্রস্তর-উজ্জীবনে
খুলবে কি এই অন্ধ ক্ষণে ?

মনাঙ্ক

মণিপদ্ম মণিমন্ত্র তুমি
ওঁ
ইলেকট্রনিক যন্ত্রে আজ
নেত্রকোণে বহু পূর্বী
ওঁ
নিয়ন্ত্রিত জলজ্বল'

ক্যাল্‌ডিয় নক্ষত্র দেখে মেঘের পালক
স্বচ্ছাকাশে
আদি রাশি সাংখ্য দৃষ্টি ওঁ ভারতীয়
উর্ধ্ব জ্যামিতিক কায়া মিশরের
শান্ত সূর্য চীন সমাঙ্কন
উত্তাল চিন্তন নীল আয়োনিয়ন্
কোথাও আরব লাল সমুদ্রের গাণিতিক
উজান লবণ-জলরেখা
ওঁ
তুমি সেই হৃদয়ের রত্নকোষ বেগ্‌নি রশ্মি
দিক্‌-নাবিক
পর্বতী তিব্বতী ওঁ
ধ্বনি ওঁ
দুরূহ আরব্ধ পথে
তোমার মুখের জ্যোতি পৌঁছিয়ে দেবে ॥

মহাঙ্ক

বাহিরে ট্রাফিকে প্রৈতি কিসের অন্বেষী
(জাগো জনদেব জনে জনে)
যুগের ঘর্ঘর ক্রমে বেশি।
সীমাভ্রষ্ট মনোঢেউ শানে মাথা কোটে
(জাগো জনদেব)
সংঘে সংঘে শক্তির সংকটে।
(জাগো জনতার দেব জনে জনে)
সৌধবন্দী লুব্ধতার শিল্প কারা দামী বিম্বে ঘেরে
—সাম্য সেও হন্য মন্ত্রে ফেরে—

(জাগো জনদেব)
জাতির দৌরাত্ম্য ক্ষোভ অশান্তির মানচিত্রে আঁকা
দেশে গ্রামে ওড়ে ছায়া-পাখা।
(জাগো জনতার দেব জনে জনে)
যে-প্রভব ঐশিতার মূল্যে বীর্য ঢালে
মহার্ঘতা যার মহাকালে
(জাগো জনদেব)
প্রলয়প্রস্তুতি দিনে আত্মাহুতি মত্ততায় কাঁপা
সে-দৃষ্টি যায় না তবু চাপা।
জাগো জনতার দেব জনে জনে
(জাগো জনদেব)
যে-আগুন দাহ নয়, দীপে দীপ্তি, সংদাহের দিনে
ঘরে ঘরে নিতে হবে চিনে
(জাগো জনদেব)
কৌশলীর কালো দ্বন্দ্বে আণব-বর্বর লগ্নে ভাবি
(জাগো জনদেব)
গড়া হবে কার ভস্ম দাবি।
(জাগো জনদেব জনে জনে)
যে-মৈত্রী ও-ভুরু ছোঁয়, তোলে শুভ্র করুণা তর্জানি
(জাগো জনদেব)
রুধির-প্রদিগ্ধ দিনে তারি মুক্তি গণি ॥
(জাগো জনদেব জনে জনে)

* নাভানা কর্তৃক প্রকাশিতব্য লেখকের 'পালা-বদল' গ্রন্থ থেকে

ইন্দ্রজা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যত নদী ছিল যত পাহাড়ের চূড়া থেকে খসা,—
যত না হ্রদের হৃৎপিণ্ড-জোড়া নাড়ী,
স্ফটিক, লোহিত, নীল, দুধ-শাদা তুষারের বশা,
মনে এনে সব-কিছু ডাকলাম কাকে তাড়াতাড়ি,
যেতে হবে ব'লে—কা'কে ডাকি ?

যতো দিক ছিল চোখে গণিতের মতো,
আকাশের দৃকে নীহারিকা-ইতস্তত,
পাতালের ঝিরঝিরে বালুর সরণি—
চুল-ছোঁওয়া পায়ে-দেওয়া বাসর-তরুণী
নামে ওঠে মনে—সব ফাঁকি।

সব ছেড়ে চ'লে যাওয়া এতো চুপচাপ !
গেলো তো কতোই আরো, নেমে গেলো সাপ
গরল-গমনে, স্মৃতি পলকের পরে নেই আর,
তেমন আমার যাত্রা সুপ্তির সমুদ্রে অনিবার,
পাইনে তোমায়, ফিরে আসি।

তুমিও তপস্যা ছেড়ে গেলে যদি তৃষ্ণা রাখি কোথা।
দেবে আর কোন বুক আলাপন-স্রোতা
সুপানীয় বারিধারা কণ্ঠে নিতে ফের জন্মান্তরে ?
দেবে যদি বলে কেউ, ফিরি তবে ঘরে,
ফিরে তোমাকেই ভালোবাসি ॥

গুপ্তচর মৃত্যু

বিষ্ণু দে

তোমার অভাবে বেঁচে আছি
নিত্যই অভাব
মেঘের যেমন রৌদ্র প্রতিদিন,
কখনও কখনও অবশ্য শ্রাবণ আসে
তাতায় সওয়ার কখনও বৈশাখী
ভাদ্রের কিঙ্খাবে হাসে কখনও বা হালকা আশ্বিন
কখনও পৌষের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

জানি আছ, সেই ঘর আছে,
আজ-ও উঠানে নিমগাছে আলোছায়া ধরো,
দালানের কোণে সেই আরামকেদারা পাতা,
মাথা ধুয়ে মেল এলোচুল
আর ভ্রমরের গান করো।
রক্তের স্বভাবে তবু থরোথরো তোমার অভাব,
মেঘের যেমন রৌদ্র কিংবা শিকড়ের
যেমন হাজার শাখার পাতার স্তব্ধতার এবং ঝড়ের।

তাই কি করে না ভয় যতোই বয়স
চলে এক অর্থহীন প্রাকৃতিক অন্তিমের দিকে ?
এই তো তোমার ঘর, তোমার আস্‌বাব
তোমারই সকাল সন্ধ্যা, চারদিকেই অনুপম তোমার প্রভাব,
তবুও অভাব, একটি মানুষ জানে আরেকের,
সদাই অভাব স্বভাবের হাড়ে হাড়ে মেঘে রৌদ্রে
রৌদ্রেঝড়ে শিকড়ে শিকড়ে।
প্রতিদিন গুপ্তচর মৃত্যু যাই দেখে ঠেকে শিখে॥

সনেটগুচ্ছ

বুদ্ধদেব বসু

কোনো কুকুরের প্রতি

আমারে দিয়ো না দৃষ্টি।   বিচ্ছেদে ভ'রে আছে মন।
যত গাঁথি মালা, তত স'রে যায় দূর আর কাছে।
বহুদিন-প্রতিশ্রুত আজ আর কালের চুম্বন
অবশেষে ঠেকে যায় স্বচ্ছ এক ক্ষমাহীন কাচে।

বরং, কখনো যারা কাগজের নৌকোয় চ'ড়ে
দেয়নি সাগর-পাড়ি, বেছে নাও তাদেরই কাউকে ;
পাবে বাড়ি, মাংস-ভাত ; গন্ধের অন্ধকারে ঢুকে
ঘুমোবে, দুপুরবেলা, মেয়েদের হাতের আদরে।

যাবে না ?   তবে কি ভাবো সমানুকম্পনে
উঠবো হঠাৎ বেজে আমি এক অদ্ভুত বাঁশরি,
এঁকে দেবো তোমার হরিণ-চোখে স্মরণের ছবি ?

...কেবল অর্ধেক ঠিক।   জানি আমি, স্বর্গের অপ্সরী
তুমি, শাপভ্রষ্ট।   কিন্তু সেই শাপের মোচনে
আমার আসেনি ডাক।   এখনো যথেষ্ট নই কবি।

নির্বাসন

তোমার নরম হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারি না।
এত ছোটো, এমন দূরত্বে ভরা, অথচ কেমনে
ছড়ায় ফুলের রেণু, স্পর্শময়, এই নির্বাসনে,
ব'য়ে যায় তৃষ্ণার পাথর ফেটে আঁধার ঝরনা—

অরণ্যে, হারিয়ে পথ, চোখে যারে দ্যাখে না পথিক,
কানে শোনে প্লাবন, চুম্বন, অবিরাম। বুঝিনি এমন হবে
বিরাট পরিশ্রম শেষ হ'লে। বহু কষ্টে, গতানুগতিক
গ্রামের আমের বন পার হ'য়ে, হিমেল গৌরবে

অবরোধ গড়েছি আকাশ ছুঁয়ে ; টাক-পড়া পিছল দেয়াল,
সাতপল্লা কাঁটাতার, ভাঙা কাচ বিলোল দাঁতের মতো ;—
ভয় নেই, ক্ষমা নেই, নেই কোনো ঋতুর করুণা।

কিন্তু এই দুর্গ আজো টিঁকে আছে, না-ব'লে, অনবরত
তুমি তারে ছুঁয়ে আছো ব'লে। নির্মাণের অসীম জঞ্জাল
তোমারই অভাব দিয়ে ভরা। তারে ছাড়াতে পারি না।

রাত তিনটের সনেট

(১)

শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আচ্ছন্ন আলো ; হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার ;
অথবা অন্তর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়

দূরের বন্ধুকে লেখা। যীশু কি পরোপকারী
ছিলেন, তোমরা ভাবো ? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির
মাননীয়, বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির
মোহগ্রস্ত সভাপতি ? উদ্ধারের স্বত্বাধিকারী

ব্যতিব্যস্ত পাণ্ডাদের জগঝম্প, চামর, পাহারা
এড়িয়ে আছেন তাঁরা উদাসীন, শান্ত, ছন্নছাড়া।
তাই বলি, জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে ;

হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

(২)

এ নয় তোমার জন্য। শুধু বই আজো আছে খোলা।
যারা হাসে, মন্ত্র পড়ে, টুংটাং চায়ের টেবিলে,
তারাই, শোবার আগে, পড়শির আলো নিবে গেলে,
হ'য়ে যায় ভাঁড়ার-ঘরের ব্যস্ত ইঁদুর, আরশোলা ;

যুদ্ধ করে, খুঁটে খায় ; নিমন্ত্রণে অভ্যর্থনার
অস্তিত্ব না-জেনে শুধু উচ্ছিষ্টেরে ভাবে ইতিহাস।
এ নয় তোমার জন্য। ফুল, ফল, ঋতু, বারো মাস
ঘুরে-ঘুরে যা বলে তা শিখে নাও। ঠিকানা রেখো না আর

কোনোখানে ;—বাষ্পলীন, ধবল, সরল ডিসেম্বরে
বিস্মৃত, চক্রান্তকারী, নিরুদ্দেশ বসন্তের মতো
যাও দূরে, দেশান্তরে, সাগরের শেষ দ্বীপান্তরে ;

অনামী অসাবধান, চেষ্টাহীন, অপ্রতিহত,
নতুন ভাষায়, শোনো, নক্ষত্রের দীপ্ত মদিরায়
চরাচর, চিরকাল নিস্বনিত তোমার শিরায়।

স্বর

ঠোঁট নড়া দেখেছি প্রথমে। বেহালায় পড়েনি প্রথম টান,
যবনিকা আলোয় শিউরে ওঠে। জয়ের উল্লাসে
টুকরো এক দিগন্ত রটিয়ে দেয় সকল আকাশে,
মুহূর্তে-মুহূর্তে আরো লাল হ'য়ে, চুম্বনের চঞ্চল পুরাণ—

অর্থাৎ, নতুন দিন, হঠাৎ যৌবন ফিরে পাওয়া।
তারপর কণ্ঠস্বর। কান, প্রাণ, বীজের ভাণ্ডার
ভ'রে যায় মিনারে, মন্দিরে, যেন গভীর ঘণ্টার
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ছিনিয়ে, দূতের মতো হাওয়া

সিক্ত করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত—দুধের ফোঁটায়।
কিছু না, কেবল হাওয়া; কম্পন, ভঙ্গুর ঢেউ, অথবা প্রমাণহীন
মনের শিশুর কান্না ঠেলে ওঠে ঘুমের বোঁটায়।

জানে, সে অপরাজেয়। কিন্তু, হে দম্পতী, যারা আজ
সিল্কের লেপের তলে নাগরিক আলিঙ্গনে লীন—
জানো কি, বন্দর ছেড়ে এইমাত্র চ'লে গেলো সে কোন জাহাজ?

মরুপথ

যতক্ষণ ফেরার উপায় ছিলো, কিছুই বোঝেনি।
তারপর চেয়ে ছাখে, শুধু বালি; দিগন্তের নেই অন্তরাল;
মাকড়শা, কাঁটার ঝোপ, দু-একটা উটের কঙ্কাল;
ভাষার পল্লীরে ঘিরে আকাশের বিরাট বন্ধনী

ক্রমশ, ধর্ষণে, সব ভাবনারে ভস্মে পরিণত
ক'রে দিয়ে স্থির হয়। রৌদ্র নেয় রান্না ক'রে তার
মাংস, মেদ, যেন তারে জন্ম দেবে পাতালে আবার;
আর তার তৃষ্ণা চলে পিছে-পিছে, একপাল কুকুরের মতো।

অবশেষে, যখন মরীচিকার পর্দা ছিঁড়ে, দেখা দেয় প্রথম খেজুর,
বালিতে কালোর বৃত্তে প্রসবের মৃদু অনুমান—
হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ে, আঙুল পাগল হ'য়ে খুঁড়ে তোলে জল:

অল্প জল, তৃষ্ণার যথেষ্ট নয়। তবু স্পর্শ নতুন ঋতুর
বীজাণু ছড়িয়ে দেয়; সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফ'লে ওঠে ফল;
এবং দর্শনস্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার আজান।

স্মৃতির প্রতি

(১)

তোমারেই দেবী ব'লে মানি। কিছু নেই, যা তোমার নয়।
তা-ই তো তোমার ঘুম, যাকে বলি আরম্ভ, কারণ;
চলে সে গোপনে, তার দিগন্তেও নেই জাগরণ;
কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের বিস্ময়,

পৃথিবীর মাটিরে মদির ক'রে চুমো খায় উজ্জ্বল আঙুর।
তাই পট শূন্য প'ড়ে থাকে, পাথর নিঃসাড়, বীণা
শুধু বিসংবাদী, যতক্ষণ, তটের উদ্বেল ঢেউ পেরিয়ে, তুমি না
শেখাও সাগর-যাত্রা, যুযুধান রাত্রি আর দিনের বন্ধুর

পথ পিছে ফেলে, নিয়ে যাও ত্রিকালের শান্ত সমতলে,
দূর থেকে আরো দূরে, জন্মান্তরে, প্রাগৈতিহাসিক
নীলিমায়—যেখানে, মাতার গর্ভে, নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলে

মানবের ভাগ্য আর অফুরান ঐশ্বর্য তোমার।
আঁধার তোমার স্বত্ব, কিন্তু তা-ই আলোর অধিক;
তুমি যা অলস হাতে ফেলে দাও, কানাকড়ি মূল্য নেই তার।

✓ (২)

'গাছ', 'ফুল', 'পুকুর', 'মেঘলা দিন'—এরা শুধু গণিতের কঠিন সংকেত
হ'য়ে প'ড়ে থাকে: তারপর তুমি দাও পর্দা তুলে; চেয়ে দেখি, দৃষ্টিও তোমার।
গা বেয়ে আঙুরলতা বেড়ে ওঠে, হঠাৎ হলুদ ফুলে দিগন্তের খেত
আকাশ রাঙিয়ে দেয়। এইভাবে, পৃথিবী, নক্ষত্র, সব করি অধিকার।

যুদ্ধ বাধে, গৃহী ধায় দেশান্তরে, সমুদ্রের তীরে-তীরে ভ্রাম্যমাণ;
মুহূর্তে হারিয়ে যায় চিঠি, ছবি, পাণ্ডুলিপি, শীতল ভাণ্ডার;
কিন্তু তবু তোমারে সে হারাবে না, ধ্রুবতারা তোমার নিশান
কখনো যাবে না অস্ত দিগন্তরে; সে-ই সব সঞ্চয়ের অন্তঃসার।

ঋজু পথে আমাদের চলা। পিঁপড়ের কর্মঠ মিছিল
ব'য়ে চলে প্রকাণ্ড পোকার শব, শৈশব, যৌবন পার হ'য়ে;
এমনকি যুগ থেকে যুগান্তরে টেনে নেয় নথিপত্র, স্বাক্ষর, দলিল:

তাই ক্রমে বুড়ো হ'য়ে ঝ'রে পড়ে মানবের অগণ্য সন্ততি।
কিন্তু কেউ ফিরে যেতে চায় যদি, তার পথ তোমারই হৃদয়ে—
কেননা কেবল তুমি জানো সেই সূক্ষ্ম, বাঁকা, চেষ্টাহীন গতি।

(৩)

আমাদের পরিবর্তনের
অর্থ: এই দেহ ম্রিয়মাণ;
দ্যুতিময় জন্তুর উত্থান
তাও শুধু পিতৃহননের

নান্দীপাঠে ফাল্গুন ফুরায়।
কৈশোরের মঞ্জুল মুখোশ
ঢেকে রাখে জরার আক্রোশ;
প্রগতির দৃপ্ত পাহারায়

অবিরাম চলে অধঃপাত।
বাঁচে শুধু, যা তোমার হাত
চিরকাল মূর্ছার কন্দরে

রেখে দিয়ে, করে উন্মোচন—
রূপান্তর থেকে রূপান্তরে—
পৃথিবীর প্রথম যৌবন।

কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: 'কবিতার অনুবাদ পোড়ো না, ওতে কিছু পাওয়া যায় না।' গুরুদেবের এই নির্দেশ আধুনিক কবিরা পালন করেননি; তাঁরা, অনুবাদ-কবিতার অনলস ভোক্তা তো বটেই, উপরন্তু নিজেরাও অনুবাদক। কবিতার অনুবাদ সম্ভব কি সম্ভব নয়, এই মস্ত বড়ো অর্থহীন তর্কটা টপকে পার হ'য়ে আমি একবারেই বলতে চাই যে কবিতার অনুবাদও একটি সপ্রাণ, সংক্রামক, মূল্যবান সাহিত্যকর্ম, এবং কখনো-কখনো—কবি আপন ভাষায় কবি হ'লে—তা সৃষ্টিকর্মেরও মর্যাদা পায়। যাকে লেখা বলে, তাও তো এক রকমের অনুবাদ—ভাষার সাহায্যে চিন্তার অনুবাদ; কেউ-কেউ একাধিক ভাষায় একই চিন্তার অনুবাদ করেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলা আর ইংরেজি কবিতায়—আর নিজের ভাবনার অনুবাদ যে-সব মানসক্রিয়ার ফলে ঘ'টে থাকে, অন্যের ভাবনার অনুবাদেও তার ব্যতিক্রম হয় না। এবং, অনুবাদে 'কিছু পাওয়া যায় না'—এই উক্তির বিরুদ্ধেও আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য আছে: আমরা অনেকেই ও-বস্তুর মধ্যে সারা জীবনের সম্পদ খুঁজে পেয়েছি, যেমন কীটস পেয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষার হোমার-কাব্যে। ইটালিয়ানে দান্তে পড়াটাই আদর্শ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এই আদর্শের প্রতি অন্ধ আসক্তিবশত আমরা যদি বারে-বারেই নতুন ভাষা শিখতে যাই, তাহ'লে—যদি-না কেউ মেধা এবং অধ্যবসায়ের গৌরীশৃঙ্গ থাকেন—সেই চেষ্টার পরিণতি ঘটবে বিশ্বসাহিত্যের প্রত্যাখ্যানে। কার্যত দেখা গেছে, আমরা যারা রুশ, জর্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, চৈনিক প্রভৃতি ভাষা জানি না, আমরা সে-সব ভাষার কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পারি দুটি-তিনটি অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে; জানতে পাই কবির মন, কী তিনি বলতে চেয়েছেন, হয়তো তাঁর ভঙ্গিরও খানিকটা; মূলের অনেক রমণীয়তা নিশ্চয়ই বাদ পড়ে, কিন্তু—যদি সে-কবি শুধু শব্দের বেসাতি না-ক'রে কিছু ব'লেও গিয়ে থাকেন—মোটের উপর এমন কোনো দামি জিনিশ পাওয়াই যায়, যা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যে নেই, আর যার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই সাহিত্যের ঋদ্ধির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

এই জন্যে এজরা পাউণ্ড বলেছিলেন যে অনুবাদও এক রকমের সমালোচনা। সাহিত্যের ভালো-মন্দের মাপ বিতর্কের দ্বারা না-বুঝিয়ে, প্রত্যক্ষতর উপায় হ'লো উৎকৃষ্টের উদাহরণ উপস্থিত করা—সম্ভব হ'লে নিজে লিখে, নয়তো অনুবাদের সাহায্যে। ইতিহাসের কোনো-কোনো সন্ধিক্ষণে এক-একটি অনুবাদ-গ্রন্থ সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে; এবং আজকের দিনেও, ইওরোপের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে পরস্পরের ভাষাচর্চায় আগ্রহ যেমন বেড়েছে, পারস্পরিক অনুবাদের স্রোতও স্ফীত হয়েছে সেই পরিমাণে। এর মধ্যে একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে কবিতার অনুবাদ, পুরোনো কাব্যের নতুন অনুবাদ, একই কাব্যের দুটি-তিনটি সমসাময়িক বিভিন্ন রূপায়ণ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন, তাঁরা হয় নিজেরা কবি, নয় 'প্রেমিক'—অর্থাৎ, খাঁটি amateur, নয় তো রসজ্ঞ পণ্ডিত—কিংবা শুধুই পণ্ডিত। শেষোক্ত সম্প্রদায় বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো; কিন্তু অন্যদের মধ্যে কোন দলের কৃতিত্ব বেশি তা নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। আমরা সেই তর্কের মধ্যে যাবো না; কিন্তু—পণ্ডিত এবং প্রেমিক অনুবাদকের মূল্য, উপকারিতা ও অপরিহার্যতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার ক'রে নিয়েও এ-কথা বলবো যে কবিতা বিষয়ে সবচেয়ে ফলদ মন্তব্য যেমন কবিরাই করতে পারেন, তেমনি তার অনুবাদেও প্রথম এবং সহজ অধিকারী তাঁরাই। যদি কখনো কোনো কবির মধ্যে রুচি, অবসর ও হার্দ্য অনুকম্পার যোগাযোগ ঘ'টে যায়, তাহ'লে তাঁর হাতে যে-অনুবাদ বেরোবে, সেটা হবে নির্মাণ নয়, সৃষ্টি; শুধু কোনো বিদেশী কাব্যের প্রতিলিপি নয়, মাতৃভাষাতেই নূতন একটি স্থায়ী সংযোজন, যা থেকে অন্য কবিরা শিখতে পারবেন, এবং—হয়তো—কারো-কারো রচনার ধারা বদলে যাবে। এই রকম সৃষ্টিশীল কবি-অনুবাদক আমাদের মধ্যে দু-জন অন্তত আছেন: বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; এবং সম্প্রতি একখানি অনুবাদ-গ্রন্থেও বাংলা কাব্যের সমৃদ্ধি ঘটলো: সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রতিধ্বনি'।

* প্রতিধ্বনি: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সিগনেট প্রেস, ২৷৷০

২

'প্রতিধ্বনি' বিষয়ে আলোচনার আগে অনুবাদ বিষয়ে আরো একটু ব'লে নেবো—অনুবাদ, তার সঙ্গে অনুবাদকের সম্বন্ধ। অন্যেরা অনুবাদ করেন পরোপকারের প্রেরণায়—চান প্রিয় লেখকের প্রচার, দেশজ সাহিত্যের উন্নতি—কিন্তু কবির পক্ষে এই কর্ম তাঁর পরম স্বার্থের সংলগ্ন ; শিক্ষা, সংযম, আত্মশোধনের জন্য উৎকৃষ্ট একটি উপায়। রিলকে, রোদ্যাঁকে দেখে, এই ভেবে আক্ষেপ করেছিলেন যে সাহিত্যে কোনো কায়িক শ্রমের অংশ নেই, মাসের প্রতিটি দিন উদয়াস্ত তা নিয়ে প'ড়ে থাকা যায় না—যেমন কোনো ভাস্কর তাঁর পাথর নিয়ে থাকতে পারেন। ভাস্করের পক্ষে যা 'হাতের কাজ', সাহিত্যিকের পক্ষে তা কী হ'তে পারে তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন রিলকে : চেয়েছেন ডেনিশ ভাষা শিখতে, কোনো-একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করতে (পারেননি), মাঝে-মাঝে অনুবাদও করেছেন। কবিমাত্রেই জানেন, কোনো-একটি কবিতা লেখা শেষ ক'রে ওঠার পর সেটা নকল করা কত আরামের, কত ভালো লাগে তার প্রুফ দেখতে, স্নিগ্ধ মনে হয় এমন কোনো কাজ যা নতুন রচনা নয়, কিন্তু তারই সম্পৃক্ত। আর এর মধ্যে অনুবাদকেও গণ্য করবো আমরা, সাহিত্যের মধ্যে কায়িক বা যান্ত্রিক শ্রমের প্রতিরূপ হিশেবে একেই বলবো সবচেয়ে উপকারী। যান্ত্রিক বলতে এ-কথা বোঝাতে চাই না যে 'বসলেই' অনুবাদ করা যায় ; ভালো অনুবাদও দৈবাধীন, কোনো-এক রকম প্রেরণার মুখাপেক্ষী, কিন্তু অনুবাদে চিন্তার অংশটা অন্যে জুগিয়ে দেয় ব'লে, কবি তাকে প্রায় একটা প্রকরণগত সমস্যায় পরিণত করতে পারেন, অনেক বেশি নির্ভর করতে পারেন ভাষা, ছন্দ, মিল ইত্যাদিতে তাঁর পরিশ্রমী দক্ষতার উপর। যদি এ-জন্যে তাঁকে জর্মান আর সংস্কৃত অভিধান ঘাঁটতে হয়, পড়তে হয় মূল লেখকের জীবনী অথবা সময়ের ইতিহাস, এ-সব কাজ তেমনি তৃপ্তিকর হবে তাঁর পক্ষে, যেমন ভাস্করের পক্ষে বলবিদ্যা। যখন স্বকীয়ভাবে বলার কথা খুঁজে পাওয়া যায় না (এমন সময় সব কবিরই আসে), তখন পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তির বদলে অনুবাদকর্মই শ্লাঘনীয় ;

তাতে চর্চার এবং ব্যায়ামের সুযোগ মেলে, 'হাত' ঠিক থাকে, লেখক একটা নিয়মের অধীন হ'য়ে অপচয় থেকে রক্ষা পান, এবং এই সচেষ্টতার ফলে হয়তো কবিতার প্রকৃতি বিষয়ে একটু তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি, কলাকৌশলে আরো নিশ্চিত একটু নৈপুণ্য তাঁর আয়ত্তে আসে—যে-উপার্জন তিনি সুদে খাটাতে পারেন পরবর্তী স্বকীয় রচনায়।

শূন্য প্রহর ভ'রে তোলার জন্য, অথবা খেলাচ্ছলে, কবিরা অনেক সময় অনুবাদ ক'রে থাকেন ; কিন্তু এর সত্যিকার প্রেরণা জেগে ওঠে তখনই, যখন কোনো বিদেশী কবির সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা অনুভব করেন, কিংবা কোনো অপেক্ষাকৃত গৌণ কবিতাও হঠাৎ তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগে যায়। নারী হোক বা কবিতা হোক, ভালো লাগলেই মনের মধ্যে একটা বেগ জেগে ওঠে, আর সেই বেগের পরিণতি সুখদাকে দখল করার আকাঙ্ক্ষায়। এবং, নারীর মতোই, কবিতাও দাবি করে যে তাকে 'পেতে' হ'লে নিজেকে আমরা মিলিয়ে দেবো তার সঙ্গে, নিজের একটা অংশ দান করবো তাকে। এই পরম মিলনের নামই অনুবাদ। প্রিয় কবিতা বার-বার পড়তে পারি আমরা, কণ্ঠস্থ রাখতে পারি ; কিন্তু অনুবাদের চেষ্টা করামাত্র তার সঙ্গে যে-অন্তরঙ্গতা জন্মায়, অন্য কিছুর দ্বারাই তা সম্ভব হয় না ; কবিতাটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখতে হয় তখন ; বাক্য, পংক্তি, স্তবকের বিশ্লেষণের ফলে নতুন ক'রে তাকে উপলব্ধি করি এবং অনুবাদ শেষ ক'রে উঠে মনে হয় কবিতাটি এতদিনে 'আমার' হ'লো, কিংবা আমার একটা অংশ মিশে গেলো আমার সুদূরবর্তী প্রিয় কবির মধ্যে। তাঁরই কবিতার অনুবাদে আমাদের আগ্রহ জাগে, যাঁর মধ্যে যেন নিজেরই একটা সম্ভাবনার উন্মীলন দেখতে পাই, যাঁর বিষয়ে একবারও অন্তত মনে-মনে বলি—'আহা, আমি যদি উনি হতুম !' কিন্তু এই ঐক্যবোধের ফলেই মনের মধ্যে অন্য একটি ভাবও জেগে ওঠে : মাঝে-মাঝে এ-কথাও মনে হয়—'আহা, উনি কেন এ-কথাটি বললেন না !' অর্থাৎ, অনুবাদের শ্রমসূত্রে কবির নিজের ভাবনাও সজীব হ'য়ে ওঠে, কখনো-কখনো তাঁর ইচ্ছে হয় মূল কবিকে মুখোশের মতো ব্যবহার ক'রে ফাঁকে-ফাঁকে

নিজেরই কথা উচ্চারণ করবার। এবং, এই অবস্থায়, অনেক সময় রচনাটি হ'য়ে দাঁড়ায়, অনুবাদ নয়, অন্য একটি প্রতিযোগী কবিতা, সাহিত্য থেকেই যে সাহিত্যের জন্ম, এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই রকম চরম পরিণতি যখন ঘটে না, তখনও, অনুবাদের ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও, রং রেখার বিতরণের মাত্রা সমান থাকে না; যে-ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে তার নিজের আইন-কানুন জারি করে; যিনি অনুবাদ করছেন তাঁরও স্বকীয়তার সংক্রাম অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে ওঠে। এইজন্যে, কবি-অনুবাদক বিষয়ে পণ্ডিতি মহলে বড়ো একটি আপত্তি এই যে তাঁরা আক্ষরিক হন না, এমনকি, ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করেন, মৌলিক পংক্তি অনুবাদের মধ্যে চালিয়ে দেন, এবং মূলের কোনো-কোনো অংশ স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা ক'রে যান।

এই আপত্তির প্রধান লক্ষ্য এজরা পাউণ্ড, যিনি এ-যুগের ইংরেজি ভাষার সর্বাগ্রগণ্য অনুবাদক। মানতেই হয় পাউণ্ডের গলদ অনেক; তিনি সেক্সটাস প্রপার্টিয়াসকে মধ্যস্থ ক'রে প্রায় নিজের কবিতাই লিখেছেন (মিলিয়ে দেখলে বিচিত্র হাত-সাফাই ধরা পড়ে), এবং চীনে ভাষায় তাঁর জ্ঞান (শুনতে পাই) একটি বৃহৎ অভিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ-সব অভিযোগ মেনে নেবার পরেও এই প্রশ্নটি বাকি থাকে: ইংরেজি ভাষায় এমন কোনো রচনা আছে কিনা, যেখানে ঐ লাটিন কবির আর চীনে কবিদের আত্মা ওর চেয়েও সার্থকভাবে বিধৃত হয়েছে, কিংবা সেখানে খৃষ্টপূর্ব রোম আর প্রাচীন চীনের সামাজিক, নাগরিক ও কাব্যিক আবহাওয়া ওর চেয়েও জীবন্তরূপে সংহত হ'য়ে উঠেছে। আর এই প্রশ্নের উত্তরে—শত্রুকেও শেষ পর্যন্ত মানতে হয়—না, কোথাও হয়নি; মূল কবিরা আধুনিক ইংরেজি ভাষায় লিখলে যা হ'তো পাউণ্ড যেন ঠিক তা-ই সৃষ্টি করেছেন আমাদের জন্য, অথচ যাথার্থ্যের খাতিরে, 'যুগে'র প্রয়োজন, ভাষার ও ভঙ্গির যে-সব বৈশিষ্ট্য দরকার, তাও ঠিক-ঠিক মাত্রায় জোগাতে ভোলেননি। এই লক্ষণ-গুলোতেই তাঁর অনুবাদের বিজয়-ঘোষণা। আসলে, আক্ষরিকতার দাবিটাই অর্থহীন: ফরাশি ভাষায় ব'লে থাকে যে অনুবাদ জিনিশটা মেয়েদের মতো,

রূপসী হ'লে সতী হয় না, সতী হ'লে কুরূপা হয়। উভয় গুণের সমন্বয়কেই আদর্শ ব'লে মানতে পারি—এমন আদর্শ, যা বাস্তবে কখনো ধরা দেবে না, কেননা—একটু ভাবলেই বোঝা যাবে—'আক্ষরিক অনুবাদ' কথাটাই সোনার পাথরবাটির নামান্তর। কোনো কবিতার 'আক্ষরিক' মূর্তি শুধু সে নিজেই, সে এক ও অনন্য, অনন্তকালের মধ্যে ঠিক ঐ কবিতা আর-একবার সৃষ্টি হবে না। ছন্দের বিধান, ধ্বনির বিধান, বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও প্রকরণের বিধান—এই সমস্ত চীৎকার ক'রে ব'লে দিচ্ছে যে 'আক্ষরিক' ও 'অনুবাদ' এ দুটি সংজ্ঞা পরস্পর-বিরোধী, ভাষান্তরে নিতে গেলেই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন অনিবার্য—বিশেষ্য বদল হবে বিশেষণে, কিংবা বিশেষণ বিশেষ্যে, কথা বাদ যাবে, যোগ হবে, আগের লাইন চ'লে আসবে পরে, শব্দের অনুক্রম এক থাকবে না। এই পরিবর্তন সচেতনভাবেই সাধিত হ'য়ে থাকে, কিন্তু যথেচ্ছভাবে নয়; ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলার চাপে মৌলিক রচনাও আদি কল্পনার 'আক্ষরিক' অনুসরণ করতে পারে না, এবং অনুবাদও সেই একই নিয়মের অধীন। এ-অবস্থায় অনুবাদের উচ্চতম লক্ষ্য হ'তে পারে—(১) মূলের ভাব, বক্তব্য বা সংবাদের পরিবেশন, (২) চিত্রকল্প, ভাষার ভঙ্গি, ছন্দ, মিল ও স্তবকের বিন্যাস, অর্থাৎ সমগ্র রূপ-কল্পের অনুসরণ, (৩) মূল কবির দেশ ও কালের স্বাদসঞ্চার, এবং (৪) অনুবাদের ভাষায় একটি সুন্দর—অন্তত সুখপাঠ্য—নতুন কবিতার রচনা। অনুবাদের ভাষায় রচনাটি ভালো হবে, পাঠযোগ্য হবে—এই দাবিটাই সবচেয়ে জরুরি।

৩

(ক) That time of the year thou mayest in me behold,
When yellow leaves, or none, or few do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.

In me thou seest the twilight of such day,
As after sunset fadeth in the West,
Which by and by black night doth take away,
Death's second self that seals up all the rest.
In me thou seest the glowing of such fire,
That on the ashes of his youth doth lie
As the death-bed, whereon it must expire,
Consum'd with that which it was nourish'd by.
This thou perceiv'st, which makes thy love more strong,
To love that well, which thou must leave ere long.

(খ) আমার মাঝারে হের সংবৎসরের সেই কাল,
যখন পল্লব পীত, দুয়েকটি ঝোলে কি না ঝোলে,
হিমবায়ে কম্পমান শাখে শাখে বিবিক্ত করাল,
কীর্তন-আঙিনা-শূন্য, মধুক্ষরা পাখী গেছে চ'লে।
আমার মাঝারে দেখ সন্ধ্যারাগ গোধূলিলগনে,
সূর্যাস্তের পরে যবে দিন চলে পশ্চিমসাগরে,
আর ধীরে ধীরে কৃষ্ণ রাত্রি তাকে টানে আলিঙ্গনে,
মৃত্যুর দ্বিতীয় সত্তা, ঘুমে ঢাকে সবাকে আদরে।
আমার মাঝারে দেখ সেই বহ্নি দীপ্তশিখা যার
আপন যৌবনভস্মে জ্ব'লে যায় তবু লেলিহান,
যেন বা আপন চিতা জ্বালে যেথা মৃত্যু অনিবার,
জীয়ায় যা তাকে, সেই পুষ্টিতেই তার অগ্নিবাণ।
এ তো তুমি বোঝো, তাই ভালোবাসা প্রবল তোমায়,
অচিরে হারাবে যাকে দাও তাকে প্রেমের সৎকার॥

(গ) যে-ঋতু আমার মাঝে দেখো তুমি, তার নাম শীত,
পীত পত্র কতিপয় কাঁপে যবে হিমাহত শাখে,
যখন বিধ্বস্ত কুঞ্জে থেমে যায় বিহঙ্গসংগীত,
মূর্তিপরিগ্রহ ক'রে সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে।

সূর্য অস্তাচলে গেলে, যে-দ্বিধার অসুস্থ আভাস,
রাঙায়ে পশ্চিমে মেশে অচিরাৎ নিবিড় আঁধারে,
সে-বিষাদে সমাকীর্ণ দেখো আজ মোর চিদাকাশ;
মরণের সহোদর নিশি জাগে সুষুপ্তির দ্বারে।
আমার হৃদয়কুণ্ডে দেখো যেই বহ্নি ম্রিয়মাণ,
সে শুধু চিতাবশেষ, কৈশোরের ভস্মান্ত উৎসাহ;
একদা যে-হবি তারে দিয়েছিল অপর্যাপ্ত প্রাণ,
তারই আতিশয্যে বুঝি অনিবার্য আজ অন্তর্দাহ।
এ-দুর্দশা দেখে, কিন্তু দ্রুত বাড়ে তোমার প্রণয়;
মানুষ তারেই চায়, যারে শীঘ্র ছেড়ে দিতে হয়।

এই তিনটির উদ্ধৃতির মধ্যে (ক)-এর পরিচয় অনাবশ্যক; (খ) ও (গ)-এর লেখক যথাক্রমে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। মূলের সঙ্গে অনুবাদের, এবং দুটি অনুবাদের পারস্পরিক তুলনা করলে এই দুরূহ কাজের প্রক্রিয়া বোঝার সুবিধে হ'তে পারে—কোথায় তার বিপদ, কত রকম সমস্যা, এবং ভাষার শাসনের মধ্যে মূলের প্রতি নিষ্ঠার সম্ভাবনাই বা কতটুকু। প্রথম পংক্তি সুধীন্দ্রনাথে শ্রুতিমধুর, কিন্তু 'শীত' কথাটা মূলে নেই; 'পল্লব পীত'-এ বিশেষ্যপদের অগ্রগামিতা সুখের হয়নি, কিন্তু 'দুয়েকটি ঝোলে কি না ঝোলে'তে মূলের অস্থির ভাবটাকে পাওয়া যায়। তৃতীয় পংক্তিতে 'shake' ক্রিয়াপদ ইংরেজিতে যে-দোলা দেয়, সেটা বাংলা ভাষায় স্বভাব-দোষেই বাদ পড়লো; 'choirs' অর্থে 'কীর্তন' লোভনীয়, কিন্তু 'bare' আর 'ruin'd' এই দুটি বিশেষণের মধ্যে উভয় অনুবাদকই একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। 'Where late the sweet birds sang'—'late' কথাটির বিশেষ ইঙ্গিত বাংলায় চালিয়ে দেয়া সম্ভব হ'লো না, অথচ এই অংশে উভয় অনুবাদই কিঞ্চিৎ ফেঁপে উঠেছে; 'বিবিক্ত করাল' বা 'মূর্তিপরিগ্রহ ক'রে সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে'—এই দুটোই নতুন আমদানি, কিন্তু বাংলায় নিজগুণে আদরণীয়। 'পশ্চিমসাগরে', 'দ্বিধার অসুস্থ আভাস'—এ-সবও অনুবাদকের স্বরচিত; 'আদরে' কথাটা মিল জুটিয়ে দিলেও মৃত্যুর প্রসঙ্গে

অর্থগৌরব বাড়ায়নি ; 'whereon it must expire' একটিমাত্র 'ম্রিয়মাণ' শব্দে সংহত হ'লেও 'must'-এর জোরটাকে পাওয়া গেলো না। দ্বাদশ পংক্তি সুধীন্দ্রনাথে দুটি পংক্তিতে পরিণত হয়েছে (অবশ্য মোট পংক্তিসংখ্যা সমান রেখে)—এটা আইনত দোষ ব'লে গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু 'জীয়ায় যা তাকে, সেই পুষ্টিতেই তার অগ্নিবাণ', এই মূলধর্মী বাক্যের তুলনায় পংক্তিযুগলের অর্থও নির্মল, ধ্বনিও প্রীতিকর। 'Seals up all the rest'—এই ক্রিয়াপদ বাংলায় নেই দেখে, সুধীন্দ্রনাথ 'সুষুপ্তি' ব্যবহার ক'রে ভালো করেছেন, শেষ দুটি পংক্তির মধ্যখণ্ডনও মূলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য, এই বিশ্লেষণের দ্বারা অনুবাদ দুটির মর্যাদা আমি কমাতে চাচ্ছি না ; অনুবাদের মধ্যে বাড়ানো, কমানো এবং পরিবর্তন কেমন ক'রে অনিবার্য হ'য়ে ওঠে, সেইটেই দেখিয়ে দয়া আমার উদ্দেশ্য। কোনো পাঠক যদি এ-কথা মানতে না চান, আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করবো উদ্ধৃত সনেটের অনুবাদের চেষ্টা করতে ; তাহ'লে তিনি অচিরেই উপলব্ধি করবেন এই কাজে একসঙ্গে কত দিক সামলে চলতে হয়, এবং রচনার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য এবং মূলের সমাচার পাবার পরেও ছোটো-ছোটো বিষয় নিয়ে আপত্তি করাটা কত অশোভন। উপরন্তু, বর্তমান লেখকের বিশ্বাস, শেক্সপীরিয় সনেটের অনুবাদের পক্ষে আমাদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ নেই, 'প্রতিধ্বনি'র অন্তর্গত তেইশটি সনেটের প্রত্যেকটি শেক্সপীরিয় স্বাদে ভরপুর, এবং কোনো-কোনো স্থানে মূলানুগমনেও নির্দোষ। এই নিষ্ঠাগত নৈপুণ্য অনেক সময় প্রথম পাঠে ধরা পড়ে না—কেননা সুধীন্দ্রনাথের বাক্যবন্ধ সংস্কৃত-ঘেঁষা, আমাদের বাংলা অভ্যাসবশত সেখানে হুঁচট খেতে হয়, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আবিষ্কারের আনন্দ পাওয়া যায়।

> Lo thus by day my limbs, by night my mind,
> For thee, and for myself, no quiet find.
>
> দিবা কাটে কায়ক্লেশে, বীত নিশা মনস্তাপে তাই ;
> ততদিন শান্তি নাই, যতদিন তোমারে না পাই ॥

'কায়ক্লেশ' আর 'মনস্তাপে'র মধ্যেই যে 'limbs' আর 'mind' বিধৃত আছে, সেটা বুঝে নিতে একটু দেরি হ'তে পারে—কিন্তু সেইজন্যই সুষ্ঠুতার অভিঘাতও প্রবল হয়।

> And other strains of woe, which now seem woe,
> Compar'd with loss of thee will not seem so.
>
> তোমার বিয়োগ, জানি, জাগাবে যে-অপার নির্বেদ,
> খেদ ব'লে গণ্য নয় তার পাশে উপস্থিত খেদ ॥
>
> So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
> And Death once dead, there's no more dying then.
>
> মর্ত্যজীবী মৃত্যু তোর উপজীব্য হবে তাহলেই ;
> এবং মৃত্যুর মৃত্যু যে ঘটাবে, তার মৃত্যু নেই ॥

শেক্সপীরীয় শব্দব্যসনের আমোদটুকুও বাংলায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪

কিন্তু আমি সুধীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ দিতে চাই, মূলের অনুসরণে তাঁর কৃতিত্বের জন্য নয়, বাংলা ভাষায় একটি হৃদয়গ্রাহী কবিতাগুচ্ছ সংযোজন করেছেন ব'লেই। এ-কথা, শুধু, শেক্সপীরীয় সনেট নয়, সমগ্র 'প্রতিধ্বনি' বিষয়েই প্রযোজ্য। সংখ্যায় শেক্সপীয়রের পরেই সর্বাধিক অনুবাদ আছে হাইনরিখ হাইনে থেকে ; এই জর্মান কবি, যিনি বেদনা আর ব্যঙ্গ, হাস্য আর হার্দ্য গুণের সমন্বয়ে 'ক্ষণিকা'র কবির সধর্মী, কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী'র কবির সঙ্গে যাঁর দুস্তর ব্যবধান, তাঁকে অনুবাদ করতে গিয়ে—বলতে খুব ভালো লাগছে—সুধীন্দ্রনাথের নতুন দু-একটি গুণপনা প্রকাশ পেয়েছে ; হাইনের হালকা চালের অনুকরণের প্রয়াসে তিনি বাংলা পদ্যেরই হালকা চালটা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন—যা আগে করেননি ; 'মহাকাব্য', 'স্মৃতিবিষ',

কিংবা অপ্রত্যাশিত স্বরবৃত্তে লেখা 'পরিবাদ' ('সাঁচ্চা কিছুই নেই জগতে ; দুষ্ট সবই দোষে'), অনুবাদ হ'লেও, বাংলা ভাষায় হালকা কবিতার মনোহর দৃষ্টান্ত। আরো বেশি বাংলা এই কারণে যে এখানে বৈদেশিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা নেই ; 'বেদবেদান্ত', 'বৃন্দাবন' 'শকুন্তলা', 'তানসেন' প্রভৃতি উল্লেখের ফলে হাইনে যেন পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত হ'য়ে গেছেন। এই রকম পরিবর্তনে আমার মনে মৌলিক আপত্তি জাগে—আমি জর্মানিতে গিয়ে রাইনওয়াইনই পান করতে চাই—যদিও এ-বিষয়ে আমি সচেতন যে হাইনের নিজস্ব উদাহরণগুলো ব্যবহার করলে বাঙালি পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ্য হবার আশঙ্কা ছিলো। অনুবাদের স্বাদের জন্যই এটা দরকার যে লাইলাক ফুলটা লাইলাকই থাকবে, এবং আল্পস পর্বত হিমালয়ে রূপান্তরিত হবে না ; তবু, 'পরিবাদে'র মতো রসোজ্জ্বল একটি বাংলা করিতা হাতে এলে তখনকার মতো এই আপত্তি প্রত্যাহার করতেও আমি রাজি।

মালার্মে আর ভালেরির অনুবাদের সুধীন্দ্রনাথ শুধু সাহসের পরিচয় দেননি ; প্রমাণ করেছেন যে বাংলা ছন্দের উপর, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উপর এবং সাধারণভাবে কাব্যকলার উপর তাঁর অধিকার—আমরা তাঁর আদি পাঠকরাও এতদিন ধ'রে যা জেনেছি, তার চেয়েও দৃঢ় ও ব্যাপক। যদিও অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের জন্য মালার্মের সনেটের কোথাও-কোথাও ওজন বেড়ে গেছে, তবু 'ফনের দিবাস্বপ্ন' আর ভালেরির 'আদিনাগ', এই দুটি বিখ্যাত, দীর্ঘ, জটিল ও দুরূহ কবিতার অনুবাদ বাংলা ভাষায় কত বড়ো কীর্তি বা কবিতা দুটির বহিরঙ্গের বর্ণনা দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন। 'ফনের দিবাস্বপ্ন' শতাধিক পংক্তির সমপংক্তিক পদান্ত মিলের কবিতা ; আর 'আদিনাগে' স্তবকের সংখ্যা একত্রিশ, তার প্রত্যেকটিতে পংক্তির সংখ্যা দশ, পংক্তিগুলো ছোটো এবং সমান মাপের, আর মিলের জটিল ব্যবস্থা (কখকখগগঘঙঙঘ) প্রত্যেক স্তবকে অনম্যভাবে একই রকম। ভাষান্তরে এই সমস্ত লক্ষণ বজায় রেখে চলা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হ'তে পারে—কোনো-কোনো ইংরেজি অনুবাদক সে-রকম কোনো চেষ্টাই করেননি—কিন্তু

সুধীন্দ্রনাথের হাতে তা সম্ভব হয়েছে তাঁর বিরাট শব্দসম্ভার এবং কাব্যরচনায় বহুকালের পরীক্ষিত দক্ষতার ফলে। কিন্তু পারদর্শী কবির পক্ষেও এই অনুবাদ দুটি সম্মানজনক ; 'ফনের দিবাস্বপ্নে' আঠারো মাত্রার পয়ার স্বচ্ছন্দ এবং বিচিত্র যতিপাতে পদে-পদে মিল দিয়ে প্রবহমান, সংস্কৃত শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে চলতি বাংলার ক্রিয়াপদ-প্রয়োগে উজ্জ্বল। (শেক্সপীরীয় সনেটে তিনি 'সনে', 'নেহারি' প্রভৃতি পুরোনো ভাষা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মালার্মেতে আধুনিক ভাষার আস্বাদ পাওয়া যায়।) আর 'আদিনাগে'র ৩১০ পংক্তি ভ'রে ব্যবহৃত হয়েছে দশ মাত্রার পয়ার—যা, আমরা জানি, ছোটো লিরিকের পক্ষেই উপযোগী : একটু ঢিলে হয়নি কোথাও, একটি মিল বাদ পড়েনি বা তার ব্যবস্থা বদলানো হয়নি. বা মিলের তাগিদে অপপ্রয়োগও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলাকৌশলের কৃতিত্বে, এই দম-না-ফুরোনো নিফাঁক অনুবাদ দুটি সুধীন্দ্রনাথের আর বাংলা ভাষার দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে গণ্য ; আর ফরাশি কবিদ্বয়ের বিষয়ে তাঁর ইংরেজ অনুবাদক আর ভক্ত সমালোচকের মন্তব্য যদি ভুল না হয়, তাহ'লে সাহস ক'রে নিশ্চয়ই বলা যায় যে 'ফনের দিবাস্বপ্ন' বা 'আদিনাগ' অন্তত মূল রচনার চাইতে একটুও বেশি দুর্বোধ্য নয়।

৫

বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার নমুনা হিশেবে 'ফনের দিবাস্বপ্নে'র সঙ্গে তুলনীয় সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যযাতি', যার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে, রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সঙ্গে র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী'র অপরূপ অন্বয়সাধন ক'রে, তিনি অনুবাদ, হরণ, ও মৌলিক সৃষ্টিকে একাকার ক'রে দিয়েছেন। এই দীর্ঘ কবিতাটি, তার আঠারো মাত্রার জটিল, বন্ধুর বিন্যাসে, যতিপাতের বৈচিত্র্যে, লুকোনো এবং দেখানো মিলের বিস্ময়ে বাংলা কাব্যে কলাসিদ্ধির একটি প্রোজ্জ্বল উদাহরণ, ঠিক যার পাশে, 'ফনের দিবাস্বপ্ন' ছাড়া আর কোনো কবিতাকেই আমরা বসাতে পারি না।

কিন্তু এখানে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে এই : 'যযাতি' কবিতায় আঠারো মাত্রার স্বধর্ম রক্ষা পেয়েছে কিনা, না কি এটি আসলে অসমপংক্তিক পয়ারে লেখা, শুধু চাক্ষুষ তৃপ্তির তাগিদে সমপংক্তিক রূপে সাজানো। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর প্রথম কয়েক পংক্তি—

> উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
> অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
> পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমানা বাড়িয়েছে
> ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
> প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক···

অনায়াসে বদল ক'রে এই ভাবে সাজানো যায়—

> উত্তীর্ণ পঞ্চাশ :
> বনবাস
> প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে অতঃপর অনিবারণীয় ;
> এবং বিজ্ঞানবলে পশ্চিম যদিও
> আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে ইদানীং, তবু
> সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের প্রভু,
> বার্ধক্যের আত্মাপহারক।
> আশ্রুত তারক···

শুধু বদল করা যায় তা-ই নয়, পড়বার সময়ে মনে-মনে তা করতেই হয় আমাদের, বদল ক'রে না-নিয়ে পড়া যায় না, দৃষ্টিগোচর পংক্তিবিন্যাসের সঙ্গে কান সায় দেয় না কিছুতেই ; যেমন লেখা আছে, তেমনি ক'রে পাঠ করতে গেলে বাংলা ছন্দের ধ্বনির শাসনে রসনার জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটতে দেরি হয় না। উদাহরণত— 'পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে'—এই পংক্তিটিকে টানা পয়ারের ঢঙে পড়া অসম্ভব, চাক্ষুষ পংক্তিবিভাগ না-থাকলেও 'যদিও'র পরে থামতেই হবে। আসলে এই রচনায় সুধীন্দ্রনাথ পাঠকের কাছে একটা প্রকরণগত হেঁয়ালি উপস্থিত করেছেন ; চেহারা রেখেছেন টানা আঠারো মাত্রার, কিন্তু ছন্দ লিখেছেন 'বলাকা'র অথবা 'ক্রন্দসী'র জাতের—

পাঠককে গাঁটে-গাঁটে ভাগ ক'রে নিয়ে পড়তে হবে। ছন্দের স্বাভাবিক এবং আন্তরিক ধ্বনির সঙ্গে তাল রাখার জন্যই 'বলাকা'র পংক্তিগুলিকে অসম হ'তে হয়েছিলো, দেখার সঙ্গে শোনা সেখানে মিলে গেছে— প্রত্যেক পংক্তির পরে (সে-পংক্তি যতই ছোটো হোক), অর্থের জন্য না-হ'লেও ধ্বনির জন্য পাঠককে একটু থামতে হয়। 'তাই। স্মৃতিভারে আমি প'ড়ে আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নাই'—এখানে 'তাই' একটা আলাদা পংক্তি না হ'লে বিষম বিভ্রমের সৃষ্টি হয়। এই চাক্ষুষ সুবিধাটাকে সুধীন্দ্রনাথ উড়িয়ে দিয়েছেন ; ফলত, 'বলাকা' বা 'ক্রন্দসী'র সঙ্গে আইনমাফিক জাতে-গোত্রে মিললেও 'যযাতি'র ছন্দে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চরিত্র দেখা দিয়েছে। আঠারো মাত্রার কোমর ভেঙে দিয়ে তিনি তাকে সুন্দরী সাপিনীর মতো যদৃচ্ছ যতিপাতে এঁকে-বেঁকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন ; এবং এই প্রচণ্ড পরীক্ষার ফলে যে-বস্তুটি জন্ম নিয়েছে তাকে বলতেই হয়, মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের আধুনিক প্রকরণ, কিংবা আধুনিক কবির হাতে তার পরিণতি।

> অবশ্য আমার
> পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে কথা স্বীকার
> করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
> নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
>
> ভেলা
>
> আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
> এইটুকুই আমার পরম পরিচয়।···

পড়বার সময় হ'য়ে ওঠে—

> অবশ্য আমার পক্ষে
> সংগত যে নয় অনুতাপ
> সে-কথা স্বীকার করি ;
> কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে

আমার মাতাল নৌকা বানচাল হয়ে,
বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—

ভেলা
আমি ভাসিয়েছিলুম
একদা তাদেরই মতো,
আজ এইটুকুই
আমার পরম পরিচয়।

—কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগ এবং অবধান সত্ত্বেও 'আমি ভাসিয়েছিলুম'-এ এসে সন্দেহ জাগে যে 'প্রতিপক্ষ' এই খেলার নিয়ম লঙ্ঘন করলেন। এই রকম কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় বাংলা ছন্দের মজ্জাগত মৌল বিধানের উপর বড্ড বেশি জবরদস্তি হ'য়ে গেছে। এই ছন্দ, যাতে মাইকেলের কল্লোল শোনা যায়, আর মাঝে-মাঝে গিরিশচন্দ্রের উদাত্ত নাটকীয় উচ্চারণ, এবং যা সুধীন্দ্র দত্তীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রবলরূপে আক্রান্ত—'ফনের দিবাস্বপ্ন' এই ছন্দেই রচিত। এ-সব রচনা বার-বার পাঠ করার পর মাইকেল বিষয়ে আমার একটি পুরোনো এবং কুখ্যাত উক্তি প্রায় প্রত্যাহরণ করতে লুব্ধ হচ্ছি; বলেছিলুম মাইকেল 'নির্বীজ', কিন্তু এই পূর্বস্থরীর সঙ্গে—এমনকি মিণ্টনের সঙ্গে—সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে; আর যদিও 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'ও 'সংবর্ত' কবিতার হার্দ্য আবেদন সুদূরপরাহত, তবু সুধীন্দ্রনাথ অন্তত একটু প্রমাণ করেছেন যে মাইকেলের কাছে বাঙালি কবির এখনো কিছু শেখবার আছে। এও একটি কারণ, যার জন্য আমাদের অবাক লাগে যখন তাঁর মুখে শুনি যে 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যদর্শনই তাঁর অন্বিষ্ট।'

এ থেকেই বোঝা যাবে সুধীন্দ্রনাথের অনুবাদ বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো আপত্তি কোন দিক থেকে উঠতে পারে। তাঁর হাতে—কেউ-কেউ ইতিমধ্যেই বলেছেন—বিভিন্ন কবি নির্বিশেষ রূপ ধারণ করেন, সব কবিতা একান্তরূপে তাঁরই রচনা ব'লে মনে হয়, মূল কবিদের স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ পায় না। এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে অনুবাদক নিজে কবি হ'লে তাঁর রীতিবৈশিষ্ট্য

একেবারে এড়ানো অসম্ভব, তবু মূল কবিদের চরিত্রলক্ষণ, এবং তাঁদের দেশকালগত আস্বাদের জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে বৈধ, এবং অনুবাদকের পক্ষে স্বীকার্য। এবং এই আকাঙ্ক্ষা যে সুধীন্দ্রনাথ সর্বত্রই অপূর্ণ রাখেননি, তাঁর শেক্সপীয়র আর হাইনে-অনুবাদেই তার প্রমাণ মিলবে। কিন্তু 'প্রতিধ্বনি'র একটি রচনা, তাঁর দুর্বার স্বকীয়তার ফলে, হ'য়ে উঠেছে মূলের অনুবাদের বদলে প্রতিবাদ: সেটি ডি. এইচ. লরেন্সের 'On the Balcony', যার নতুন নামকরণ হয়েছে 'কালতরী'। এই নামকরণ প্রমাদ-প্রসবী, কেননা 'The Ship of Death' কবিতাটিকে লরেন্সের কোনো পাঠকই সহজে ভুলবেন না, আর নাম দেখে সেই কবিতার আশা ক'রে কেউ-কেউ ধাঁধাঁয় পড়বেন। এবং, এই একটি অনুবাদে, সুধীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ মূল কবিকে একেবারেই আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে; ছাপার অক্ষরের সাক্ষ্য সত্ত্বেও বিশ্বাস করা শক্ত যে 'কালতরী'র সঙ্গে ডি. এইচ. লরেন্সের কোনোরকম সম্বন্ধ আছে। লরেন্স তাঁর কাব্যে ঠিক তা-ই ছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যা নন—তরল (ভালো-মন্দ দুই অর্থেই), বেগবান, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, মৌখিক ভঙ্গিতে আসক্ত। এই রকম কবিতাকে মিণ্টন-মধুসূদন-সুধীন্দ্রনাথের সাজ পরাবার ফলে যে-ব্যাপারটি ঘটেছে, তার উল্টো উদাহরণ একদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন স্বরবৃত্তে 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' লেখার চেষ্টা ক'রে। কিন্তু হয় না, স্বরবৃত্তে যেমন অমিত্রাক্ষর সম্ভব নয়, তেমনি সংস্কৃত গাম্ভীর্যের চাপেও লরেন্স দম আটকে মারা যান।

In front of the sombre mountains, a faint,
lost ribbon of rainbow;
And between us and it, the thunder;
And down below in the green wheat, the labourers
Stand like dark stumps, still in the green wheat.

গম্ভীর গিরির ভালে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর তিলক—
এ-পারে তুমি ও আমি—ব্যবধান দম্ভোলিপ্রহত
অবরোহী পাদদেশে ছত্রভঙ্গ শ্রমিকের দল,
অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে।

'গিরি', 'ভাল', 'তিলক', 'দম্ভোলিপ্রহত', 'অবরোহী', 'অসিত', 'স্থাণু'—প্রায় প্রত্যেকটা কথাই যথাসম্ভব অ-লরেন্সীয় ; এবং আঠারো মাত্রার ভারি পয়ারের সঙ্গেও মূলের গদ্যধর্মী মুক্তছন্দের কিছুই মেলে না।

The thunder roars. But still we have each other !
The naked lightnings in the heaven dither
And disappear—what have we but each other ?
The boat has gone.

এই উদ্ধত দুর্যোগে, আমার সম্মুখে তুমি, আমি
আছি তোমার পাশেই—দিগম্বর বিদ্যুতের জালা
নির্বাপিত পুনরায় চমকিত শূন্যের অগাধে—
নাস্তিসাক্ষী আমাদের দৃষ্টিবিনিময়—চরাচরে
অনাত্মীয় আর যা সমস্ত কিছু : মগ্ন কালতরী।

মূল রচনা রমণীয় হ'য়ে উঠেছে 'we have each other'-এর ঈষৎ বদলানো পুনরুক্তিতে, 'dither'-এর মতো কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, শেষ, ছোটো পংক্তির দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে যাওয়ায়, এবং সব মিলিয়ে ভাষার সরল স্বাচ্ছন্দ্যে। অনুবাদে এই লক্ষণগুলোর অস্তিত্বসুদ্ধ স্বীকৃত হয়নি—এমনকি, যদিও শেক্সপীয়র, মালার্মে ও ভালেরির অনেক বেশি শ্রমসাপেক্ষ মিল বিষয়ে তিনি প্রভূত যত্নের প্রমাণ দিয়েছেন—এই কবিতার দুটি মাত্র মিল (timber-limber, whither-dither), যা বাংলায় দুটো স্বর নিয়েও দুষ্প্রাপ্য হ'তো না, তাও সুধীন্দ্রনাথ যেন হেলাভরেই ব্যবহার করলেন না। আমরা ধ'রে নিতে পারি এই কবিতা তাঁর যোগ্য মনে হয়েছে ব'লেই তিনি অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন ; কিন্তু যদি যোগ্যই মনে হবে তাহ'লে এই উপেক্ষা কেন। হাইনের অনুবাদে তিনি দেখিয়েছেন, তিনি প্রাকৃত বাংলার ব্যবহারও জানেন, ঠিক সেই ভাষারই প্রয়োজন ছিলো এখানে—ribbon অর্থে ফিতে ; thunder, বাজ বা বজ্র ; stump, খুঁটি ; the boat has gone, নৌকো

চ'লে গেলো। ছিপছিপে চলতি বাংলা, গদ্যছন্দের সঙ্গে যুক্ত হ'লে, লরেন্সের স্বভাবের পক্ষে অনুকূল হ'য়ে ওঠে ; অন্যান্য বাঙালি কবিরা গদ্যছন্দেই তাঁর অনুবাদ করেছেন, এবং সদ্যপ্রকাশিত 'বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় এই কবিতারই 'বারান্দায়' নামক যে-অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে, তার গদ্য ছন্দে মূলের প্র ত্যে ক টি সুখ পাওয়া না-গেলেও লরেন্সকে নির্ভুলভাবে চেনা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, যতদূর জানি, গদ্যছন্দে বিশ্বাসী নন ; হাইনের দু-একটি অনুবাদে ছাড়া, ঠিক মৌখিক ভঙ্গিতেও পদ্য লেখেননি কখনো ; তাই, ছন্দ-শিল্পী হাইনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সম্ভব হ'লেও, লরেন্সের প্রতি অনীহাই মনে হয় স্বাভাবিক। অবশ্য 'প্রতিধ্বনি'তে লরেন্সের কবিতা একটিমাত্রই আছে, এবং বহু ভালো জিনিশ পাবার পর একটি ব্যতিক্রম নিয়ে অত্যন্ত বেশি খুঁতখুঁত করাকেও শিষ্টাচার বলে না ; তবু, অন্যান্য ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ প্রকৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন ব'লে, এবং লরেন্সের প্রতি আমার দুর্বলতা দুর্মর ব'লে, এই মন্তব্য অসংবরণীয় হ'য়ে উঠলো। প্রসঙ্গত, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের একটা সাধারণ লক্ষণও এখানে উল্লেখ করতে চাই ; সেটা তাঁর সংস্কৃতের প্রতি আসক্তি, যার ফলে তাঁর রচনা দার্ঢ্য এবং সংহতিগুণে ঈর্ষাযোগ্য, শব্দার্থের যাথার্থ্যে লক্ষ্যভেদী, কিন্তু কখনো-কখনো স্বাচ্ছন্দ্য-রহিত এবং পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য। যেমন একদিকে শৈথিল্য তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তেমনি মাঝে-মাঝে (যেমন 'সংবর্তে'র 'জাতক (২) সনেটে) ক্রিয়াপদের বিরলতায় ও অতিঘন বাক্যবন্ধের ফলে রচনাটিকে প্রায় বাংলা ব'লেই আর মনে হয় না—সংস্কৃতের মতোই বিশ্লেষণ ক'রে-ক'রে ধীরে-ধীরে প'ড়ে উঠতে হয়। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেও এই রচনাটি ব্যতিক্রম, কিন্তু তাঁর আরো স্বভাবী রচনাতেও এমন নমুনা কমই পাওয়া যাবে, যেখানে, অন্তত আমার মতো স্বল্পশিক্ষিত পাঠককে দু-একবার বড়ো অভিধান ঘাঁটতে না হয়। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই পরিশ্রম-টুকুর পুরস্কার মেলে হাতে-হাতে, যখন দেখা যায় শব্দের অর্থটি কাব্যের প্রয়োজনের সঙ্গে আক্ষরিকভাবে মিলে গেছে ;—কিন্তু এই রকম বুদ্ধির সুখই

এক কথা, আর হৃদয়ের উপর কবিতার অভিঘাতই অন্য। আর সেই অভিঘাতের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত সুধীন্দ্রনাথ যেখানেই দিয়েছেন, সেইখানেই, যেন এক দৈব মুহূর্তে, হঠাৎ রচনা থেকে সংস্কৃতের ভার ঝ'রে গেছে, বেজে উঠেছে সরল বাংলার অব্যবহিত, উত্তপ্ত উচ্চারণ।

চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলি।

সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।

…সে এখনো বেঁচে আছে কিনা
তা সুদ্ধ জানি না।

উপরন্তু লক্ষ্যণীয় যে 'সংবর্ত' নামক কবিতাটিতে অচলিত সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, বাক্যবন্ধ ক্রিয়াপদবহুল এবং অনেক স্থলেই বাংলা মৌখিক রীতির অনুগামী। এবং সেই কবিতা তার মৃদু আরম্ভ থেকে হাতুড়ির বাড়ির মতো শেষ পংক্তি পর্যন্ত অব্যর্থ, সুসংবদ্ধ, একমুখী, বহুল জটিলতার মধ্যে উদ্দেশ্যময়। এই রকম সিদ্ধি যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের মধ্যেই দুর্লভ। আমরা কি ভুল করবো, যদি 'সংবর্ত' কবিতার সিদ্ধির সঙ্গে তার ভাষার ভঙ্গির কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করি? অন্তত এটা স্পষ্ট যে ভাষাকে সহজ ক'রে তোলার জন্য কবি এখানে সচেতনভাবে প্রয়াসী ছিলেন; এবং এই পথেই ক্রমশ তিনি অগ্রসর হবেন কিনা, বাংলা ভাষার কবিতার পক্ষে এটি একটি জরুরি প্রশ্ন। কবিতার ভাষা ও রীতির যে-সব সমস্যা থেকে কোনো লেখকেরই আজ নিস্তার নেই, তার সমাধানের এক অংশ সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করছে।

দুটি কবিতা

অরবিন্দ গুহ

মূল্য

যৎসামান্য সম্বল ছিলো
তা-ও তো উড়ালি খেলায়,
নিজেকে নিয়েই ভাসলি নিজের ভেলায়;
সে-ভেলা সইতে পারলো না তোর দুঃখের ভার,
দিঘি-পাহারায় সে-রাত্রে ছিলো যে-চৌকিদার,
সে-ও পারলো না, নাকি চাইলো না উঠিয়ে আনতে
তোকে জল থেকে ডাঙার প্রান্তে।

ঘটনা হিসেবে আত্মহত্যা অতীব মুখ্য।
পরলোক ব'লে যদি কিছু থাকে
তুই যা হারালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর দুঃখের তুল্য দুঃখ।

সে-দুঃখ কেউ মনে রাখলো না, সবাই ভুললো;
বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনাহীন
লোকে বলে তোকে শুনি নিশিদিন—
কিন্তু কী ক'রে ভুলি তোর ভালোবাসার মূল্য।

আলেখ্য

তুমিই আমাকে ধন্য করেছো,
বারবার আমি মেনেছি ধন্য ;
পূর্ণ করেছি আমার হৃদয়,
ভুলেছি কুটিল কঠোর দৈন্য।
পিছে ফেলে সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
আগে তো বুঝিনি কোথায় ছন্দ
বেঁধে হাওয়া ব'য়ে আনে আনন্দ,
কেন ভালোবাসা অগ্রগণ্য।

আমাকে শূন্য কে করেছে ? তুমি।
তুমিই আমার শরীরী দুঃখ।
সম্ভাবনার পথে পা গেলো না,
সমস্ত পথ সমান রুক্ষ।
পরিবর্তনহীন বারো মাস,
সমুদ্র ছুঁয়ে রয়েছে আকাশ,
সে-বিশালতায় যতো আশ্বাস—
তুমি ততোধিক কঠিন সূক্ষ্ম॥

তিনটি কবিতা

রণেন্দ্রনাথ দেব

আষাঢ়

যখনি চেয়েছি আমি প্রজ্ঞার আলোক
তিনি সরালেন মেঘভার,
তখনি অশোকগুচ্ছে লেগেছে ঝলক
হেসেছে নদীর ভাঙা পাড়,
আকাশে রঙের নৃত্য জুড়েছে আষাঢ়॥

জন্মদিন

সোনালি চায়ের কাপে, বিদগ্ধ আলাপে আর মুহুর্মুহু গানে
আসর জমাট, উগ্র পুষ্পসার, সঙ্গে কিছু কবিতা-ব্যাখ্যানে
সুসম্পন্ন জন্মদিন, সাক্ষ্য তার টেবিল-বোঝাই-করা দানে।

তারপর শ্রান্তি নামে, কালপুরুষের মূর্তি আসে জানালাতে,
বাসি গন্ধ অন্ধকারে হাই চেপে শয্যা পাতে মরুতুল্য রাতে
তন্বী নয়, লোলচর্ম বৃদ্ধা কোনো, শিরা-আঁকা ঠাণ্ডা শাদা হাতে॥

চেনা পথ

চিরস্থির রেখাচিত্র। পরিচিত ভিড়
ঘাস, গাছ, ফুল আর শালিক পাখির।
ক্লান্তিকর উদয়াস্ত। দিগন্তের মোড়ে
তির্যক সূর্যের মুখ যেই নেমে পড়ে,

অমনি আকাশে জলে গ্রহ-দীপাবলি
গত কালকের মতো। এ শহরতলি
পুরোনো পোষাক পরা। ছেঁড়া ক্যানভাসে
ফিরে-ফিরে আঁকে শুধু পাখি-ফুল-ঘাসে।
অন্য কোনো রঙ নেই? কতকাল আর
বাজাবে সে একটানা ঝিঁঝির সেতার?

সহজ কবিতা

ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য

আবিষ্কারের মোহ যেন তোমায় আমায় পেয়ে বসেছে।
কিছু একটা উদ্ভাবন
কিছু একটা নতুন অভিজ্ঞতা
অন্তত কোনো একটা কিছু—
অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য কিন্তু নতুন,
যা নিয়ে ইউরেকা ব'লে
দুরন্ত যৌবনের আবেগ ভরা এই অধীর মুহূর্তটিকে
তীব্র উচ্ছল আনন্দে বিহ্বল ক'রে তুলতে পারি।

ধরো, মরুসীমান্তে কাঁটাঝোপের মধ্য হ'তে
দুটো ঘাসফুল আমাদের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে।
জলন্ত রোদের মধ্যে হঠাৎ যেন চোখ জুড়িয়ে গেল।
এটা কি কিছু কম একটা পাওয়া?

ধরো, মরা নদীর বাঁকে দেখা গেলো
পর্তুগিজদের নৌকোর ভাঙা একটা মাস্তুল।
সে কি বড়ো কম দেখা?

ধরো, পার্বত্য পথের ধারে এক টুকরো ভাঙা পাথর।
সে কি কিছু কম পুরাবৃত্তের সন্ধান?

এই যে আমরা এগিয়ে চলেছি—
গ্রামের শেষে আটচালার পাশের মাঠ পেরিয়ে
এই যে এসেছি এই আগাছার জঙ্গলে

এর মধ্যে এই যে একটা চেনা-চেনা ফুলের গন্ধ ভেসে আছে,
এটা কি কিছু কম সম্ভাবনা ?

বিচ্ছিন্ন অলংকারের সূত্র ধ'রে আবিষ্কৃত হয়েছিল রাক্ষসপুরী।
আর এই বৃক্ষলতার ফাঁকে-ফাঁকে
এই যে ফুলের গন্ধ হাতছানি দিচ্ছে
তার প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়া কি সাজে আমাদের ?
কে জানে এই স্তূপীকৃত শুকনো সেগুনপাতার মধ্যেই
কোনো ইতিহাস লেখা আছে কিনা ?

হঠাৎ পদস্খলন হ'লো—আছাড় খেয়ে পড়লুম কাশবনে।
চোখ বুজে গেল।···

চোখ খুলে দেখি—যৌবন অবলুপ্ত প্রায়,
অবসাদের জরা রক্তের প্রতিটি কণায়।
মাথার নিচে কঠিন পাথরের উপাধান
আর, ওপারে নীল আকাশে পড়ন্ত রোদ্দুরের ছটা,
মাঝে দাঁড়িয়ে তুমি—
আঁচলে চোখ মুছে হাসলে, হাসলে, হাসলে।
হাত দুটো বাড়িয়ে বললে—ধরো।

আমি বললুম—ধরবো না।
মাটির ওপরে আমি কিছু ধরেছি—নতুন কিছু ধরেছি
যার খোঁজে যৌবন কেটে যাচ্ছে।
তুমি হাসলে।
পাথরের দিকে চেয়ে
বিস্ময়ে বললাম—ছাখো। তুমি হাসলে।

আনন্দে বললাম—ছাখো। তুমি হাসলে।
দুঃখে বললাম—ছাখো। তুমি হাসলে।

অর্ধ নগ্ন এক নারীর প্রস্তর মূর্তি
কাশবনের অন্তরালে মুখ ঢেকে প'ড়ে আছে।
আমি চেয়ে রইলুম···
প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বিচার করুন এই উদ্ভিন্নযৌবনার
বয়স কত হবে।
রসজ্ঞ বিচার করুন তার শিল্পনৈপুণ্য,
ঐতিহাসিক সন্ধান করুন
কোন বিলাসপরায়ণ নৃপতির এটা ছিল প্রমোদকানন।
ও-সব বিচার আমি চাইনে, চাইনে, চাইনে।

আমি অবলোকন করলাম বসন্তের রূপলাবণ্য,
স্পর্শ করলাম নারীর কমনীয় দেহবল্লরী,
অনুভব করলাম পাথরের নবনীত কোমলতা,
দৃষ্টিপাত করলাম অনবসিত অফুরন্ত যৌবনে—
কালের সীমায় যা স্তব্ধ হয়নি,
জরার আক্রমণে যা আজো বিজয়িনী
তুচ্ছ যার কাছে মৃত্যুর করাল গ্রাস,
এ যেন অমরতার ব্রত নিয়ে
কালে-কালে জীবনের, যৌবনের প্রতিনিধি
অটুট, অক্ষয়।

* * * *

মনে পড়লো, আমি সেই উন্মাদ উদ্দাম অভিযাত্রী
শিলাখণ্ডে যার প্রেম স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

আগাছার জঙ্গলে নেমে এলো নীরন্ধ্র আঁধার,
আমার চোখে কিন্তু অস্ত গেলো না সূর্য।
তার আলোয় চেয়ে দেখি।
দুই বাহু প্রসারিত ক'রে তুমি তেমনি হাসছো।
এ যেন জীবন্ত মূর্তি, এই পাথর যার অনুকরণ।
ঘুমন্ত পাথরের ইন্দ্রজাল ছিন্ন ক'রে
আমার অবসন্ন দেহমনে উত্তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
নির্জন অরণ্যে বিদ্যুৎ-চালিত হ'য়ে
চিৎকার ক'রে আমি ঘোষণা করলাম—
পারবো না, পারবো না আমি অবহেলা করতে
তোমার এ বাহুর ভঙ্গি, চোখের চাউনি,
বুকের উত্তপ্ত ওঠা-পড়া,
তোমার প্রাণচঞ্চল ঐ পদক্ষেপ।
ধরবো, ধরবো, নিবিড় ক'রে ধরবো।...
ধরলুম তোমাকে,
বৃক্ষলতা কাশবন কেঁপে উঠলো
শুকনো সেগুনপাতা হাওয়ায় স'রে গেলো
সজীব পাতায় লাগলো নাচন,
যৌবনের রক্তে জাগলো ঢেউ।
নতুনত্বের অসীম সম্ভাবনা
চেনা সেই ফুলের গন্ধে ছড়িয়ে গেল দিকে-দিকে।
তুমি তার মধ্যে হাসলে, হাসলে, হাসলে,
হেসে লুটিয়ে পড়লে আমার বুকে,
রক্তমাংসের কাছে পাথরের হার হ'লো সেদিন।

মুহূর্ত

বিকাশ দাশ

দগ্ধ দিন, বিবর্ণ আকাশ।
বর্বর দস্যুর মতো হানা দেয় দুঃসাহসী ঝড়।
বিধ্বস্ত নগর-গ্রাম, বিষাক্ত নিশ্বাস
কাঁপায় পাহাড়, বন, অবাধ প্রান্তর।

তবু বুনো-মৌমাছির অলস গুঞ্জনে ছেয়ে
স্বপ্ন দেখে অরণ্যের মেয়ে।
হলুদ রোদ্দুর কাঁপে, ফড়িঙের অবোধ ডানায়
জীবনের ছন্দ তার অফুরান আনন্দ জানায়।
আমারো নির্জন মনে এক ঝাঁক স্বপ্ন করে ভিড়,
মুহূর্তের স্পর্শে মোছে সময়ের অনাদি তিমির।

শাদা

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার হস্টেলে
দ্বিপ্রহরে কোনোদিন গেলে
চোখে পড়ে আশেপাশে
ধোপাদের ভাঁটি।
আঁটাআঁটি
ছোটো-ছোটো লাল-টালিঘর।
জীবনের শীতল স্বাক্ষর
পুকুরের নীল জলে। মাঠে আর ঘাসে
জাগরূক বসন্তবাহার।
আর
শাদা-শাদা
কাপড়ের গাদা।

পা-বাঁধা বকের মতো ধবল কাপড়
এলোমেলো হাওয়ার জোয়ারে
বারে বারে পাখা ঝাড়ে।
ঘ্রাণ যেন পাই শুভ্রতার
হঠাৎ দুপুরে ফোটা অগণন রজনীগন্ধার।

শাদার সে-ডাক
আমাকে তো বার বার করেছে অবাক।
আমি চিরকাল,—
স্বাতন্ত্র্যের রং মেখে নীলবর্ণ হয়েছি শৃগাল।

আমার আকাশময় অবিশ্বাস, ধোঁয়া কালো-কালো
তবু এ শাদার গান আমাকে কী কুণ্ঠাহীন
স্বাগত জানালো!

দুপুর-হলুদ রোদে সারা পাড়া চুপ।
ঝুপঝুপ
সময়ের বালি-পাড় ভাঙে
হৃদয় শাদার রঙে রাঙে।
দৈনিক গ্লানির স্রোত দুই হাতে ঠেলে-ঠেলে শেষে
সে-সময় মনে হয় এইখানে এসে
তোমার বাসার কাছে
জীবনের পলাতক শুভ্র ক'টি নিষ্ফল কামনা
পাশাপাশি আজো শুয়ে আছে।
মনে হয়,
তবে বুঝি যায়নি সময়।
আজো বুঝি এই মাঠে, এই ঘাসে, নীল-ঢেউ জলে
এ-মলিন হৃদয়েরে হয়তো বা কেচে-কেচে
শাদা করা চলে।

শরীরিণী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি, তবু অদৃশ্য দেহ অন্ধকারে,
শত প্রমত্ত সাগর গর্জে বক্ষে ;
মেঘমৃত পট, শুধু ক্ষণে ক্ষণে বাত্যা বাড়ে :
ছুটি কেশ উড়ে বাঁধে মোর হাত সখ্যে।
তবু এ-ই ভালো : বল্‌ল সে চুপে,
নিশীথনিবিড় রহস্য রূপে
যে-তমসা, শুধু মুগ্ধ মধুপে
করে সুন্দর নিত্য ;
পাশাপাশি, শুধু হার্দ্য বিভায় আলোকিত অস্তিত্ব !

মানসীর চেয়ে মানবী তবুও কাম্যতর,
প্রকৃতিরে শুধু মনে হয় অনুষঙ্গ ;
সে পরশ-পাশে নিষ্প্রভ হায় সৌরকর-ও :
উত্তাপে কাঁপে রভসবিবশ অঙ্গ।
সব ম্লান লাগে যদি সে না আসে,
নীল নির্জন বিথারে বৃথা সে
মায়া রূপপট, বেদনা বিলাসে
সব সুর লাগে শূন্য :
শুধু শাখা কাঁপে বিবিক্ত রাগে রতিমন্দার ক্ষুণ্ণ !

মানসপ্রয়াসে জানি, জানি, তারে যাবে না ধরা,
অনুরাগে রচি বৃথাই চিত্রকল্প !

রক্তোন্মাদ বক্ষ আমার বাক্যহরা—
সে-বাণে বিমুখ করার শক্তি অল্প।
যদি সে তাকায় মদালস চোখে,
পটভূমি ভরে সৌম্য অশোকে ;
দামিনী বিথারি অসিত অলকে
ঝলে খদ্যোৎ ক্ষিপ্র।
সতত সে মোর অশ্রুশিথানে হার্দ্য গগনে দীপ্র।

আজও মোরা হায় অসহায় বলি প্রতন পাপে :
ফুলশরে শায়ী ক্ষণেকে বিরোধ ক্ষান্তি,
বুঝি ক্রন্দসী তাই অহোনিশি সেই বিলাপে
অশ্রুরটিত ধূমে ধূসরিত কান্তি !
প্রাজ্ঞ পুরুষ প্রোথিত প্রয়াণে :
চন্দনচাঁদ যদি স্মৃতি আনে,
আহত নায়ক সুরভি শয়ানে
বিরহে বিপ্রলব্ধ ;
শুধু অপলক চরণ অলথ করে মৃদু পদশব্দ।

নিদাঘে-প্রাবৃটে-শরতে-শিশিরে অন্ধ রাতে
দক্ষিণাবহে প্লাবিত হৃদয় অঙ্গ।
যামিনী যাপিত নর্মসখীর বন্দনাতে,
সে জানে নিপট কত কৌতুকী রঙ্গ।
বলল সে চুপে : তবু এ-ই ভালো,—
রূপরহস্যে যে-মেঘ ঘনালো,
তারে ছিঁড়ে ফেলে প্রীত দীপ জ্বালো
মানস প্রতিমা আনতে।
তবু সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা জ্বালে লজ্জিত অপরান্তে।

যেখানে তুমি

শামসুর রাহমান

আজো তো সাপের ফণার অমায়
একটি আশার মণি জ্বলে একা দীপ্ত ক্ষমায়।
রুক্ষ দিনের তৃষা বুকে নিয়ে, হয়ে দূরান্তে কখনো নিখোঁজ
একটি আশার বঞ্চিত হ্রদে ডুব দিই রোজ।

সব দিকে যার বন্ধ দরজা, করুণা কুড়িয়ে
কাটে যার কাল জীবনের কড়ি হেলায় ফুরিয়ে,
দীনতার নীল বিষাক্ত ফুলে খেলা করে যার নিপুণ আঙুল—
কী-বা আছে বাকি—কিছু তার ফাঁকি, কিছু তার ভুল।

কুসীদজীবীর নিরেট মুঠোয় দিয়েছি বিকিয়ে
প্রাণের মুক্তো : উঠবে কি আর কখনো ঝিকিয়ে
হৃত-দ্যুতি সেই অমাবস্যার তারা-হীরে হয়ে? জীবনের ধন
একদা আমিও দুর্লভ জেনে ফেলিনি কোথাও এক কণা তার, তবু ভীরু মন
হারিয়েছে কত প্রীত সঞ্চয় প্রতারক ক্ষণে।
লতার বিরোধী গুচ্ছে জড়িয়ে দ্রুত হরিণের মতো প্রাণপণে
চেয়েছি মুক্তি—জানিনি কালের মত্ত প্রতাপ হেলায় প্রাণের দুর্গ গুঁড়িয়ে
করে খানখান : জীবনের ধন অবেলায় যায় নিমেষে ফুরিয়ে।

অন্তরঙ্গ ছায়া-করা যেই প্রাঙ্গণে তুমি অজানা সাড়ায়
ফোটাও প্রাণের মৃন্ময় ফুল, নিত্য গানের ঝর্নাধারায়
অবগাহনের ধীর মুহূর্তে ছড়াও তোমার অজস্র চুল, কালো উদ্দাম—
তোমার সকল ভাবনা-ছড়ানো প্রাঙ্গণটুকু পৃথিবী আমার—তাই জানলাম।

একটি ভয়ের ছায়া রেখে মনে সকল সময়
হৃদয় আমার কতবার ফিরে রজ্জুর হায় প্রতারণা সয়।
দৈবের কোনো গভীর সাড়ায় শুনি সময়ের কাকাতুয়া-বুলি,
হাওয়ার বেহারা-মেঘেদের ডুলি
দূরে নিয়ে যায় : দেখি চোখ মেলে ; অজানা আশায় কত ঝাঁপি খুলি
কখনো আবার জানা মন্ত্রের উল্লাসে জ্ব'লে। তবু প্রাণে ভয় :
যেই উদ্যানে তুমি থাকো তার মৃদু অধিকার হারিয়ে কখনো যদি এ হৃদয়
ক্রন্দনে ভরে, তা হ'লে কী ক'রে কী নিয়ে বাঁচবো—এতকাল ধ'রে
যেই ভীরু কুঁড়ি লুকিয়েছিলাম তা-ও যদি যায় কোনোদিন ঝ'রে!

আজো তো সাপের ফণার অমায়
একটি আশার মণি জ্বলে একা দীপ্ত ক্ষমায়।

তিনটি কবিতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চতুর্দশপদী

আমি ভয় করবো না এ-কথা বলেছি বারে-বারে,
তরী বা তীরের কথা কিছুতেই মনে আনবো না ;
যতোক্ষণ আছে প্রাণ সন্তরণ ছাড়া জানবো না,
টলবো না যদি পথে সিন্ধুবাদী বোঝা চাপে ঘাড়ে।
প্রেম, স্বস্তি, প্রশান্তিকে এককালে সর্বত্র খুঁজেছি,
প্রেমিক যেমন ক'রে মধ্যরাত্রে খোঁজে দয়িতাকে,
না পেলে বিবর্ণমুখে অন্ধকারে ভাঙা কণ্ঠে হাঁকে ;
অশ্রান্ত তেমনি ক'রে সংস্কারের বিরুদ্ধে যুঝেছি।

যৌবন-উপান্তে এসে মাথা নেড়ে গম্ভীর হৃদয়
তাকায় সমুখে-পিছে, আর ভাবে কোন দিকে মতি
কূলপ্লাবী সভ্যতার, কোনপথে দাহ ভ্রান্তি হয়
ধরণীকে জড়াবে না, বালুচরে খুঁজবে না ক্ষতি।
গ্রীষ্ম, বর্ষা—শীত এলো, একে-একে লগ্ন অপগত,
সময় রূপসী নারী, আজো থাকি তারি পদানত ॥

ধমনী

মেঘ নয়, বজ্র নয়, গুরু-গুরু ধ্বনি তাও নয়,
ধোঁয়া নয়, বহ্নি নয়, অট্টহাসি নয় তো ঝড়ের ;
বাহিরে প্রকাশ নেই, ধমনীতে শুধু তার জের,
দুঃসহ পাষাণভার সে-ধমনী নিরুত্তরে সয়।

সবি শান্ত নীলিমায়, সবি শান্ত মাটিতে প্রান্তরে,
সুস্নিগ্ধ সকালে কিংবা দ্বিপ্রহরে অথবা সন্ধ্যায়
সংসারের ঢালু পথে জনতার জীবন গড়ায়,
অন্য দিকে ধমনীতে আদিমের স্বেদবিন্দু ঝরে।

সুখ, শান্তি, আতিশয্য সবি ঠেলে রেখে একদিকে
কী যেন আড়ালে খোঁজে দাবদগ্ধ তৃষিত ধমনী,
রক্তের উত্তাপ তাকে আজো টানে দিক হ'তে দিকে,
সর্বত্রই তীব্র বেগ, সর্বত্রই ভ্রান্ত পদধ্বনি।
বাহিরে প্রকাশ নেই, ভিতরে সে আগ্নেয়গিরির
গলিত উত্তপ্ত স্রোত প্রকাশের ব্যথায় অস্থির ॥

কথা

কতোবার কাছে গেছি বলতে পারিনি সেই কথা,
অথচ কথার চাপে রুদ্ধশ্বাস আমার জীবন ;
এতোকাল নানা ঘাটে তোমাকেই ক'রে অন্বেষণ
নিকট সান্নিধ্যে পৌঁছে কণ্ঠে ভর করে নিথরতা
আসন্ন মৃত্যুর মতো ; সারা দিন সারা রাত ভ'রে
কতোবার কতোভাবে ভেবেছি কী কবো দেখা হ'লে
অন্তরঙ্গ সখ্যতায়, কী কথায় দীপ হ'য়ে জ্ব'লে
উঠবে বাসনা-বেগ, হৃৎপিণ্ড বাজবে সজোরে

রক্তে আলোড়ন তুলে। আর তুমি স্ফুরিত অধরে
দীর্ঘ ম্লান পক্ষ্ম তুলে উঠবে ঈষৎ যেন হেসে
কী জবাব দিতে হবে ভেবে। আমার অস্পষ্ট স্বরে
বলতে পারবো সব সে ক্ষণিক চূড়ান্ত নিমেষে ?

আজিও হয়নি বলা যে-কথায় মাতাবো তোমাকে,
কথা ছেড়ে কথা ধরি ; শব্দগুলো প্রতীক্ষায় থাকে ॥

প্রাণশিল্প

শান্তিকুমার ঘোষ

মানুষের ভিড়ে মিশে তাদের উষ্ণতা আমি নিয়েছি হৃদয়ে,
নশ্বর জীবনভোর সত্তার শিকড় মেলে একান্ত উন্মুখ :
ঘুঙুরের হরবোল হরতন হাসি কত রেখেছি বাঁচায়ে ;
নিঃসঙ্গ যদি বা দিন, স্মৃতির গভীরে তবু জাগে সব মুখ।

অন্ধ মূক নারী কোন আরো আলো, স্পর্শ, গান খোঁজে সারা দিন,
প্রতিটি প্রভাত তাকে, চেয়েছি, পাপড়ি ছিঁড়ে ফোটাক সহজে।
জুতোয় পালিশ দেবে ছেলেটি প্রতীক্ষা করে পাথরে কঠিন ;—
শ্রমের সম্মান তার সূর্যের চত্বর জুড়ে জলন্ত অক্ষরে।

অনেক কবি ও শিল্পী হৃদয়ের গাঢ় রঙে এঁকেছে পৃথিবী :
কী এক আগুনে পুড়ে উত্তাপ ছড়িয়ে গেছে মরণ অবধি।
'কালকে উজ্জ্বল ভোর'—আশা নিয়ে ডুবেছিলো সমুদ্রে নাবিক ;
গভীর প্রত্যয় প্রেমে অশ্রুরক্তে রেখে গেছে বিস্তীর্ণ পরিধি।

জীবনকে শিল্পে ধরা অবিরাম পটে তাই আমার এষণা—
রূপাবলী এঁকে যাই উপমাপ্রতীকে কত তড়িৎ রেখায়,
অমোঘ তুলিতে ফোটে অন্ধকার-ফেটে-পড়া সূর্যরশ্মিকণা :
মহাদেশ লোকালয় কাঙ্ক্ষিত পৃথিবী এক মানবিক প্রেমে।

'পারাপার'-প্রসঙ্গে

গত দশ বছর ধ'রে 'পারাপারে'র এই কবিতাগুলি একে একে মনের মধ্যে সঞ্চয় ক'রে চলেছি। তার মধ্যে আমি বিশেষভাবে আপনকালের মুখ এবং মনের চেহারা দেখতে পাই। কৈশোর পার না-হ'তেই একালের মারমূর্তি হাজির হয়েছিল আমাদের সামনে। ভয়ংকরে ভরা সে-দুর্যোগ এখনো কাটার লক্ষণ দেখছি না। যা কিছু সুন্দর, সৎ এবং মহত্ত্বের আশ্রয় তার সবই যখন চারদিকে ধ্ব'সে পড়তে লাগল তখনো সৃষ্টিশীল অক্ষয় জীবনে যদি কোনো আস্থা রেখে থাকি, তার জন্যে এই কবিতাগুলির কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী আছি। এবং, আমার বিশ্বাস, আমি একা নই। অঘটনের সবটা মেনে নিয়েও, তুচ্ছের ধুলোবালিতেই অবিরহ চিরন্তের কিছু সন্ধান দিতে পেরেছিল এই সব কবিতা। রক্তে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে উঠে অভিচারী সে-সব দিবারাত্রি কোথায় ডুবে গেছে। কাব্যের চোখে না-দেখলে, আপাত-তাৎপর্যহীন চলতিকালের প্রকাণ্ড অংশটা সেদিন ভরা ক্ষতির ভাসান হ'য়ে উঠত। তাই 'পারাপারে' গ্রথিত সেই সব কবিতাবলী হাতে নিয়ে এই উপলক্ষ্যে কবির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

'পারাপারে'র কবিতা পড়তে পড়তে বাংলাকাব্যে অভাবিত একটি চিরপথিক মনের চরিত্র ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। অনেক দেশ-দৃশ্য-দৃশ্যান্তর ছাড়িয়ে, বিচিত্র সংসারের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে, সেই পথিকের মন আরো কোনো দূরে চ'লে গেছে। এই ব্যাকুল অস্থির পথিকবৃত্তির উপলব্ধি তাঁর বেশির ভাগ কবিতার প্রেরণা। অথচ তিনি যে ঘরবিমুখ, উদাসীন সে কথাও তাঁর কবিতা প'ড়ে মনে হয় না। বরং 'তরুবনশ্রী নির্জনমনশ্রী'র অনুষঙ্গভরা স্বদেশের প্রতি ছলছল মমতার ভাবই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। 'বাঙলার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি ফেরার আশা' নানা প্রসঙ্গেই ঘুরে ফিরে আসে, যেমন নিচের কবিতাংশে :

* পারাপার : অমিয় চক্রবর্তী। সিগনেট প্রেস, ২৷৷০

কলকাতা : ফিরে যাব

দরজা বন্ধ ক'রে ধড়াস বুকের মধ্যে, একা,
বসন্ত রাত্রির ঝড়ে দৃষ্টিভরা একটি সে কাহিনী
কুসুম-সংকীর্ণ গলি, কোথা সেই দরজা পারের
গাছে পরিচ্ছন্ন বাসা। চিহ্নহারা। প্রবাসী পথের
ধুলোয় দুপুরে চলি ; রোদ্দুরে চলেছে মালগাড়ি॥ ('ফিরবো না')

কখনো বিদেশের ঘরে পিয়ানোতে জর্মান অরণ্যস্বর শুনেও মনে পড়ে 'সূক্ষ্ম মীড়ে ধ্রুপদী ভৈরবী'র ভারতী সুরসংলগ্ন ছবি। এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো রচনায় বাংলার প্রতি এমন বেদনার্দ্র মমতা এবং ভালোবাসার কথা পড়িনি। অথচ অমিয় চক্রবর্তী, বলতে গেলে, জন্মপ্রবাসী।

মনে হয়, প্রেম কল্যাণ এবং মনুষ্যত্বে তাঁর মতো প্রত্যয়ী কবির পক্ষে এই ধরনের পথিকবৃত্তি অনিবার্য ছিল। মানুষের সংসার এবং জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই তাঁর মনের সমস্ত কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা। তার ফলে সমাজ সংসারের প্রতিটি দুঃখ গ্লানি বিকার তাঁকে শুধু কবি হিসেবে নয়, সামাজিক মানুষ হিসেবেও বিচলিত করে। মনের এই স্বভাব নিয়ে এ-যুগেও কল্যাণে এবং মঙ্গলে আস্থা রাখতে পারাটা প্রায় অবিশ্বাস্য। জটিল সাম্প্রতিকের পটভূমি ক্রোধে হিংসায় আগুনে আর্তনাদে মথিত হচ্ছে। দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ গেল। সর্বস্ব-খোয়ানো অসহায় মানুষের ভিড় দেশবিদেশের শহরে বন্দরে। এই সব কিছুকে আবার আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের দারুণ দৈত্য, তার আকাশ-প্রমাণ হা। হতাশায় উৎকণ্ঠায় অবিশ্বাসে মানুষের সংকীর্ণ নরক আবিল হ'য়ে উঠেছে। স্বকালের এই চলচ্চিত্র 'পারাপারে'র বিভিন্ন কবিতায় বিন্যস্ত দেখতে পাই। বাংলাদেশের দুঃখিনী মূর্তি নোয়াখালির পল্লীপথে একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়নি। কোরিয়ায় বারুদের হাহাকার, আফ্রিকায় 'উচ্চনীচ জাতমানা দলের' অপকীর্তির বেদনা, জর্মানির 'বোমা ভাঙা অবসান' সবই ধরা পড়েছে কবিতায়। এই অবস্থার মধ্যে চোখ বুজে নিজের দিকে মন ফেরাতে পারা আদৌ সম্ভব এবং সংগত কিনা সন্দেহ।

মুক্তি চেয়ে, কেউ দেখতে পাই আশ্রয় করেছেন ধূমায়িত রাজনীতির শিবির ; গির্জে ঘরে ক্রুশের শরণ নিয়েছেন অনেকে। অন্য যারা দায়হীন সুখ-সৌখীনতার কাঙাল, তাদের মত্ত রজনী পাড়ায় পাড়ায় গুলজার। ধর্ম বাতিল, বিজ্ঞান বিমুখ, রাজনীতি রক্তনেত্র। কিন্তু আর কোনো পথ যে অভিযাত্রী সন্ধানী মানুষের সামনে খোলা নেই তাও নয়। ভারতবর্ষে গান্ধী সে-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, সৃষ্টিশীল মানুষের সমবায়ী বীর্যের পথ। আন্তর্জাতিক কল্যাণ-পন্থীদের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর যোগ দীর্ঘকালের, এ-কথা স্মরণ রাখলে তাঁর অন্তহীন পথিকবৃত্তিকে আর শুধু গ্রহের ফের ব'লে মনে হবে না। মানুষের যে পরাজয় নেই, প্রাণের আরোগ্যশক্তি যে অমোঘ, সেটা দেশে দেশে কল্যাণব্রতী সৃষ্টিধর্মী মানুষের সঙ্গে মিলিত কর্মযোগের মধ্যে দিয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। কবির পক্ষে প্রত্যয়ী হওয়ার এটাই একমাত্র পন্থা, সে কথা বলতে চাই না। কিন্তু শিল্পের ও সমাজের দ্বিবিধ দায়িত্ব কারো পক্ষে যদি এক হ'য়ে গিয়ে থাকে, একের অভিজ্ঞতা যদি অন্যকে প্রভাবিত করে, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে কবি এবং কল্যাণব্রতীর ভাবনা এক হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে এ-বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র এবং একক। বায়রন বলেছিলেন—আনন্দের যমজ যুগ্মতা সমবায়ী সুখের সঙ্গে ; নতুন যুগের কবি বলবেন—সমবায়ী সুখ নয়, বেদনার সঙ্গে। ভারতবর্ষে গান্ধী, মধ্য-আফ্রিকার আদিম অরণ্যে আলবার্ট শোয়াইৎজার তাঁদের কর্মের মধ্যে এই উপলব্ধির পুণ্য অভিজ্ঞান রেখে গেলেন। 'পারাপারে' বহু কবিতায় এই মনোভাবের শিল্পিত রূপ আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। অর্থাৎ এর মধ্যে ভ্রাম্যমাণের চোখে দেখা দেশবিদেশের বিবরণ নেই।

মনে মনে নতজানু জর্মানীতে জেনো বারবার
তোমাদেরি দৃষ্টি দিয়ে খুঁজি ইচ্ছা প্রাণদেবতার,
যে প্রসাদে জয় করো বোমাভাঙা লক্ষ হাহাকার॥ ('ডুসেলডর্ফ')

এতে আছে আশ্বাসের মন্ত্রলাগা একটি সর্বলগ্নতার সুর, যা শুনে আমাদের বিশ্বাস হ'তে পারে যে 'আঁধিমরুর ঝড় নেই তারা ঢাকবার।' জীবনে জীবনের গূঢ় সংযোগ ঘটিয়ে, সমবায়ী সাধারণ মানুষের মধ্যে ধ্রুব একত্বের সন্ধান চলেছে আজ। তার রিপোর্ট সংবাদপত্রে নেই, কবিতায় ইঙ্গিত আছে। উৎসর্গপত্রের ক্ষুদ্র কবিতাটির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলোচ্য কবিতাগুচ্ছের একটি প্রধান সুর ঐ থেকে কানে বাজিয়ে নেওয়া যাবে।

২

এই কবিতাগুলি দশ বছর ধ'রে লেখা এবং সংখ্যায় সত্তরের বেশি। কাজেই প্রকরণ এবং উপাদানের মধ্যে সর্বত্র কোনো প্রকট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিষয়ের মধ্যে তিন মহাদেশ ভ্রমণের প্রাসঙ্গিক রচনা সংখ্যায় বেশি। অন্যদিকে নিছক লিরিক, অব্যবহিতের সংস্পর্শ এড়ানো সূক্ষ্ম সংযমী প্রেমের, মৃত্যুর, এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কবিতাও কম নেই। ফলে এই গ্রন্থে এমন একটি বিস্ময়কর স্বরবৈচিত্র্যের সমন্বয় হ'য়েছে যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। বৈচিত্র্যই প্রধান কথা নয়, বিস্মরণের অতীত বাক্যের আভায় মণ্ডিত কবিতার আধিক্যও স্মরণ রাখবার মতো। হৃদয়াবেগের প্রকাশ করতে অমিয় চক্রবর্তী সর্বদাই অতিমাত্রায় কুণ্ঠিত। চোখ-ছলছল-করানো বা গলা-বুজে আসা ভাব তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেন। স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে, তাঁর রচনায় কোথাও 'হায়' কিংবা 'আহা' দেখিনি। বাম দক্ষিণ উভয়পন্থী বাঙালী কবির রচনাতেই এটা একটু অপ্রত্যাশিত। অমিয় চক্রবর্তীর মনের চরিত্রই এই রকম যে তাঁর লেখা মৃত্যুশোকের বিদীর্ণ কবিতাতেও আত্মবিস্মৃতির ভাব নেই :

> বুকে প্রাণটা এমনিই রইল, জানো ভাই,
> ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, যাই
> —যাই।

অশ্রুমোচনের চিহ্ন সবটাই মুছে ফেলা হয়েছে। ঐ 'জানো ভাই' শব্দ দুটি হয়তো ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন। প্রত্যক্ষ দুঃখ বেদনাকে তুচ্ছ, কখনো তাচ্ছিল্য, করবার মতো পৌরুষ এবং দৃঢ়তা আছে এর মধ্যে। এবং এটাই তাঁর প্রেমের কবিতারও বৈশিষ্ট্য। সেখানেও আশ্চর্য সংযম এবং কুণ্ঠার সঙ্গে, ছবির ভাষায়, অন্য পাঁচটা স্পষ্ট কথা বলবার মতো ক'রে কণ্ঠস্বর অবিচলিত রেখে অল্প বলা। বুকফাটা কান্নার চেয়েও দুঃসহ শোক মানুষ জানতে পারে। দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় না, প্রাণের শক্তি দিয়ে আজীবনের সাধনায় ক্বচিৎ কখনো যে-শোককে বশ করা যায় হয়তো, যখন তা আর আমাদের মুহ্যমান, বিহ্বল এবং নিরস্ত না রেখে, রূপান্তরের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে শক্তি এবং মুক্তি—সেই অনুচ্ছ্বাস শোক তাঁর প্রেমের কবিতায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে। এই রকম একটি ছোট্ট লিরিকের সবটা এখানে তুলে দিই :

> তার বদলে পেলে—
> সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
> নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
> আলোয় ভরা জল—
> ফুলে নোয়ানো ছায়া ডালটা
> বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
> ভরল হৃদয়তল—
> একলা বুকে সবই মেলে॥
>
> তার বদলে পেলে—
> সাদা ভাবনা কিছুই-না-এর
> খোলা রাস্তা ধুলো পায়ের
> কান্নাহারা হাওয়া—
> চেনাকণ্ঠে ডাকল দূরে
> সবহারানো এই দুপুরে
> ফিরে কেউ-না-চাওয়া
> এও কি রেখে গেলে॥

কাহিনীগত অনুষঙ্গের সবটাই এখানে না-বলা, অবশ্য পাঠক যদি প্রথম পংক্তির প্রথম পর্বকে এড়িয়ে যেতে দেন। উচ্ছ্বাস অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে কোথাও

নেই, মূলত হৃদয়বেগ থেকে যার জন্ম সেই প্রেমের কবিতাতেও না। তাঁর ভক্ত পাঠকের সংখ্যা এখনো যদি আশানুরূপ না হয়ে থাকে—এটাই বোধ করি তার প্রধান কারণ। নিবিড় সংযমী সুরের এই প্রেমের কবিতগুলি বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় গৌরব হয়ে রইল।

প্রেম আর সৃষ্টিপ্রেরণায় সমুন্নত মানুষের প্রতি গভীর প্রত্যয়ী এই কবিকে এ-গ্রন্থের কিছু কবিতায় আরো কোনো চিরন্তের সন্ধানী দেখতে পাই। প্রকরণের ব্যবধান সত্ত্বেও সেখানে তাঁর আত্মীয়তা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনিই যে এখন একমাত্র 'মিস্টিক' কবি, 'পারাপার' পাঠ করার পর সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অতিলৌকিকের আভা-দেওয়া এই কবিতাগুলি প'ড়ে বিস্ময় বোধ করি। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গেই কাব্যে আধ্যাত্মিকতার যুগ শেষ হয়েছে ব'লে ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত। অথচ নিঃসংশয়ে আমাদের যুগেরই পুরোধা কবি অমিয় চক্রবর্তী আধ্যাত্মিক। যে-'জটিল সংস্কৃত ইচ্ছা ভয় ছায়া করে আছে আধুনিক পটে' তার প্রতি তিনি কিছুমাত্র উদাসীন নন। এবং তিনি যে-অলৌকিকের কথা তাঁর কবিতায় ব'লে থাকেন সে-অলৌকিকের প্রত্যক্ষ বাসর এই অতিমাত্রায় বাস্তব পৃথিবীরই সংসার প্রকৃতি। সৃষ্টিছাড়া বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছনো যায় না, রূপের হাতুড়ির মূর্ছা মনকে আঘাত করলে, তখনই বিশ্বের আন্তর পরম ঐক্যকে দেখতে পাই, বাহিরের আবরণ যখন খ'সে পড়ে:

> ছিল না, এই তো চাঁপা, গন্ধের চন্দ্রের বিন্দু রাতে ;
> অতলান্ত ঐ ঢেউ মেতেছে হঠাৎ পূর্ণিমাতে ;
> প্রথম শিশুর কণ্ঠে মা'র ডাক ; যৌবন রঙিমা ;
> ত্রিভুবন তটে বলো এর চেয়ে কোথায় অসীমা ?
> আশ্চর্যের কান কালা, দেব তাই হরবোলা খোঁজে,
> প্রত্যেক মানুষ দেব—
>
> ('কোনি আইল্যাণ্ড')

হেন দৈবতার দৃষ্টিকে নমস্কার। প্রত্যক্ষ সর্বলোকের প্রতি মমতাভরা এই আত্মীয়তার মধ্যে দীক্ষিত ভারতী মন নূতন যুগচেতনায় সংগতি পেয়েছে।

অপার্থিবতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতে হলে থামা-ট্রেন-থেকে-দেখা গাঁয়ের বসতি, হাট, লোকের আনাগোনা—এইটুকুই তাঁর চোখে যথেষ্ট। অন্যত্র দেখতে পাই:

> আখর ঐ তো ধুলো-পথে ছোটে
> ঘাসে জেগে ওঠে,
> সারি গাছে কোলে গুচ্ছ গুচ্ছ ডাব।

এই তুচ্ছের মধ্যেই 'ধুলোর প্রত্যয়ে দেখা' অলৌকিকের আভা লেগেছে অমিয় চক্রবর্তীর পরিণত কাব্যে। সংসারমনস্কতা এবং দৈবতার দৃষ্টিকে একই সময়ে এ-ভাবে কাব্যে রূপ দিতে পারা দুরূহতম সার্থকতা ব'লে মনে করি। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে একটি প্রবল নতুন সুরের যোজনা করলেন তিনি।

৩

অনেকের ধারণা, প্রচলিত ছন্দ-মিলের যে-ঠাটের সঙ্গে আমরা পরিচিত, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা কেবলই তার সঙ্গে আড়ে চলে। এবং তাঁর অধিকাংশ রচনাই দুরূহ। এ-অভিযোগ যদি সত্যও হোতো কাব্যের সার্থকতা বিচারে তবু সে-প্রশ্ন অবান্তর। তাছাড়া প্রকরণের ঐতিহ্য-মানা রচনাতেও তাঁর দক্ষতা যে কত অসাধারণ তার দৃষ্টান্ত 'পারাপারে'র একাধিক কবিতায় উপস্থিত। প্রচলিত পদ্ধতি-মানা, অথচ পদে-পদে চমক লাগানো। অমিয় চক্রবর্তীর অমিল ছন্দের বৈশিষ্ট্যময় কবিতা আমার কাছে কম প্রিয় নয়। কিন্তু, বোধ করি, স্মরণশক্তির সহায়ক বলেই, তাঁর সমিল কবিতাবলীর দিকেই আমি অধিক আকর্ষণ বোধ করি। ছন্দের মধ্যে প্রায়ই অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার করেছেন। ক্বচিৎ মাত্রাবৃত্তও চোখে পড়বে। কিন্তু স্বরবৃত্তের সাহসী নিপুণ ব্যবহার কিছু কবিতায় যে-রকম আপাত-হালকা চালের নাটকীয় গুণ এনে দিয়েছে, সেটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্রষ্টব্য—'সাবেকি', 'বৈদান্তিক', 'লিরিক', 'পিঁপড়ে' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে স্বরবৃত্তের ব্যবহার নিয়ে একটু তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাই। গ্রাম্য ছড়ার ছন্দই স্বরবৃত্ত একথা মেনে নিয়েও সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন, এ ছন্দের পর্বে পর্বে

চারমাত্রার কড়া আইন কোথাও শিথিল হলেই জাত যাবে। ছন্দশাস্ত্রী যে-বিধানই দিন, রচিত বাংলা কবিতায় কে কবে এ আইন মেনেছেন?

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর **নদেয় এলো** বান'

এ যদি বাংলা ছড়াতেই চ'লে গিয়ে থাকে তাহ'লে আধুনিক কবির লেখায় দেখতে পেলেই তাকে কাঠগড়ায় তুলব কেন? আসল কথা কি এই নয় যে কানের পক্ষে ছন্দটা যেন অত্যাচার হয়ে না দাঁড়ায়। কানের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় না। কিন্তু যা চলে, তা চলবে।

১। প্রকাণ্ড বন প্রকাণ্ড গাছ,—
বেরিয়ে এলেই নেই। ('বৈদান্তিক')
২। **ভিতরে কতো** দ্রুতের ভয়, **কখনো বেলা** সময়হীন („)
৩। দু'চার পিপে **জমিয়ে নস্য** হঠাৎ ভোরে **হলো অদৃশ্য** ('সাবেকি')

স্বরবৃত্তে লেখা এসব পংক্তি চারমাত্রা-ছাড়ানো পর্ব নিয়েও কবিতায় কোনো বাধার সৃষ্টি করেছে বললে মানব না। বাংলা ছড়াতে নজির যদি নাও থাকতো তবু এই নিয়মভাঙা স্বরবৃত্ত বাংলা কবিতায় চলে যাবে। অন্তত এ কারণেই চলে যাবে যে অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর মতো ছন্দ-কুশলী জ্যেষ্ঠ কবিরা তার সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পেরেছেন।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা দুরূহ—এ অভিযোগ বিষয়ে সর্বত্র আমি মনস্থির করতে পারি না। দুরূহ না ব'লে 'সহজ নয়', এবং তাও কখনো-কখনো, এই রকম হয়তো বলা চলে। চলতি ভাষার ইডিয়ম, এবং প্রাত্যহিক সহজ শব্দের ব্যঞ্জনাময় ব্যবহার আধুনিক জ্যেষ্ঠ কবিরা সবাই প্রায় ক'রে থাকেন। জীবনানন্দের লেখায় তো ছত্রে ছত্রে। কিন্তু অন্য প্রত্যেকের মধ্যেই হয় ক্রিয়াপদের, নয়তো বিশেষ-বিশেষ শব্দের নির্বাচনে, কিংবা সমগ্র বাক্যের গঠনে, কোথাও কোথাও দেখা যাবে মৌখিক গদ্যের স্পষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমার মনে হয় একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতেই স্বাধীন অথচ সংস্কৃত যে-চলতি ভাষা, সে তার আটপৌরে

হালের পোষাক নিয়ে, নির্ভীকভাবে একেবারে বাংলা কাব্যের সামনের সারিতে গিয়ে আসন নিয়েছে। মৌখিক গদ্যের ভাষায় পদবিন্যাসের দীর্ঘতা অগ্রাহ্য, অমিয় চক্রবর্তীর বাক্যগুলিও সেই কারণে ছোটোখাটো, অনেক সময় কাটা-কাটা। পদ্য থেকে গদ্যে আনতে গেলে কিছুই তেমন করার নেই। তবে এখন পর্যন্ত কবিতার পংক্তিতে, বাক্যের শব্দ পরম্পরা সময় সময় একটু ওলোটপালোট করতেই হয়। তখন মাঝে-মাঝে দুরূহ লাগা অসম্ভব নয়। যেমন, 'ওক্লাহোমা' কবিতার এই শেষ কয়েক পংক্তি:

হৃৎপিণ্ডে রক্তের ধ্বনি যেখানে মনের শিরা ছিঁড়ে
যাত্রী চলে গেল পথে কোটি ওক্লাহোমা পারে লীন
রক্ত ক্রুশে বিদ্ধ ক্ষণে গির্জে জ্বলে রাঙা সে তিমিরে
বিচ্ছেদের কল্পান্তরে প্রশ্ন ফিরে আসে চিরদিন।
ফিরে আসে চিরদিন।

অন্যত্র 'লাল মনসা' কবিতায়

পরিচ্ছন্ন বন আর কার্পেটের রুক্ষ রোজই ছোঁয়

এই বাক্যে 'পরিচ্ছন্ন' কথাটা বিশেষণ, না বিশেষ্য? 'রুক্ষ' যদি রুক্ষতা, তাহলে 'পরিচ্ছন্ন' [-তা] ই তো কর্তা? তবে, এমন দৃষ্টান্ত খুঁজলে আর হয়তো একটি দুটি পাওয়া যাবে। কাজেই দুরূহতা যদি কোথাও থাকে তো ভাষায় নেই। কিংবা ভাষার ব্যবহারে আছে, শব্দচয়নে নেই। এবং ভাষার মর্ম ক্বচিৎ সেখানেই দুরূহ, কবি যেখানে কাব্যপ্রসঙ্গকে অতি বিশদ করতে অসম্মত। 'ওক্লাহোমা' কবিতাটির উল্লেখ ক'রেছি। স্পষ্ট না-বুঝেও যে-সব কবিতা আমরা ভুলতে পারি না, এ-কবিতাটি সেই রকম। অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসতে পারে: 'সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছ কি ৩টে ২৫শে?'—কে কাকে প্রশ্ন করছে? উপলক্ষ্য কোনো আত্মহত্যা? ('ঝোড়ো অবসান')। 'সাক্ষাৎ সন্ধান' কিসের? (উত্তর—'কে তুমি?' কিনা?) ক্যাথলিক গির্জের পরেই কাকের প্রসঙ্গ কেন? (ক্যাথলিক বিনে আত্মার মুক্তি নেই। তবে, হায়, কাকের আত্মার কী

হবে! কথাটা কি এই?)। শহরের পাশে ইস্পাতি রেল,—সব কিছু জিজ্ঞাসার সমাধান ক'রে ফেলা বাস্তবনিষ্ঠের আত্মতৃপ্ত এবং নির্দ্বন্দ্ব মনোভাব বুঝিয়েছে কিনা? এবং কবিতাটির মোট কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতার ঐক্য আছে কিনা?

দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

বলা বাহুল্য, বিশদ নয় ব'লে আমার কোনো অভিযোগ তো নেইই, বরং বেশির ভাগ কবিতায় তার ফলে যে প্রগাঢ়তা এবং সংহতি এসেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভাষা-ছন্দের আশ্চর্য মিতব্যয়িতা না থাকলে 'বিনিময়', 'পর্দা', কিংবা 'লিরিক'-এর মতো কবিতা কখনো সম্ভব হোতো না।

'পারাপার' কাব্যে ছন্দ এবং ভাষার এই আশ্চর্য কুশলী ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। ভাষাছন্দের মৃদঙ্গমঞ্জীরপর্ব বাংলা কাব্যে এখন বিগত বললেই চলে। তার মধ্যেও 'পারাপারে'র পরীক্ষা অভিনব। গীতবাদ্যের আপেক্ষিক ক্ষীণতা অনেক অন্যমনস্ক পাঠককে এখন পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয় ব'লে জানি, কিন্তু বাংলা কবিতার মুখ আজ অনিবার্যভাবে এই দিকেই।

নরেশ গুহ

সম্পাদক: বুদ্ধদেব বসু। সহকারী সম্পাদক: নরেশ গুহ। ২১৭ থেকে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পূর্বাশা লিমিটেড-এ সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্তৃক ও অবশিষ্ট অংশ ৮।১ লালবাজার ষ্ট্রীট, স্বপ্না প্রেসে মুদ্রিত কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

১৯
সম্পূর্ণ

৫৬ ১৯
(সম্পূর্ণ)

দ্বিতীয় সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা নেই —
ম্যাক্রোফিল্মে [illegible] সংখ্যা দেখুন।